জহর ও অমৃত

বল্লভপুরের জমিদার ভবসিন্ধু চৌধুরীর নাম-ডাক মন্দ ছিল না। আয় তাঁহার যথেষ্ট ছিল—কিন্তু সেদিক দিয়া তাঁহার নাম হয় নাই—যশ হইয়াছিল তাঁহার টাকা খরচ করিবার বাহাদুরি দেখিয়া। সুরা ও নারীর মহিমায় তাঁহার ধনভাণ্ডারে অর্থ জমিতে পারিত না। অথচ তিনি গ্রাম ছাড়িয়া কোথায়ও যান নাই। গ্রামের তেলে জলে তাঁহার উদরটি ধীরে ধীরে যেমন স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল—তেমনি দুষ্টামি করিতেও তিনি পাকিয়া গিয়াছিলেন প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে তিনি একটুও দ্বিধাবোধ করিতেন না। পরস্বাপহরণ, পরস্ত্রীলুণ্ঠন ব্যাপার তিনি অবাধে ধীরে সুস্থে নির্ব্বিকার ভাবে করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে কোনওদিন কেহ তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখে নাই।

কিন্তু বিচলিত হইতেন একজন। জমিদার গৃহিণী মনমোহিনী স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া নিতান্ত কষ্ট অনুভব করিতেন। মুখ ফুটিয়া তিনি কোনওদিন কাহাকেও কিছু বলেন নাই—কিন্তু তাঁহার অন্তরের ব্যথা কাহারও নিকট গোপন ছিল না। তিনি সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই লাঞ্ছিত প্রজাবৃন্দকে সাহায্য করিতেন। স্বামীর দিক দিয়া তিনি কোনও

দিন কিছু প্রত্যাশা করেন নাই। কিন্তু একমাত্র পুত্র অরুণকে তিনি সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। গ্রামের স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিলে মনমোহিনী পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ভবসিন্ধু বাঁকিয়া বসিলেন, ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন—ঢের বিদ্যান্ তোমার ছেলে হয়েছে, আর কেন। ওসব মতলব ছাড়। অরুণ জমিদারের ছেলে বিষয় কর্ম্ম শেখাও পরে কাজ দেবে।

মনমোহিনী হাঁ না কিছুই বলিলেন না। ভবসিন্ধু বুঝিলেন—পত্নী নিজ সংকল্প হইতে বিচ্যুত হয় নাই—হইবেও না। তিনি মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কহিলেন—তোমাদের কোনও কথাতেই আমি নাই। কিন্তু এ কথাও বলে দিচ্ছি কলকাতার খরচ আমি যোগাতে পার্‌ব না। পারতো বাপের বাড়ী থেকে যোগাড় দেখ।

মনমোহিনী দরিদ্র পিতার কন্যা—সুতরাং কথাটা তাঁহাকে বিঁধিল। কিন্তু এ খোঁটা না কি অহরহ চলিতেছে, তাই তাঁহার সহ্য হইয়া গিয়াছিল। তিনি দৃঢ় স্বরে কহিলেন—যেমন করেই হোক্ ওকে কলকাতায় পাঠাবই। অরুণ যে জমিদারের ছেলে এইটাই তাকে ভুলতে হবে।

মনমোহিনীর স্পষ্ট কথায় ভবসিন্ধুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, তিনি পদপ্রান্ত হইতে হস্তীদন্তের পাদুকাখানি তুলিয়া সজোরে পত্নীর দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—আগে তোমার বাপের নাম ভুলাই, তারপর ছেলে ভুলবে।

পাদুকাখানি মনমোহিনীর দক্ষিণ চোখের উপর কপালে আসিয়া লাগিল। কপাল কাটিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া রক্তের ধারা বহিয়া চলিল। কপাল টিপিয়া ধরিয়া তিনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিলেন।

ভবসিন্ধু কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া গম্ভীর স্বরে হাঁকিলেন—

হুজুর ।—বলিয়া ভবাসন্ধুর পেয়ারের চাকর বৃন্দাবন আসিয়া সেলাম করিল।

—হারামজাদা ব্যাটা সেলাম ঠুকলেই আমার পেট ভরবে বটে। বৃন্দাবন ইঙ্গিত বুঝিয়া একটু মুচকি হাসিয়া আলমারি হইতে উৎকৃষ্ট বিলাতি মদ ও কাঁচের গ্লাস বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

ভবসিন্ধু হুকুম করিলেন—ঢাল। বৃন্দাবন রক্তিম সুরায় কাঁচের গ্লাসটি পূর্ণ করিয়া প্রভুর হাতে তুলিয়া দিল।

এদিকে অরুণ মায়ের সন্ধান করিতে করিতে তাঁহার কক্ষে আসিয়া জননীর রক্তাক্ত বস্ত্র ও কপালের ক্ষত দেখিয়া চমকিত হইয়া কহিল—এ কি মা! মাতা সজল নয়নে করুণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন অরুণ স্তম্ভিতভাবে জননীর দিকে তাকাইয়া রহিল। ক্রোধে সমস্ত আনন তাহার আরক্ত হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই কহিল—আমি আসছি!

মাতা আকুলকণ্ঠে ডাকিলেন—অরুণ, বাবা, কোথায় যাস্।

বাহির হইতে অরুণ কহিল—এখুনি আস্‌বো মা!

ভবসিন্ধু সুরার গ্লাসে চুমুক দিতেছিলেন, সহসা ঝড়ের মত অরুণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—মাকে অমনভাবে মার হয়েছে কেন?

অতি বিস্ময়ে ভবসিন্ধুর সুরার গোলাপী নেশা ছুটিয়া গেল। যে সন্তান সাধ্যমত পিতার সম্মুখে আসে না, সেই এখন তর্জ্জন করিয়া কৈফিয়ৎ চাহিতেছে। বলিষ্ঠদেহ পুত্রের আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া মদ্যপ পিতা নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অরুণ কহিল—কেন মিছি মিছি মাকে এমন মারধর করেন? আপনার লজ্জা করে না?

ভবসিন্ধুর মুখে কথাটি নাই। বৃন্দাবন তখন দূরে সরিয়া গিয়া মজা দেখিতেছিল।

অরুণ টেবিল হইতে মদের বোতল গেলাশ মেঝের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিল। কাঁচের পাত্র ভাঙ্গিয়া তরল সুরার ঢেউ খেলিতে লাগিল। তারপর আলমারি হইতে সমস্ত বোতল বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল—ঘরের ভিতর মদের বন্যা বহিয়া গেল।

বৃন্দাবন পাশের ঘর হইতে উঁকি মারিতে[illegible]। অরুণ তাহা দেখিতে পাইয়া একখানি চাবুক লইয়া তাহার দিকে ধাইয়া গেল—তারপর তাহার সমস্ত দেহ চাবুকের আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া দিল। বৃন্দাবন কাটা ছাগলের মত মেঝেতে গড়াইতে লাগিল—কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত অরুণ সহজে তাহাকে রেহাই দিল না। তাহার অনেক দিনের সুপ্ত ক্রোধ জাগ্রত হইয়া পিতার এই পেয়ারের চাকরটিকে শাস্তি দিতে বদ্ধ পরিকর হইয়া উঠিয়াছিল। বৃন্দাবনের গায়ের স্থানে স্থানে কাটিয়া গিয়া রক্ত ঝরিতেছে দেখিয়া অবশেষে অরুণ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। তারপর হতভম্ব পিতার নিকট আসিয়া কহিল—আমি এখন বড় হয়েছি, মায়ের অপমান মুখ বুজে সহ্য করবো না—এ আপনি মনে রাখবেন। সে বাহির হইয়া গেল।

বৃন্দাবন কাঁদিতে কাঁদিতে ভবসিন্ধুর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল—হুজুর!

ভবসিন্ধু মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—হারাম[illegible] ব্যাটা, দরজার পাশে মুখ বের করে মজা দেখা হচ্ছিল? তার শা[illegible]ও বেশ হলো তো! হাজার হলেও জমিদরের ছেলে—রাগ হবে না? তুই কোথাকার একটা হতভাগা ছোট লোক—আমার ছেলের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসা! ওর চোখকে ফাঁকি দিতে পারলি ব্যাটা! কেমন উত্তম মধ্যম দিলে বল দেখি। এখন আদর জানানো হচ্ছে—হুজুর! ব্যাটা বজ্জাত, দূর হ আমার সম্মুখ থেকে।

পুত্রের নিকট প্রহার খাইবার পর পিতার নিকট এইরূপ সহানুভূতি পাইয়া বৃন্দাবন চোখ মুছিতে লাগিল। ভবসিন্ধু বলিলেন—যা যা ছেলে মানুষ মেরেছে তার আর এত কান্নাকাটি কি। আর জমিদারের ছেলের হাতে যে এতদিন মার খাস্‌নি—সেই তো আশ্চর্য্য কথা। ছোট বেলায় আমিই কি চাকর বাকর ঠেঙ্গিয়েছি কম! যা যা আর ন্যাকাপনা করিস্‌নে।

বৃন্দাবন সুবিধা না বুঝিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভবসিন্ধু কি মনে করিয়া পকেট হইতে একখানি নোট বাহির করিয়া বৃন্দাবনের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন—এইখানা নিয়ে যা। ছেলেমানুষ মেরেছে আর কাঁদতে হবে না।

বৃন্দাবন এইবার গায়ের যন্ত্রনা ভুলিয়া গিয়া নোটখানি তুলিয়া সেলাম ঠুকিয়া প্রস্থান করিতেছিল, ভবসিন্ধু ডাকিয়া কহিলেন—ত্যাখ বেন্দা আজ আমার ভারী আহ্লাদ হচ্ছে! অরুণকে দেখে আমার মনে হতো জমিদারের ছেলের চেয়ে ভট্চাজ্যির ভাগনে হওয়ার দিকেই তার ঝোঁক বেশী। কিন্তু দেখলি তো একদণ্ডে কি কাণ্ডটা করে বসলো। জমিদারের ছেলে না হলে—এ পারে? আর ত্যাখ এখন একটু সাবধানে চলিস। মদটদ-গুলো না হয় বাড়ীতে না রাখলেই হবে—কি বলিস্? দেখলি তো কেমন গন্‌গনে আগুণ। হবে না? রাজপুত্তুর যে! রাজপুত্তুর—হা! হা!!

বৃন্দাবন 'হুজুর' বলিয়া আর এক সেলাম ঠুকিয়া ঘরের ভিতর পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল।

অরুণ মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। মাতা পুত্রের মস্তকে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তারপর তাহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া যুগপৎ আনন্দ ও শঙ্কায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

মনমোহিনীর কথাই বজায় থাকিল। অরুণ কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইল। যাইবার পূর্ব্বে মাতার অঞ্চল ধরিয়া অরুণ বলিয়াছিল —তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারবো তো মা ?

মাতা পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন—মায়ের কাছে চিরকাল থাক্‌লে তো মানুষ হতে পারবে না বাবা। আবার কলেজের ছুটি হলেই তো আমার সাথে দেখা হবে।

পুত্রের কলিকাতা যাইবার কথায় ভবসিন্ধু আর কোনও আপত্তি করেন নাই। যাইবার পূর্ব্বে অরুণ পিতাকে প্রণাম করিল। ভবসিন্ধু কিছুই বলিলেন না। গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। অরুণ প্রস্থান করিলে ভবসিন্ধু দেওয়ানজিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

দেওয়ানজি আসিলে তিনি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কলিকাতায় তাহলে বাড়ী ভাড়া হয়ে গিয়েছে ? কত টাকা করে ভাড়া গুণতে হবে শুনি ?

দেওয়ানজি কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—বাড়ীভাড়া তো হয় নি।

—খুব ভাল কথা। তাহলে ছেলে কোথায় উঠবে ?

—আজ্ঞে মেসে থাক্‌বেন ঠিক হয়েছে।

—বটে! তা বেশ। এই বলিয়া ভবসিন্ধু আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন। দেওয়ানজি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নমস্কার করিয়া প্রস্থান

করিতেছিলেন, ভবসিন্ধু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—আচ্ছা দেওয়ানজি অরুণের বাপের কি পয়সার এমনি টান ধরেছে যে কলকাতায় বাসা ভাড়া টাকা জুটলো না ?

দেওয়ানজি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন—আজ্ঞে, তা নয় আমি বলেছিলুম—কিন্তু গিন্নিমা শুনলেন না।

—শুনলেন না ? তিনি কি বল্লেন ?

—বল্লেন, ছেলেদের সাথে মিলেমিশে থাক্‌বার অভ্যাস করা ভাল আর অরুণের জন্য অত বেশী খরচ করবারও প্রায়োজন নাই।

ভবসিন্ধু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—হুঁ। মাসিক কত করে লাগবে তার ?

—গিন্নিমা বলেন, চল্লিশটি করে টাকা দিলেই চল্‌বে।

ভবসিন্ধু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন—আরে বলে কি ! চ-ল্‌-লি-শ টাকা ? আচ্ছা বল দেখি এটা নিছক বাজে খরচ কিনা ? অত লেখা-পড়া শেখার ওর দরকার কি ছিল ?

দেওয়ানজি সায় দিয়া বলিলেন—আজ্ঞে, সেই কথাই তো আমরা বলাবলি করি।

—সেদিন আমিও তো ঐ কথাই বলেছিলুম। তাতে মা ব্যাটার কি রাগ। আমাকে ধরে এই মারেতো সেই মারে। কেন, আমি করেছিলুম কি ? এখন এই চল্লিশটি টাকা করে যাচ্ছে ? সেদিন পষ্ট বলেছিলুম—আমি ছেলের পড়ার হাঙ্গামা পোয়াতে পারবো না। সে কথা গেরাহি নেই।···তারপর একটু দম লইয়া ভবসিন্ধু বলিতে লাগিলেন—আচ্ছা, বাবা যদি খারাপই হয়—তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে হবে না ? শাস্তরে কি বলে—পিতা স্বর্গ—পিতা ধর্ম্ম। এখন কি আর সে কাল আছে ? আমার চরিত্তির যাই হোক—তোরা তা দেখতে গেলি কেন ? যযাতির

জয়া যে তার ছেলে পুরু নিয়েছিল—এ কিসের জন্য? বাপ একটু সুখ পাবে এই বলেই তো? সেই পুরুর নাম এখনও সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। কিন্তু এ কলিকাল যে ঘোর কলিকাল! [illegible] ছেলে আসে বাপকে শাসন করতে।

দেওয়ানজি চুপ করিয়া শুধু হাত কচলাইতে লাগিলেন।

ভবসিন্ধু একটু নীরব হইয়া বলিলেন—যখন বল্‌ছে—না হয় টাকাটা ঠিক মাসে মাসে পাঠিও—বুঝলে? দেওয়ানজি নমস্কার করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে তিনি পুনশ্চ কহিলেন—দেখ, চল্লিশটি টাকায় কি আর অরুণের কুলোবে? আমার তো বোধ হয় না। অন্যের ছেলে যেমন কষ্টে থাকতে পারে—একজন জমিদারের ছেলের পক্ষে কি তা সম্ভব হয়? আমি বলি কি পুরোপুরি একশটা টাকাই না হয়—।

দেওয়ানজি বলিলেন—কিন্তু গিন্নিমা বলেন,—অত টাকা হাতে পড়লে—

মুখ খিঁচাইয়া ভবসিন্ধু বলিলেন—গিন্নিমা বলেন, তবে আর কি। আমার কথা কি আর একটা কথা। খুব ভাল, যা ইচ্ছে তাই কর। ওদের কথায় আর আমি নাই—এই আমি তোমাদের পষ্ট বলে দিলুম।

দেওয়ানজি মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে প্রস্থান করিলেন।

* * * *

অরুণ কলিকাতা যাইবার দিন পনেরো পর সংবাদ আসিল, ভবসিন্ধু হঠাৎ বাগান বাড়ীতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন—কিছুতেই তাঁহার জ্ঞান হইতেছে না।

মনমোহিনী শঙ্কিত হইলেন—কারন তিনি বুঝিয়াছিলেন—অবিরত অত্যাচারে তাঁহরে শরীর একেবারে ঘুণ হইয়া গিয়াছে—আর বেশীদিন এ

শরীর টিঁকিবে না। তিনি আদেশ করিলেন—সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে পাল্কী করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসা হউক।

জমিদারকে যখন আনা হইল তখনও তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। মনমোহিনী স্বামীর শিয়রে যাইয়া বসিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিল, লিভার ও ফুসফুসের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কখন কি হয় বলা যায় না।

কলিকাতায় অরুণের নিকট টেলিগ্রাম করা হইল।

অরুণ যখন আসিয়া পৌছিল তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। অরুণ মাতার বিধবার বেশ দেখিয়া ফেঁাপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। জননী পরম স্নেহে পুত্রের মাথায় হাত দিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

অরুণ অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলে মনমোহিনী সজল চক্ষে কহিলেন—তিনি যাবার সময় তোকে আশীর্ব্বাদ করে গেছেন অরুণ।······অরুণের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

যথা সময়ে শ্রাদ্ধ পর্ব্ব মিটিয়া গেল অরুণ পুনরায় কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অরুণ বলিল—এইবার তুমিও তো আমার কাছে থাকতে পার মা। একা একা আমার বড় কষ্ট হয়।

মনমোহিনী কহিলেন—কিন্তু এ জায়গা ছাড়বার যে উপায় নাই আমার। এত বড় ঝক্কি দূর থেকে বইবো কি করে বাবা। যখন তুই মানুস হয়ে এখানে আসবি—তখনই আমার নিষ্কৃতি। তার আগে নয়।

অরুণ চলিয়া গেল। আর এখন হইতে মনমোহিনীর সমস্ত প্রাণটা সেই সুদূর কলিকাতাতেই পড়িয়া রহিল।

—৩—

মাস তিনেক পর এক শরৎ প্রভাতে ঢাকের বাজনা কাণে প্রবেশ করিতেই অরুণের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। আজ তিনটি মাস সে জননীর কোল-ছাড়া। এই চিরপরিচিত বাদ্য তাহার মনে সেই পল্লীভবন, জননীর স্নেহ দ্বিগুণ করিয়া মনে করিয়া দিল। তাহার মনে হইল—ইহা যেন মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্য আকুল আহ্বান জানাইতেছে। বিছানা ত্যাগ করিয়া সে নীচে নামিল তারপর কোনও রকমে চটিতে পা গলাইয়া দিয়া অতি দ্রুত দুই ধাপ সিঁড়ি টপকাইয়া নীচের তলায় আসিল। একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোনও এক নিদ্রিত ছাত্রের হাত নাড়িয়া দিয়া কহিল—সমীর, এত বেলা হয়েছে, তবু ঘুমুচ্ছ।

সমীর জাগিয়া উঠিয়া সহাস্যমুখে কহিল—এত ভোরেই হাঁক ডাক কেন? ব্যাপার কি?

এদিক ওদিক চাহিয়া অরুণ বলিল,—আজই বাড়ী যাব। সব জোগাড় করে নাও।

বিস্মিত সমীর গা মোড়ামোড়ি দিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল—আজই কেন? ছুটির এখনও তিন দিন দেরী যে!

অরুণ কহিল—তা থাক ভাই। আমি আর থাকতে পারছি নে।

সমীর সহাস্যে কহিল—মায়ের জন্য মন কেমন করছে বুঝি?

অরুণ জবাব দিল—হুঁ। ঠাট্টা নয় ভাই, আমি আর একটি দিনও দেরী করতে পারবো না। আর কটা দিনই বা ছুটিটা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে

যাবে। আজই সব জোগাড় করে নাও—কোনও আপত্তি শুনবো না।

সমীর অরুণের বন্ধু। একসঙ্গে দুজনে কলেজে পড়ে। মাতৃহীন সমীর অরুণের নিকট তাহার জননীর কথা সমস্ত শুনিয়াছে এবং কথা দিয়াছে এবার পূজার ছুটিতে সে অরুণের গ্রামেই কাটাইয়া দিবে।

সমীর কহিল—কোনও আপত্তি করবো না ভাই। চল আজই যাওয়া যাক।

সেইদিনই তাহারা রওনা হইল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দেখিল—ষ্টেশনে তাহাদের জন্য হাতী ও পাল্কী দুইই আসিয়াছে। সমীর বলিল—হাতীতে কোনওদিন চড়িনি আমি হাতীতেই যাব। তুমি না হয় পাল্কীতে চড়।

অরুণ কহিল—আমরা দুজনেই হাতীতে যাব। হাতীর দোলানি অনেক দিন উপভোগ করিনি।

দুইজন হস্তী পৃষ্ঠে আরোহন করিল। এই বৃহৎকায় জীবটি যখন ধীর মন্থর গতিতে সমস্ত দেহটা দুলাইয়া চলিতে লাগিল—তখন সমীর ভীতি মিশ্রিত আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িল।

অরুণ কহিল—ভয় করছে সমীর?

সমীর হাসিতে হাসিতে কহিল—ভয় যে না করছে তা নয়। তবে আনন্দও হচ্ছে মন্দ নয়।······অরুণ হাসিয়া উঠিল।

দুই পাশের যত গ্রাম দেখা যাইতেছিল সমস্তই অরুণের জমিদারীর অন্তর্গত। গ্রামের ক্ষেতগুলি তখন ধানের গাছে ভরা—চারিদিকে সবুজের মেলা বসিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে এক একটি বিস্তীর্ণ পুকুর—তাহাতে পদ্ম ফুটিয়া আছে। পল্লীগ্রামের রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া মাঠের পাশ দিয়া ঘরের কানাচ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাইতে যাইতে কোথায়ও শেফালিকা ফুলের মৃদুগন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সমীর প্রীতি হইয়া

কহিল—এই উঁচু জায়গা থেকে সমস্ত দৃশ্যটি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। আর এই শেফালিকা ফুলের গন্ধ! কি মিষ্টি! কি স্নিগ্ধ এর রূপ। শিশির ভেজা ফুলগুলি যেন মায়ের আশীর্ব্বাদের মত পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে।

অরুণ স্মিতমুখে বলিল—সমীর, মস্ত কবি হয়ে উঠলি যে!

সমীরও হাসিতে হাসিতে জবাব দিল—বাংলা মায়ের কোলে জন্মিয়ে সবারই কবি হতে সাধ যায়। আমার অপরাধ কি।

সহসা চোখের সম্মুখে জমিদারের বিশাল ভবন ভাসিয়া উঠিল। সমস্ত অট্টালিকা চূণকাম করিবার পর শুভ্রশ্রী ধারণ করিয়াছে। অরুণ অনুভব করিল তাহারই জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া ঐ বিশাল পুরীর অভ্যন্তরে জননী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য আকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতেছেন। বৃহৎ ফটকের ভিতর দিয়া বিপুলকায় হস্তী ভিতরে প্রবেশ করিল। দুই পার্শ্ব হইতে সিপাই প্যায়দা, কর্ম্মচারী, অরুণকে অভিবাদন করিতে লাগিল। অরুণ স্মিতহাস্যে সকলকে প্রত্যভিবাদন করিল।

অরুণ ও সমীর মনমোহিনীর পদতলে প্রণত হইল। তিনি দুইজনেরই মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—পথে কোনও কষ্ট হয় নি তো বাবা?

অরুণ কহিল—না মা। দুজনে খুব আনন্দেই আসা গেছে এবার।

জননী সহাস্যে কহিলেন—কিন্তু তোদের তো আজ আসবার কথা ছিল না। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে ভাবলাম, হল কি। ছুটি কি হয়ে গেল?

সমীর এতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে এই অপূর্ব্ব মাতৃ-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়াছিল। তাঁহার মুখ চোখ দিয়া যেন স্নেহ উছলিয়া পড়িতেছে। সমীর ভাবিল—সাধে কি অরুণ মায়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়। এমন মা তাহার থাকিলে সেতো একদিনের জন্যও ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। মনমোহিনীর

কথার উত্তরে সমীর হাসিয়া বলিল—ছুটির এখনও তিনদিন বাকি। কিন্তু অরুণ—।

অরুণ কপট ভ্রুকুটি করিয়া কহিল—সমীর আমার নামে লাগিও না বলছি।

মনমোহিনী সস্নেহনেত্রে পুত্র এবং পুত্রের বন্ধুর মুখের দিকে চাহিলেন।

সমীর হাসিয়া কহিল—অরুণ কিছুতে থাকতে চাইলো না। বল্লো মায়ের জন্য বড্ড মন কেমন করছে!

অরুণ কৃত্রিম কোপের সুরে কহিল—আমি কি তাই বলেছি?

সমীর হাসিতে হাসিতে কহিল—তাতে দোষই বা হয়েছে কি এত! এ কথা তো শুধু মাকেই বল্লুম। কলেজের কোনও ছেলের কাছে তো বলিনি যে ঠাট্টা করবে!

অরুণ হাসিয়া কহিল—তাও তুমি পার।

সমীর জবাব দিল—আমি বিশ্বাসঘাকতক? আচ্ছা মাই বলুন!

মাতা পুলকিতচিত্তে উভয় বন্ধুর মিথ্যা কলহ শুনিতেছিলেন। সমীরকে দেখিয়া তাঁহার একটা ভাবনা চুকিয়া গেল। পুত্র তাহা হইলে উপযুক্ত বন্ধুই নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছে। তিনি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—ঝগড়া তোরা পরে করিস্। এখন হাতমুখ ধুয়ে কিছু মুখে দে। মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গেছে!

সেদিন মধ্যাহ্নের পর মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া অরুণ শুইয়াছিল আর মনমোহিনী পরম স্নেহভরে পুত্রের চুলগুলির ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিতেছিলেন। অরুণ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—তুমি এত রোগা হয়ে গেছ কেন মা?

জননী একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া কহিল—কোথায় আবার রোগা হয়ে গিয়েছি রে?

—আমার চোখকে তো ফাঁকি দিতে পারবে না মা। তুমি নিশ্চয়ই ভাল করে খাওয়া দাওয়া কর না।

জননী মৃদু হাসিয়া কহিলেন—না, উপোস করে থাকি।

অরুণ কহিল—ঠাট্টা নয় মা। অমন করতো আমি আর কলকাতায় যাব না।

—এখানে আমার খাওয়ার তদারকের জন্য থেকে যাবি নাকি? মাতা হাসিয়া উঠিলেন।

পুত্র ম্লান মুখে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—তোমার কাছে না থাক্‌লে যে আমার বড় কষ্ট হয়!

মাতা পুত্রের মস্তকে গভীর স্নেহে চুম্বন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সমীর সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অরুণ উঠিয়া বসিল। মনমোহিনী তাহাকে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিতে বলিলেন।

অরুণ কহিল—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—ছাদে উঠে গ্রামের চার পাশটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। ঐ নদীর দিকটাই চমৎকার।

মনমোহিনী কহিলেন—বেলা পড়লে দু'জনে নদীর ধার দিয়ে একবার ঘুরে আসিস্‌। আর গ্রামে বেড়াবার জায়গাই বা কই?

সমীর কহিল—না মা, গ্রামের মধ্যে বেড়াবার জায়গা যত এমন কি সহরে পাওয়া যায়? নদীর ধার, বড় বড় মাঠ পড়ে রয়েছে—যত ইচ্ছে বেড়ানো চলে। আর কলকাতা সহরে রাস্তায় বের হলেই মানুষের ধাক্কা। না হয় গাড়ী মোটর চাপা পড়বার ভয়। প্রাণ একেবারে হাঁপিয়ে ওঠে। এখানে এসে যেন সহজে নিশ্বাস ফেল্‌ছি।

মনমোহিনী প্রশংসমান দৃষ্টিতে সমীরের দিকে চাহিলেন। অরুণ কহিল—সমীর কবি কিনা, তাই পাড়াগাঁ এত ভাল লাগছে।

সমীর সহাস্যে জবাব দিল—পাড়াগাঁ তো এই নতুন দেখছিনে—আমাদের বাড়ীও সহরে নয়।

কথায় কথায় মনমোহিনী সমীরের বাড়ীর সংবাদ জানিয়া লইলেন। আরও বুঝিলেন, পিতৃমাতৃহীন সমীরের স্নেহযত্ন করিবার আপনার লোক কেহ নাই। তিনি সস্নেহে সমীরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—সমীর, এরপর যখন সুযোগ ও সুবিধা হবে—তখনই আমার কাছে আস্‌বে বল ?

উজ্জ্বল আননে সমীর কহিল—নিশ্চয়। এ আর বলে দিতে হবে না মা। এরপর হয়তো আমিই অরুণকে তাগিদ দিয়ে নিয়ে আস্‌বো।

তাহার কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল।

বিজয়া দশমীর পরদিন প্রাতে একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা মনমোহিনীকে প্রণাম করিল। তিনি সাগ্রহে এই গৌরবর্ণা বালিকাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর মা আসেনা কেন গৌরী ?

গৌরী হাসিমুখে কহিল—মা আজ আসবে। অরুণদাদা কৈ, তাকেও ল প্রণাম করতে হবে।

মনমোহিনী হাসিয়া কহিলেন—তা করতে হবে বৈকি। ছাখো খুঁজে—কোথায় গেল।

—আচ্ছা মাসীমা, সে আমাদের বাড়ী গেলনা কেন ?

—ও কাল যায়নি বুঝি ? তা বেশ, তাকে সঙ্গে কারুর নিয়ে যা।

এই সময় সমীর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনমোহিনী বলিলেন—একে প্রণাম কর গৌরী। সমীর তোর দাদা হয়—অরুণের বন্ধু।

গৌরী একবার অপরিচিতের মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া, অরুণদাকে খুঁজে দেখি' বলিয়া একরূপ ছুটিয়া চলিয়া গেল।

মনমোহিনী বলিলেন—অরুণকে খুঁজে পাস্‌তো—এখানেই আসিস্। সেই সঙ্গে সমীরও যাবে।

সমীর মুগ্ধনেত্রে এই অপরূপ সুন্দরী বালিকার দিকে চাহিয়াছিল, গৌরী চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিল—বাঃ ভারী সুন্দর মেয়েটি তো !

মনমোহিনী কহিলেন—যেমন দেখতে সুন্দরী, স্বভাবও তেম্নি। আমাদেরই প্রতিবেশী হরলাল চক্রবর্ত্তীর মেয়ে। গৌরীর বাপ-মা দুইই ভাল লোক। অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয় বটে—তবু এমন মহৎ পরিবার এ গাঁয়ে আছে কিনা সন্দেহ। তাই আমি ওদের ভালবাসি। আর সেইজন্যেই—। কি কথা বলিতে বলিতে মনমোহিনী সহসা থামিয়া গেলেন।

সমীর জিজ্ঞাসা করিল—আর সেইজন্যই কি মা?

মনমোহিনী সহাস্যে বলিলেন—মানুষের আশার তো অন্ত নাই। অরুণ মানুষের মত মানুষ হবে—তারপর তার বিয়ে দেব এই আমার আকাঙ্খা। যদি সত্যই তেমন দিন আসে—তখন এই গৌরীকেই আমার পুত্রবধূ করবো ঠিক করেছি। কিন্তু মানুষের সব আশাই কি সফল হয় বাবা?

স্মিত হাসিয়া সমীর বলিল—এ আর বেশী কথা কি মা। অরুণের মত সুপাত্র আর কয়টি আছে? গৌরীর বাপ-মা তো এমন জামাই পেলে ভাগ্যবান্—।

বাধা দিয়া মনমোহিনী কহিলেন—এ যে কার সৌভাগ্য তাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। টাকাতেই তো আর ভাগ্য নির্ণয় হয় না!···এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গেলেন। তারপর হাসিয়া কহিলেন—এ নিয়ে আমি কারও সাথেই আলোচনা করিনি। শুধু তোমাকেই বল্লুম। আর সেদিনের এখনও অনেক দেরী। অরুণের লেখাপড়া শেষ না হলে বিয়ের কথা উচ্চারণ আমি করছিনে। আর গৌরীকেও তো দেখলে—নিতান্তই ছোট্টটি।

সেদিন অরুণ ও সমীর গৌরীদের বাড়ী বিজয়ার প্রণাম করিতে গেল। গৌরীর পিতা হরলাল দাওয়ার উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, অরুণদের দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া সহাস্যমুখে অভ্যর্থনা

করিয়া মাদুরে বসিতে বলিলেন। অরুণ ও সমীর দুইজনেই তাঁহাকে প্রণাম করিল।

এমন সময় কোথা হইতে গৌরী ছুটিয়া আসিল, কহিল—বাঃ এতদেরীতে বুঝি তোমাদের আসা হলো। আমাকে না বল্‌লে—এখুনি যাবে। ভারী কথার ঠিক তো!

অরুণ হাসিয়া কহিল—না, আমাদের কথার ঠিক নেই—তোরই খুব কথার ঠিক। মাসীমা কোথায় রে?

মাথা ঝাঁকাইয়া গৌরী কহিল—মা তোমাদের জন্য সব সময় বসে থাক্‌বে নাকি! এখুনই চান করতে গেল। যেমন দেরী করে আসা—তেম্‌নি জব্দ। পেন্নাম না করে তো আর যেতে পারছো না।

হরলাল মৃদু হাসিয়া কহিলেন—যাও গৌরী, তোমার মাকে একটু তাড়াতাড়ি আসতে বল।

কিছুক্ষণ পরই শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া সুলোচনা দেবী আসিলেন, হাসিমুখে কহিলেন—আমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ছো বুঝি বাবা?

অরুণ কহিল—না বেশীক্ষণ আসিনি তো? তাহারা দুইবন্ধু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইল। সুলোচনা দেবী তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—এই বুঝি তোমার বন্ধু। বেঁচে থাক, সুখে থাক—বিদ্বান হও।······তারপর তিনি গৌরীকে কহিলেন—এইখানে জায়গা করে দেতো গৌরী—একটু জল খেতে দি!

অরুণ কহিল—আমরা তো খেয়েই এসেছি—আর কেন?

সুলোচনা দেবী কহিলেন—তবু একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হয় আজকের দিন।

গৌরী আসন পাতিয়া দিল। সুলোচনা দেবী দু'খানি রেকাবীতে

নারকেল নাড়ু, সন্দেশ, মুড়ির মোয়া, ক্ষীরের তক্‌থি, তিলের খাজা প্রভৃতি গ্রাম্যসুলভ খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া আনিলেন। দুই বন্ধু খাইতে বসিল।

সমীর এ পর্য্যন্ত কোনও কথাই বলে নাই বটে—কিন্তু এই ক্ষুদ্রগৃহের পরিচ্ছন্নতা, সৌম্যমূর্ত্তি গৃহকর্ত্তা, স্নেহময়ী গৃহিণী এবং সদাহাস্যময়ী গোলাপ কুঁড়ির মত সুন্দরী বালিকা গৌরীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া মোহিত হইতেছিল।

ফিরিবার পথে অরুণ কহিল—এদের মত এমন ধর্ম্মনিষ্ঠ সরল ভদ্রপরিবার আর এ গ্রামে নাই।

সমীর সহাস্যে কহিল—সে আমি বুঝতে পেরেছি।

অরুণ কহিল—আমার মায়ের সাথে গৌরীর মায়ের অত্যন্ত সদ্ভাব—

—তাও জানি। এর চেয়ে আরও গুপ্ত কথা আমার জানা আছে।

বিস্মিত হইয়া অরুণ কহিল—তাই নাকি? সে কথাটি কি শুনি?

সমীর মৃদু হাসিয়া কহিল—এই পরিবারের সঙ্গে জমিদার গৃহের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। গৌরী একদিন জমিদার গৃহের লক্ষ্মী হয়ে অবস্থান করবে।

অরুণ সমীরের পৃষ্ঠদেশে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—তোমার বথামির শাস্তি এই।

সমীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সহাস্য জবাব দিল—এ যে নতুন রকমের বকশিস্ মিললো অরুণ!

বছর পাঁচেক পরের কথা বলিতেছি। অরুণ তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে এম, এ, পড়িতেছিল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র উপরন্তু সে একজন ধনী জমিদার ইহাও সকলে শুনিয়াছিল। এই জন্য অনেকেই অরুণের স্তাবক হইয়া পড়িয়াছিল। কলেজের সভাসমিতি এমন কি ছাত্র সম্পর্কীয় কোনও অনুষ্ঠান হইলেই অরুণের ডাক পড়িত এবং অনেকস্থলে তাহাকেই সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি হইয়া কার্য্য পরিচালনা করিতে হইত।

আই, এ, পাশ করিবার পর অরুণ পৃথক বাড়ী ভাড়া করিয়াছিল এবং তাহার এই ক্ষুদ্র আলয় অনেক সময় ছাত্রবন্ধু সমাগমে সরগরম হইয়া থাকিত।

সেদিন যতীন মুখার্জ্জি এবং আরও কয়েকজন যুবক অরুণকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল—তাহাকে 'যুবক সমিতির' সভ্য হইতে হইবে। যতীনবাবু দৈনিক ও মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিত এবং যুবক ছাত্ররাই যে দেশের আশা ভরসার স্থল ইহাই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। এই জন্য সে কিছুদিন 'যুবক সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করিয়াছিল। এই সমিতির প্রধান কার্য্য ছিল—স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার, পতিতার উদ্ধার, ধর্ষিতা রমণীর আশ্রয়দান—এক কথায় মাতৃজাতির সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধান করা। অবশ্য অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, হিন্দুমন্দির রক্ষা, শুদ্ধি প্রভৃতি হিন্দুসংগঠনের কার্য্যও ইহাদের প্রোগ্রামভুক্ত ছিল।

অরুণ কহিল—আপনাদের সমিতিতে যোগ দেবার আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু শুধু শুধু নাম লিখলেই তো আর কাজ হবে না।

যতীন মুখার্জ্জি উৎসাহিত হইয়া কহিল—শুধু সভ্য হলেই হবে না আপনাকে আমাদের মধ্যে নেমে কাজ করতে হবে। দেশে কত কাজ পড়ে রয়েছে, যুবক ছাত্ররা যদি এদিকে দৃষ্টি না দেয় তাহলে এ জাতির উন্নতি হবে কি করে বলুন। আপনাকে শুধু চাই বল্লে ঠিক হয় না—আপনাকে কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হতে হবে। আপনাকে যুবক সমিতির সভাপতি করবো ঠিক করেছি।

অরুণ সহাস্যে কহিল—তাহলে একেবারে ঠিক করে এসেছেন বলুন।

যতীন কহিল—নিশ্চয়। আপনি দেশের গৌরব। শুধু অর্থের দিক নয় আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এই সব লোক আমরা যদি না পাই—অন্যে কোন আদর্শে অনুপ্রাণীত হয়ে আমাদের কাজে যোগ দেবে ?

যতীনের কথায় অরুণ মুগ্ধ হইয়া কহিল—আপনাদের যদি মনে হয় আমাকে দিয়ে যুবক সমিতির উপকার হবে আমার কোনও আপত্তি নাই। আপনাদের সমিতির সভ্য করে নিতে পারেন।

যতীন মুখার্জ্জি সফল মনোরথ হইয়া তাহাদের খাতায় অরুণের নাম লিখিয়া লইল

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের সমিতি এপর্য্যন্ত কি কি কাজ করেছে ?

যতীন বলিল—এই তো মাত্র পাঁচ ছয় মাস আমরা সমিতি স্থাপন করেছি—এর মধ্যে যে কাজ হয়েছে তারই তুলনা হয় না। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়ে হিন্দুর মন্দির যে রক্ষা হয়েছে সে এই সমিতির যুবকদের দিয়ে। আর অনেক ধর্ষিতা নারীর সদ্‌গতিও এই সমিতি করে দিয়েছে। পতিতাদের

মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগিয়ে তোলবারও চেষ্টা চল্‌ছে।

অরুণ কহিল—হয়তো অনেক তরুণ যুবক আপনাদের সমিতির সভ্য—তাদের দিয়ে ঐ শেষের কাজটি করা তো আমার উচিত বলে মনে হয় না। মানুষের মনকে তো বিশ্বাস নাই। ঐ সব স্থানে গমনাগমনের ফলে হয়তো তাদের চরিত্র কলুষিত হয়ে যেতে পারে।

যতীন বলিল—কিন্তু একটা দিক দেখলেই তো চল্‌বে না। যে স্থানটা কদর্য্য, পূতিগন্ধময়, সমস্ত ব্যাধির লীলাক্ষেত্র—সেইটাকে উপেক্ষা করলে রোগের উপশম হবে না। আমাদের সেই দূষিত বস্তুকে শোধন করে নিতে হবে। হয়তো এই আবর্জ্জনা পরিষ্কারের ফলে দুই একজনের পতনও হবে কিন্তু সেদিকে দৃক্‌পাত করলে আমাদের চল্‌বে না। একবার ভাবুন দেখি—সমস্ত অকল্যাণকে শোধন করে যদি বিশ্বের কাজে ধর্ম্মের কাজে লাগাতে পারি—তাহলে দেশের কি উপকার হয়! সমাজকে ব্যাধি থেকে মুক্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সেই ব্যাধি থেকে দূরে থাকলে কোনও উপকার হবে না। এই করেই তো হিন্দুসমাজ এত শক্তিশূন্য হয়ে পড়েছে।

যতীনবাবু স্তব্ধ হইল। তাহার ভাবের আতিশয্য দেখিয়া অরুণ কিছু বলিল না।

যতীনবাবু পুনশ্চ কহিল—অবশ্য আপনি যে কথা বললেন—সে দিকটাও আমাদের দেখতে হয় বৈকি। যেমন কার্যের শ্রেণীবিভাগ আছে তেম্‌নি লোকেরও শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এই যে অঘোর বাবুকে দেখছেন—ইনি দাঙ্গার সময় একাই মন্দির রক্ষা করেছেন। ইচ্ছা করলে পঞ্চাশজনের মাথা ইনি নিতে পারেন। কিন্তু মনটি এঁর বড় ভাবপ্রবণ, অত্যন্ত কোমল। সুতরাং স্ত্রীলোক সম্পর্কে কোনও কাজই এঁকে দিই নে। আর এই যে শিশিরবাবু—গায়ে একবিন্দু শক্তি নাই অথচ মনের বল

কি দৃঢ়! পৃথিবীর এমন কোনও স্ত্রীলোক নাই যে এঁকে মোহিত করতে পারে।

অরুণ অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া যতীনবাবুর নির্দ্দেশিত যুবক দুইটির পানে চাহিল। যতীনবাবু পুনরায় বলিতে লাগিল—আমাদের এ পর্য্যন্ত যত কাজ হয়েছে সে অসামান্য হলেও আপনাদের মত যুবক পেলে এর শক্তি আরও বেড়ে যাবে। আমি এম্‌নি লোকেরই সন্ধানে আছি। এখন থেকে সমিতির ভার আপনাকেই নিতে হবে—আর সেজন্য মাঝে মাঝে বিরক্ত না করেও পারবো না। আজ তাহলে চল্লুম।

এই বলিয়া নমস্কার করিয়া সদলবলে বাহির হইয়া গেল।

তাহারা চলিয়া গেলে অরুণের মনটা কেমন খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল—যতীন মুখুজ্যে মুখে যাহাই বলুক—অন্তর হয়তো ঠিক তেম্‌নি পবিত্র নয়। যে কার্য্যের অহঙ্কার ইহারা করিয়া গেল—হয়তো ততখানি সত্য নাও হইতে পারে। ঠিক না জানিয়া শুনিয়া যুবক সমিতির সভ্য হওয়া উচিত হয় নাই।

কিছুক্ষণ পর সমীর আসিল। অরুণ কহিল—আজ যুবক সমিতির সভ্য হয়েছি।

সমীর কহিল—যতীনবাবু এসেছিল বুঝি? সে ঠিক লোক চিনেছে।

—এর আর চেনাচেনি কি? তোমাকেও কিন্তু সভ্য হতে হবে।

হাত জোড় করিয়া সমীর কহিল—মাপ কর ভাই। ওসব আমার পোষাবে না। আর আমাদের মত গরীব ছাত্রের দিকে যতীন মুখু ঘেঁষে না। সে চালাক লোক!

অরুণ বিরক্ত হইয়া কহিল—এতে আর ধনী দরিদ্রের কথা কোথায় আসে?

সমীর হাসিতে হাসিতে কহিল—তা আসা উচিত নয় বটে, কিন্তু যেখানে মধু সেখানেই মৌমাছি, একি জানানা? কিন্তু সে কথা থাক ভাই। আমি সভ্য হতে না চাইলেও এটা জানি উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হলে এই সমিতি অনেক কাজ করতে পারে। যুবকরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে অনেক অসম্ভবও সম্ভব হবে।

অরুণ সহাস্যে কহিল—শুধু বক্তৃতাতেই চলবে না। তুমিও সেই যুবকদেরই একজন—একথা কেন ভুলে যাও?

—ভুলিনি। কিন্তু এখন এসব আমার পোষাবে না। আর কোনও কাজ না করলে শুধু শুধু সভ্য হওয়াও যা না হওয়াও তাই! হুজুগ জিনিষটা আমি নেহাৎ অপছন্দ করি।

অরুণ এ লইয়া আর কোনও প্রতিবাদ করিল না বটে, কিন্তু সে কি জানি কেন বিমর্ষ হইয়া রহিল। সেইদিনই সে জননীকে একখানি পত্র লিখিয়া জানাইল—মা, আমি যুবক সমিতির সভ্য হইয়াছি; এই সমিতি যুবক সম্প্রদায় দ্বারা গঠিত। নানাবিধ সংস্কার সাধন করিয়া হিন্দু সমাজের উন্নতি বিধানই ইহার উদ্দেশ্য। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর প্রতিষ্ঠাতা। লোকটিকে দেখিয়া আমার মনে হয়—ইনি মুখে যতটা বড়াই করেন, কাজে ততটা নয়। হয়তো বড় কাজ করিতে নামিলে এম্নি বড় বড় কথা না বলিলে চলে না। তবে ইচ্ছা করিলে যে এই সমিতি অনেক বড় কাজ করিতে পারিবে তাহার ভুল নাই। আমি সমীরকেও সভ্য হইতে বলিতেছি—কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করে না।

যথাসময়ে পত্রের উত্তর আসিল। মনমোহিনী লিখিয়াছেন—তুমি যুবক সমিতির সভ্য হইয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। শুধু হুজুগে না মাতিয়া ইচ্ছা থাকিলে এই সমিতি অনেক বড় কাজ করিতে পারিবে। যাহা হউক, তোমার পক্ষে নিজের গ্রামেও কার্য্যের অভাব হইবে না। তোমার

বিস্তীর্ণ জমিদারীর প্রজার উন্নতিকল্পে যদি মনযোগ দাও—তাহা হইলে অনেক কাজ করিতে পারিবে। কবে তুমি লেখাপড়া শেষ করিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিবে—আমি সেই আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি। আর তোমার প্রজারাও তোমাকে তাহাদের মধ্যে পাইবার জন্য ব্যাকুল। মানুষকে ভালবাসা দিয়া কিরূপ আকর্ষণ করা যায়—তুমি যখন কার্য্যক্ষেত্রে নামিবে তখনই বুঝিতে পারিবে।

জননীর পত্র পাইয়াও অরুণ বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিল না। তবে কি মাতাও মনেপ্রাণে তাহার যুবক-সমিতিতে যোগদান অনুমোদন করেন নাই ?

বেলা তখন আটটা। মণিমালিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও উঠিবে কিনা ভাবিতেছিল। শরীরের জড়তা তখনও কাটে নাই। এ কয়দিন উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগরণের ফলে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িলেও মন বেশ প্রফুল্ল ছিল। লিলি থিয়েটারের সে একজন অভিনেত্রী। সে মাত্র অল্পদিন হইল অভিনয় ক্ষেত্রে নামিয়াছে—কিন্তু ইহারই মধ্যে সুযশ তাহার ছাইয়া গিয়াছে। প্রতিরাত্রে তাহার অভিনয় দেখিয়া অগণিত দর্শক বাহবা দিতে থাকে, কেহ কেহ বা মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ফুলের মালা, ফুলের তোড়া নিক্ষেপ করে। মণিমালিনীর হৃদয় উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া ওঠে, শরীরের অবসাদ মনের উত্তেজনায় ঢাকা পড়িয়া যায়। কোন দৃশ্যের অভিনয় শেষ করিয়া যখনই মণিমালিনী নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া বসে—অমনি লিলি থিয়েটারের সত্বাধিকারী প্রতুল গাঙ্গুলী তাহার নিকটে আসিয়া উৎসাহিত করিয়া যায়, কখনও কখনও বলিয়া থাকে—এরই মধ্যে লোকে বল্‌ছে, বাংলা ষ্টেজে মণিমালিনীর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাক্‌বে। তারপর হাসিতে হাসিতে বলে—তুমি আমার হাতে গড়া একথা যেন সব সময় মনে থাকে।

মণিমালিনী কটাক্ষ হানিয়া বলে—একথা কি ভোলবার ?

প্রতুল মাথা ঝাঁকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলে—সবাই প্রথমটা ঐ কথাই বলে, তারপর যেই ডানা উঠলো তখন ধরে রাখে কার সাধ্য।

মনিমালিনী মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলে—আচ্ছা, আমি কি করি দেখে নিও।

প্রতুল তাহার গালে ঠোনা মারিয়া আবার অন্য কাহারও মন জোগাইতে যায়।

মণি ভাবিতেছিল—তাহার জীবনে যে এমন সুদিন আসিবে, একি সে কোনওদিন ধারণা করিয়াছিল? সে কুম্ভকারের মেয়ে, তাহার পিতা হাঁড়ি কলসী নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে পিতার একমাত্র আদরের কন্যা—তাই তাহাকে গৃহকার্য্যে তেমন সুশিক্ষিতা করে নাই, বরঞ্চ গ্রামের পাঠশালায় পাঠাইয়া লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যখন তাহার বিবাহ হইল তখন সে একটু লিখিতে পড়িতে পারিত বটে—কিন্তু ঘরকন্নার কোনও কাজই তাহার দ্বারা হইবার উপায় ছিল না। তাহার স্বামী জাত-ব্যবসায় মন্দ আয় করিত না। সে তাহার যুবতী স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। কিন্তু মণিমালিনী প্রথম হইতেই শ্বাশুড়ী ননদের কুদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। গৃহস্থ বাড়ীর বধূ, গরীব গৃহস্থের মেয়ে সে যে একটি কুটা ভাঙ্গিয়া উপকার করিবে না—ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারিত না। সুতরাং তাহার কড়া শাসন চলিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। একগুঁয়ে মণিমালিনী শরীরের উপর অত্যাচার নীরবে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে লাগিল, অথচ কাজ করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিল না। তাহার স্বামী তাহার গায়ে কোনওদিন হাত তোলে নাই, বরং মিষ্ট কথায় তাহার মতি ফিরাইতে চেষ্টা করিত। কিন্তু মণিমালিনী তাহার স্বামীর কথাও গায়ে মাখিত না। সে তাহার স্বামীর কদাকার চেহারা দেখিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। স্বামী সম্বন্ধে তাহার মনে যে উচ্চ ধারনা ছিল—তাহা পূরণ হইল না দেখিয়া সে মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। তাহাদের গ্রামের পাঠশালায় তাহাদেরই সঙ্গে গ্রামের মিত্তিরদের

মেয়ে সুরবালা পড়িত। মণিমালিনীর বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। যখন বিবাহের বেশে সুরবালার সুশ্রী সুন্দর বরকে দেখিল—তখন তাহার মনে হইয়াছিল তাহার ভাগ্যেও বুঝি এমনি রূপবান স্বামীলাভ হইবে। কিন্তু যেদিন বিবাহের রাত্রে লালপেড়ে কোড়া ধূতি ও চাদর পরিহিত, গলায় তুলসীর মালা সংযুক্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তাহার স্বামীকে দেখিল—সেদিন নিরাশায় তাহার ছোট্ট বুকখানি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। হায় রে! এই তাহার বর! ইহারই ঘরে তাহাকে চিরকাল থাকিতে হইবে। ইহাকে সে ভালবাসিবে কি করিয়া? সে মনে করিল—ইহা ভগবানের অবিচার। কেন সুরবালার বর অত সুন্দর হইল? সে তো সুরবালা অপেক্ষা লেখাপড়া কম শেখে নাই। আর সুরবালা কি তাহার চেয়েও দেখিতে সুশ্রী?

এই অসন্তোষের আগুন বিবাহের পর তাহাকে ক্রমাগত দহন করিতে লাগিল। এমনি করিয়া পাঁচটি বছর কাটিয়া গেল সে কিছুতেই পোষ মানিল না। শ্বাশুড়ী ননদের নির্য্যাতন, স্বামীর স্নেহ ভালবাসা কিছুই তাহার মনকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

গ্রামের কয়েকটা অসচ্চরিত্র যুবক কিছুদিন হইতে মণিমালিনীর স্বামীর গৃহের আনাচে কাণাচে ঘুরিয়া বেড়াইত। মণিমালিনী যেন বুঝিয়াছিল ইহাদের দৃষ্টি তাহারই উপর পতিত হইয়াছে। সে স্বামীকে এ সম্বন্ধে কিছুই জানাইল না—অথচ এই যুবকদেরও প্রশ্রয় দিল না।

সেদিন রাত্রে মণিমালিনীর স্বামী বাড়ী ছিল না। মণিমালিনী একাকী তাহার ঘরে শুইয়াছিল। গভীর রাত্রে সহসা তাহার ঘুম ভাঙ্গিতেই সে বুঝিল—কে যেন তাহার মুখ বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। সে চীৎকার করিতে চাহিল—কিন্তু মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইল না। সে অনুভবে বুঝিল তাহাকে কয়েকজন লোক কাঁধে করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতেছে।

মণিমালিনীর তখনও জ্ঞান ছিল কিন্তু সে কিছুই করিতে পারিল না। কিছুদূর এইরূপে বহন করিয়া তাহারা নদীর ধারে আসিল তারপর একখানি নৌকায় তাহাকে তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। দূরে গ্রামের মধ্যে তখন সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। দূরে লণ্ঠনের মৃদু আলোক দেখা গেল—অনেকে খোঁজ করিতে করিতে নদীর দিকেই আসিতেছিল। কিন্তু নৌকার লোকেরা তখন দ্রুত দাঁড় বাহিয়া অনুকূল স্রোতে গ্রাম ছাড়িয়া অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর নৌকা তীরে লাগিল। মণিমালিনীর তখনও মুখ বাঁধা ছিল—সে দেখিল কতগুলি লোক নৌকা হইতে অবতরণ করিতেছে। নৌকা আবার চলিতে লাগিল। একজন লোক তাহার মুখের বাঁধন খুলিয়া দিতেই মণিমালিনী উঠিয়া বসিয়া কাপড় মাথায় টানিয়া দিল।

লোকটি নিকটে বসিয়া সহাস্যে কহিল—অমন করে মুখ ঢেকে বসলে কেন মালিনী? আমার দিকে চাও দেখি।

মণি ঘোমটার আড়াল হইতে লোকটির দিকে চাহিল এবং দেখিয়াই চিনিতে পারিল—এ তাহাদের গ্রামের তরুণ জমিদার—বরেন্ মিত্তির।

সাহস করিয়া মণি কহিল—আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনি?

বরেন হাসিয়া কহিল—ভয় কি মণি! তোমার এই রূপ যৌবন এমন খাপসুরত চেহারা—এ কি একটা অপদার্থ ছোটলোকের ভোগের জন্য? তোমাকে আমি রাণী করবো মালিনী!

মণিমালিণীর বুক কাঁপিয়া উঠিল—হাজার হউক, সে হিন্দুঘরের রমণী, কুলস্ত্রী। কিন্তু এখন পরিত্রাণের উপায় কি! এমন সময়েও তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল তাহার স্বামীর উপর। এমন লোকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে যে তাহার নিজের স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষারও ক্ষমতা নাই!

সে কাতরকণ্ঠে কহিল—দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন।

বরেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মণিমালিনী বুঝিল—নিস্তার নাই। সে যতই কাকুতি মিনতি করুক এই হৃদয়হীন জমিদারের অনুগ্রহ পাইবার আশা নাই। সে অগত্যা চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরেই নৌকা তীরে লাগিল। বরেণ কহিল—এইবার ট্রেণে চড়ে কলকাতায় যাব। রাস্তায় যদি চেঁচাও কিংবা লোক জানানোর চেষ্টা কর, তাহলে তখনই তোমাকে খুন করবো—এ যেন মনে থাকে।

মণিমালিনী উত্তর দিল না। তবে তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতেছে শুনিয়া কি জানি কেন তাহার মন হৃষ্ট হইয়া উঠিল। কলিকাতায় বরেনের ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল—মণিমলিনীকে লইয়া সে সেখানেই উঠিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই মণিমালিনীর পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের সহিত পরিচয় হইল। সে লিলি থিয়েটারের অভিনেত্রী। মণি সমস্ত কথা তাহাকে জানাইল এবং ইহাও বলিল যে কোনও সুযোগ পাইলেই সে এথান হইতে পালাইতে পারে। প্রতুল গাঙ্গুলী প্রায়ই সেই অভিনেত্রীর বাড়ী আসিত—সেও সমস্ত কথাই শুনিল। তাহারই সাহায্যে মণিমলিনী পলায়ন করিল। প্রতুল গাঙ্গুলী রতন চিনিত। মণিমালিনীর হাব ভাব, কথাবার্ত্তায় সে বুঝিল—বিধাতা তাহাকে এমন ধাতুতে গড়িয়াছেন যাহাতে তাহার স্বামীর ঘরে মন বসিবে না। সে তাহার মনের অভিপ্রায় জানাইল। মণিও স্বীকার করিল—অভিনেত্রী হইতে তাহার আপত্তি নাই।

সেই হইতে প্রতুল গাঙ্গুলীর শিক্ষায় ও সহায়তায় মণিমলিনী রঙ্গমঞ্চের একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কলিকাতা সহরে তাহার নাম জানে না এমন লোক বিরল—তাহার সঙ্গীতে, তাহার বক্তৃতায়, তাহার ভাবের অভিব্যক্তিতে দর্শকগণ মুগ্ধ, পুলকিত।

সেদিন বৈকালে যতীন আসিয়া কহিল—অরুণবাবু, চটপট কাপড় জামা পরে নিন্—একবার লিলি থিয়েটারে যেতে হবে।

অরুণ যতীনের ব্যস্ততা দেখিয়া সহাস্যে কহিল—ব্যাপার কি যতীনবাবু? থিয়েটারে যাবার এত তাড়া কিসের? কোনও ভাল প্লে টে—।

বাধা দিয়া যতীন কহিল—থিয়েটারে দেখবার সখ অনেকদিন ছেড়েছি। সেজন্য নয়। আমাদের সেই ৩৭ নম্বর কেস্টার অনেকটা ক্লু পাওয়া গেছে।

অরুণ বিস্মিত হইয়া কহিল—কি রকম?

যতীন হাতের কয়েকখানা মোটা মোটা বাঁধাই খাতা টেবিলের উপর নামাইয়া, তাহার মধ্যে একখানি খুলিয়া কহিল—যতগুলি কেস্ সমিতির হাতে আছে সবই এই খাতায় নোট করা রয়েছে।

—সে তো শুনেছি যতীনবাবু। কিন্তু থিয়েটারে আপনার কিসের ক্লু সে তো বুঝতে পার্‌ছিনে।

যতীন খাতা খুলিয়া পড়িল—৩৭নং স্থান পলাশপুর। নবীন কুম্ভকারের স্ত্রী মালিনী—২রা বৈশাখ রাত্রি একটায় অপহৃতা। মালিনীর বয়স—আঠারো উনিশ। দুর্ব্বৃত্তগণ নৌকাযোগে পলায়ণ করে গ্রামের লোক পিছু লয়—কিন্তু তাহারা উদ্ধার করিতে সক্ষম হয় না। খাতা হইতে মুখ তুলিয়া যতীন কলিল—এই মালিনীর সন্ধান অনেকটা পাওয়া গেছে। লিলি থিয়েটারের মণিমলিনীই নবীনের স্ত্রী মালিনী।

বিস্মিত হইয়া অরুণ কহিল—বলেন কি যতীনবাবু? কোথাকার কোন পলাশপুরের অখ্যাত অজ্ঞাত নবীনের স্ত্রী মালিনী—আর কোথায় বাংলা থিয়েটারের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মণিমালিনী? যার নাম কলকাতা সহরে লোকের মুখে মুখে ফিরছে। আমি কোনও দিন থিয়েটারে যাইনি—তবু দেখুন আমিও তার নাম শুনেছি। মণিমালিনী যে আপনার নবীনের স্ত্রী মালিনী নয় এ আমি না দেখেও বলে দিচ্ছি। শুধু শুধু রাত্রি জাগরণ আর পয়সা খরচ করে কোনও লাভ হবে না।

যতীন মুখুজ্যে একটু ব্যঙ্গ-মিশ্রিত হাসি হাসিয়া কহিল—এ ঠিক যুবক সমিতির ভাবী প্রেসিডেণ্টের উপযুক্ত কথা হ'লো না। কত বড় মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজে নেমেছি এতে এতটুকু কষ্ট স্বীকার করতে সঙ্কুচিত হলে তো চলবে না। আর আমিও একটা বিষয় একেবারে স্থির নিশ্চয় না জেনেই কি এসেছি। এ হলে আর এতদিন এতবড় সমিতিকে চালিয়ে আসতে পারতুম না। কিন্তু সময় আর নাই। ছ'টা বেজে পনরো মিনিট ওদের আজ সাড়ে সাতটায় আরম্ভ।

অরুণ কহিল—আমি তো কোনও দিনই থিয়েটারে যাইনে। আর আমি গেলে বিশেষ কি লাভ হবে তাও বুঝছি নে।

যতীন কহিল—অরুণবাবু, ওসব প্রেজুডিস্ ছাড়ুন। থিয়েটার জিনিষটা এমন কিছু খারাপ নয় যে তা দেখলেই মনের বিকার উপস্থিত হবে। আর যুবক সমিতির সভ্যদের ও রকম পিউরিট্যান্ হলে চলবে না। সেদিন তো আপনাকে বলেছি প্রয়োজন হলে অতি কুৎসিত স্থানেও আমাদের যেতে হয়। সমাজের উন্নতিই আমাদের লক্ষ্য। আর কিছু নয়। না, আর দেরী করবেন না—শীগ্‌গির্ কাপড় চোপড় পরে নিন্।

অগত্যা অরুণকে প্রস্তুত হইতে হইল। পথে যাইতে যাইতে যতীন

কহিল—নবীনও আমার কাছে এসেছে, তাকেও থিয়েটারে পাঠানো হয়েছে, মণিমালিনী তার স্ত্রী কিনা সেই সনাক্ত করতে পারবে।

অরুণ তবুও সন্দিগ্ধ চিত্তে কহিল—ও, তাহলে অনেকদূর এগিয়েছেন দেখছি। কিন্তু আপনার পলাশপুরের নবীন কলকাতার লিলি থিয়েটারের অভিনেত্রী মণিমালিনীর খবর পেল কোথায়?

—বলছি। পলাশপুরের জমিদার—বরেন মিত্তির নবীনের স্ত্রীকে হরণ করে কলকাতায় আনে সে আজ প্রায় বছর খানেকের কথা। কিন্তু বরেন তাকে বশে আনতে পারে নাই। পাশের বাড়ীর কোনও এক অভিনেত্রীর সাথে তার পরিচয় হয়—সেই তাকে উদ্ধার করে লিলি থিয়েটারে ভিড়িয়েছে। একথা অবিশ্যি আর কারও জানবার উপায় ছিল না বরেনই হতাশ হয়ে সমস্ত রাষ্ট্র করেছে। পলাশপুরের সতীশ বোস্ আমাদের সমিতির একজন সভ্য। সেই সন্ধান নিয়ে নবীনকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমার যতদুর ক্ষমতা চেষ্টা করবো এখন ওর বরাত।

অরুণ বক্সের টিকিট কিনিয়া বসিল। থিয়েটার আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে সে কহিল—কৈ যতীনবাবু, আপনার নবীন কোথায়?

যতীন বলিল—সে সব ঠিক আছে। নীচে হরেণবাবুর পাশে বসে আছে। ঐ দেখুন। সে নীচে দর্শকবৃন্দের মধ্যে একজনকে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল—যদি সত্যই মণিমালিনী ওর স্ত্রী হয় তাহলে হয়তো মনের আবেগে নবীন চীৎকার করে উঠতে পারে এই ভেবে আমি বিশেষ করে সাবধান করে দিয়েছি যেন কোনও রকম গোলমাল না করে। কিন্তু দেখছেন না ও কি রকম এ্যাজিটেটেড্ হয়ে উঠেছে, ঠিক হয়ে বসতে পারছে না।

অরুণ হাসিয়া কহিল—পাড়াগাঁয়ের লোক, এই সব দেখে শুনে ঠিক থাকা কঠিন—আমারই যেন ধাঁধা লাগছে।

যথা সময়ে থিয়েটার আরম্ভ হইল। অরুণ মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। অভিনয় প্রথম হইতেই বেশ জমিয়া গেল। মণিমালিনী সত্যই চমৎকার প্লে করিতেছিল। যেমন তাহার গান, তেমনি বক্তৃতা। অরুণ বুঝিল কেন ইহার নাম এমন প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। সে যতীনকে কহিল—এই মণিমালিনী যে নবীন মালাকারের স্ত্রী হতে পারে একি আপনি এখনও বিশ্বাস করেন?

—বিশ্বাস হয় না বটে কিন্তু নীচে একবার চেয়ে দেখুন।······এই বলিয়া সে নবীনের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিল।

অরুণ চাহিয়া দেখিল—লোকটি স্থির থাকিতে পারিতেছে না, একবার উঠিতেছে, বসিতেছে, এপাশ ওপাশ হেলিতেছে, শূন্যে হাত ছুঁড়িতেছে। আর পাশের লোকটি ক্রমাগত তাহাকে স্থির হইয়া বসাইবার চেষ্টা করিতেছে।

যতীন কহিল—বোধ হয় চিনতে পেরেছে নইলে অমন করবে কেন। ভাবছি এখন একটা কাণ্ড করে না বসে।

আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। মণিমালিনী তখন গান করিতেছিল—সহসা একজন উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল—আমার পরিবারকে এখানে ধরে রেখেছে বাবু!······সহসা এই বেসুরো রবে গান থামিয়া গেল, চারিদিকে হইতে শ্রোতৃবৃন্দ তুমুল কোলাহল করিয়া উঠিল—মার শালাকে, মাতলামি করবার আর জায়গা পেলে না। আমোদটাই মাটি করে দিলে হ্যা, বের করে দাও মাতালকে। তখনই থিয়েটারের লোক আসিয়া লোকটিকে ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতে বাহির করিয়া দিল।

যতীন কহিল—যা ভেবেছিলাম তাই। আপনি বসুন, আমি ওর বাসায় ফিরবার ব্যবস্থা করে দিয়ে আসি।

ইহার পর প্লে তেমন ভাল জমিল না, বিশেষ করিয়া মণিমালিনীর

অভিনয়ই অনেকাংশে খারাপ হইয়া গেল। যথাসময়ে থিয়েটার ভাঙ্গিলে ফিরিবার পথে যতীন কহিল—মণিমালিনী যে নবীনের স্ত্রী এতে আর এখন কোনও সন্দেহ নাই।

অরুণ একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল—হবে।

—কিন্তু ওকে এ পথ থেকে ফেরাবো কি করে সেই তো সমস্যা।

অরুণ কোনও কথা বলিল না।

যতীন পুনশ্চ কহিল—কিন্তু সমস্যা যত বড়ই হোক, পূরণ আমাদেরই করতে হবে। রাত অনেক হয়েছে আজ আসি। কাল একটা যুক্তি পরামর্শ ঠিক করা যাবে। এই বলিয়া যতীন প্রস্থান করিল।

অরুণ যখন বাসায় ফিরিল—রাত্রি তখন প্রায় দুইটা। শয্যায় শুইয়া অনেকক্ষণ তাহার নিদ্রা আসিল না, অভিনয়ের দৃশ্যগুলিই তাহার চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রায় ভোরের সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিল—সে এক ঘূর্ণীর ভিতর পড়িয়াছে। ঘূর্ণীর জল অত্যন্ত উত্তপ্ত ও পূতিগন্ধময়। শত চেষ্টাতেও ঘূর্ণীর পাক হইতে সে উঠিতে পারিতেছে না। অরুণ দেখিল—উচ্চ পাড়ের উপর তাহার পিতা দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অরুণ সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু সাহায্য করা দূরে থাকুক পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি আরও হাসিতে লাগিলেন।

সহসা তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, বুক তখনও দুর-দুর করিতেছে। সে চাহিয়া দেখিল—সূর্য্যরশ্মি পূবের জানালা দিয়া শুভ্র শয্যার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

বেলা প্রায় আট নয়টার সময় যতীন পুনরায় হাজির হইল সঙ্গে পলাশপুরের নবীন। যতীন কহিল—আপনাকে আবার বিরক্ত করতে এলুম অরুণবাবু। কি করি বলুন—নবীন আমাকে সুস্থির হতে দিচ্ছে না। যেমন করেই হোক ওর স্ত্রীকে উদ্ধার করতেই হবে।

কাল রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নাই—তাহার উপর দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অরুণের মন তেমন ভাল ছিল না—তাই সে যতীন মুখুজ্যের আগমনে বিশেষ পুলকিত হইল না। বিশেষতঃ নবীনের চেহারা ও ধরণ ধারণ দেখিয়া তাহার মনে ঘৃণার ভাব উদিত হইল। তাহার মনে হইল কাল যাহার অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়া সে একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল—সেই নারী যদি সত্যই ইহার পত্নী হয়—তাহা হইলে বোধ হয় তাহার গৃহত্যাগ করা ভিন্ন আর উপায় ছিল না। ইহার এমন কি শক্তি রহিয়াছে যে মণিমালিনীর ন্যায় গুণশালিনী রমণীকে নিজের গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিবে?

অরুণ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কাল যাকে দেখলে—সে তোমার স্ত্রী?

হাত জোড় করিয়া নবীন কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজের পরিবারকে কে না চিন্‌বে বাবু? ওর সাথে চার পাঁচ বৎসর ঘর করলাম যে!……এই বলিয়া সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার দুঃখের আতিশয্য দেখিয়া অরুণ আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল—কান্নাকাটি করে ফল কি হবে!

চোখ মুছিতে মুছিতে নবীন কহিল—মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে বাবু। ওকে যেমন করে হোক ফিরিয়ে দিন আপনারা।

অরুণ কহিল—যে স্ত্রী ঘর ছেড়ে এসেছে তাকে তুমি আবার ফিরে নেবে?

নবীন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—নেব বৈকি বাবু। আর ইচ্ছে করে তো ও আসেনি—জোর করে এনেছে। এতে আমার পরিবারের দোষ কি?

অরুণ হাসিয়া কহিল—তা বটে!

নবীন পুনরায় কহিল—শুধু ঘরে ফিরিয়েই নিয়ে যাব না। যাতে ঘরে মনের আনন্দে থাকতে পারে তারও ব্যবস্থা করবো। আমার মা বোনের খিটিমিটিতেই এ কাণ্ড হয়েছে—নইলে কেউ ওকে আটকিয়ে রাখতে পারতো না। আগে পরিবার পাই তারপর সকলকে বাড়ী থেকে ঝাঁটা মেরে বিদায় করবো। এ আর কেউ নয়—আমার নাম নবীন কুমোর—যার হাঁড়ি কলসীর সুখ্যাতি দেশে ছড়িয়ে আছে। হুঁ!

অরুণ যতীন মুখুজ্যের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিল, তারপর নবীনকে কহিল—আচ্ছা, এইবার তুমি একটু বাইরে বস, আমরা যুক্তি পরামর্শ ঠিক করি।

নবীন দুইজনের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে বাহির হইয়া গেল।

যতীন কহিল—দেখলেন?

গম্ভীরভাবে অরুণ জবাব দিল—দেখলুম।

—একেবারে পাগল হয়েছে। কাল থিয়েটার থেকে ফেরবার পর ওর ব্যাপার যদি দেখতেন! আমার পা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কি কান্না! সত্যি ওর অবস্থা দেখে চোখের জল রাখা যায় না।

—কিন্তু আমার চোখের জল পড়া দূরে থাক ঐ লোকটিকে দেখে রাগ হচ্ছে।

বিস্মিত হইয়া যতীন কহিল—তা হলে ওর দুঃখ আপনি হৃদয়ঙ্গমই করছেন না না। স্ত্রী কি জিনিষ তা সেই জানে যে তা হারিয়েছে।

সহাস্যে অরুণ কহিল—ও রসে আমি বঞ্চিত, তাই হয়তো ঠিক বুঝতে পারবো না। কিন্তু নবীনের এই আতিশয্যকে ভালবাসা নাম যদি দিতে চান—আমি আপত্তি করবো না। তবে আমি যদি তাতে সায় না দি, তাহলে আমাকে দোষী করবেন না।

যতীন চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিল—তবে কি আপনি বলতে চান স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আগ্রহ না হওয়াটাই ওর উচিত ছিল—

—তাও ঠিক নয়। এমন অবস্থায় ঘরে স্থান না দেওয়ার সংকল্পও যেমন অস্বাভাবিক—ঘরে ফিরিয়ে নেবার ঐকান্তিক ইচ্ছাও তেমনি অস্বাভাবিক।

যতীন বিরক্ত বোধ করিয়া কহিল—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

অরুণ কহিল—আমিও যে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারবো—তা মনে করি না। একটা গল্প বলছি শুনুন। সেবার বাড়ী গিয়ে ভারী ফ্যাসাদে পড়েছিলুম। জানেন বোধ হয়, গ্রামের জমিদারের কাছারীতে অনেকে বিচারের প্রার্থনায় আসে। একটি লোক আমার কাছে আবেদন করে যে তার শাশুড়ী কঠিন অসুখের মিথ্যে সংবাদ দিয়ে তার স্ত্রীকে আনিয়ে এখানে আটকে রেখেছে। তার শাশুড়ীর মতলব ভাল নয়। যুবতী মেয়েকে কাছে রাখবার মধ্যে কুমতলব, তাও সে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করলে। তারপর আমার পা ধরে কি কান্না! সে এই কথাটাই প্রতিপন্ন করতে

চাচ্ছিল যে, সে তার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে। কলকাতা সহরে ঠিকেদার রাঁধুনি বৃত্তি করে তার আয়ও মন্দ হয় না। সেখানে একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে থাক্‌তো। সে এ কথাও জানালো যে তার স্ত্রী তাকে খুবই ভালবাসতো—এখানে শুধু তার শাশুড়ীর প্ররোচনাতেই খারাপ হতে চলেছে। তার কথা সত্যিই আমার হৃদয় স্পর্শ করলো। ভাবলুম—আমারই জমিদারীর মধ্যে এক ব্রাহ্মণ কন্যা এমনিভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, এ আমি হতে দেব না। সেইদিনই তার শাশুড়ীকে কন্যা সহ ডেকে পাঠালুম। আমার আদেশে তারা হাজির হলো। মায়ের বয়স প্রায় চল্লিশ—কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলুম—বয়স্থা বিধবা হলেও তার মেজাজ দিব্যি সৌখিন রয়েছে। পরণে মিহি চুলপেড়ে শাড়ি, হাতে রূপার খাড়ু,—গলায় সোনার হার। মেয়ের সাজে তেমন পারিপাট্য ছিল না—সে দেখতে যেমন কালো, তেমনি কুশ্রী।

আমি ধমক দিয়ে বল্লুম—মেয়েকে ছেড়ে দিচ্ছনা কেন?

বয়স্থা স্ত্রীলোকটি জবাব দিল—ছেড়ে দেব কি মেয়েকে মেরে ফেলতে বাবা।

তার কথার ভঙ্গীতে আমার গা জ্বালা করে উঠলো, কটুকণ্ঠে বল্লুম—নিজের স্বামীর কাছে স্ত্রী থাক্‌বে, তাতে ও-কথা আসে কি করে?

—আমি কিছু বলতে চাইনে বাবা, মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর—। তারপর মেয়ের দিকে ফিরে বল্লে—বল্‌তো মা কিরণ, সব খুলে বল্।......সে একবার অগ্নিদৃষ্টিতে জামাইয়ের দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। মেয়ে যা বল্লে—তা সংক্ষেপে এই—স্বামী কষ্ট দেয়, অত্যন্ত সন্দেহ করে, কারও সাথে কথা বল্‌তে দেয় না, কাজে যাবার সময় ঘরে তালা চাবি বন্ধ করে তাকে ভিতরে রাখে, মারধর করে—এমনি আরও কত কি!

তার স্বামী তখন চীৎকার করে বলে উঠলো—সব মিথ্যে কথা হুজুর, সব ওরা মা শিখিয়েছে!

আমি ধমক দিয়ে বল্লুম—চুপ!

তখন সেই প্রৌঢ়া সাহস পেয়ে বল্লো—কোনও রকমে মেয়েকে এনে ফেলেছি—তাই রক্ষে—নইলে মেয়ে আমার পেতুম না। যে জায়গায় ঘর ভাড়া করে জামাই থাক্‌তো—সে এক গুণ্ডার আড্ডা। শুধু ভগবান রক্ষে করেছেন—নইলে মেয়ের আমার ধর্ম্ম থাক্‌তো না।

জামাই ফস করে বলে উঠলো—এখানে তো ধর্ম্ম আছে খুব। সারাদিন পাড়াপড়সীর্ সাথে গুজুর গাজুর—ও এরই মধ্যে খারাপ হয়ে গেল হুজুর। এখানে থাক্‌লে—।

আমি সেই মেয়েটির দিকে চেয়ে বল্লুম—তুমি যেতে চাও না?

সে কম্পিত স্বরে বল্লো—না।

আমি হুকুমের সুরে বল্লুম—তোমাকে যেতেই হবে, নইলে এ গ্রামের বাস তোমাদের তুলে দেব।

প্রৌঢ়া তখন কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগলো—বাবু, আমার ঐ একমাত্র মেয়ে। ও অসুখী হয়—সে আমি দেখি কি করে! যদি জামাই ভাল ব্যবহার করে নিয়ে যায়—আমার আপত্তি নাই।

আমি তখন বল্লুম—বেশ পনরো দিন সে এখানে থাক্‌বে, তারপর বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেয়েকে পাঠিয়ে দিও।

জামাই বল্লো—ওর বাড়ীতে থাক্‌লে কিছুতে হবে না। আমার পরিবারকে আমার কাছে আসতে দেবে না।

আমি বল্লুম—বেশ, আমি অন্য জায়গায় ব্যবস্থা কর্‌বো।

সেই গ্রামেরই অন্য একটি লোকের বাড়ীতে তারা স্বামী-স্ত্রী পনরো দিন বাস করবে—এই কথা ঠিক করে তাদের বিদায় দিলুম। এ কথাও হলো—সেই পনরো দিন তার শাশুড়ী মেয়ের কাছে যেতে পারবে না। ভাবলুম বুঝিবা ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে গেল সেইখানেই।—কিন্তু পরের

দিন কাঁদতে কাঁদতে জামাই এসে যা ব্যক্ত করলে তার মর্ম্ম এই—তার স্ত্রী রাত্রে তাকে আঁচড়ে কাম্‌ড়ে একেবারে জখম করে দিয়েছে।······তার এই নির্লজ্জ উক্তিতে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। তাকে বল্লুম—এর পরও কি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে চাও?

সে ফিক্ করে একটু হেসে বল্লে—হুজুর ইচ্ছা করলেই আর কোনও ব্যধা থাকবে না।

আমি বলে দিলুম—তোমার স্ত্রী, পারতো নিয়ে যাও—আমি আর ওর মধ্যে নাই।···সে আমার পা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

দিন তিনচার পর বৈকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, এমন সময় গ্রামের মধ্যে একটা গোলমাল শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই দেখলুম—একটি যুবতী স্ত্রীকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় দুইজন পুরুষ হিড়্-হিড় করে টেনে আন্‌ছে, আর সেই স্ত্রীলোকটি চেঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ছে—এমন স্বামীর ঘর সে কখনও করবে না, তাকে বিষ খাইয়ে মেরে আত্মহত্যা করবে, ইত্যাদি। — গ্রামের অনেকগুলি লোক পিছু পিছু হল্লা করতে করতে চলেছে। শুনলুম — সেই ব্রাহ্মণ তার শাশুড়ীর অনুপস্থিতে সুযোগ পেয়ে—গ্রামের কতকগুলি লোকের সাহায্যে স্ত্রীকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

যতীন এতক্ষণ নীরব হইয়া গল্প শুনিতেছিল। এইবার কহিল—চমৎকার! জোর জবরদস্তি না হলে কি এসব ব্যাপার চলে। সেই লোকটিকে সত্যি ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমরা তাকে পেলে আমাদের সমিতির মেম্বর করে নি।

—তা নিন্। কিন্তু এতবড় নির্ল্লর্জ্জ যে মানুষে হতে পারে—এ আমি ধারণায় আনতেও পারতুম না। ওর স্ত্রী যে সত্যই খারাপ হয়ে গিয়েছে

তাতে আর ভুল নাই। ওর মা যে তার মন্ত্রদাতা এও ঠিক। সমস্ত জেনেশুনেও যে স্বামী এমন স্ত্রীকে ঘরে রাখতে চায়—তার একমাত্র কারণ নীচ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা।

—এ আপনার অন্যায় কথা অরুণ বাবু। এও তো হতে পারে যে সে তার স্ত্রীকে পাপ পথ থেকে উদ্ধার করলো।

—হয়তো হতে পারে। কিন্তু এওতো হতে পারে যে স্ত্রীর হাতের দেওয়া বিষে বা ছুরিতে তার প্রাণ পর্য্যন্ত যাবে হয়তো বা গিয়েছেও। আমি এ ব্যাপার বেশ ভেবে দেখেছি। যদি ভালবাসার নাম গন্ধও এর মধ্যে থাকতো—তাহলে অতগুলি লোকের নগ্ন চক্ষুর সম্মুখে অমনি অনাবৃত অবস্থায় নিজের স্ত্রীকে সে বের করতে পারতো না। আর তার বিজয় গর্ব্ব সে এক দেখবার মত বস্তু। আমি একথাও বলছি—ঐ লোকটির যদি পয়সা খরচ করে পণ দিয়ে আবার স্ত্রী কিনবার ক্ষমতা থাকতো তা হলে অনায়াসে এটিকে ত্যাগ করে যেতো, ভালবাসার দোহাই দিতে আসতো না। নবীনের সম্বন্ধে আমার যতটুকু ধারনা তাতে মনে হয় ওর ভালবাসার মধ্যেও ঐ একই অর্থ। বিপথ গামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায় হয় সে অতি সৎ—না হয় পিশাচ। তবে এই সৎ হওয়ার মত শিক্ষা আপনার নবীন কোথায় পেল—তো আমি কিছুতেই ভেবে পাইনে।

যতীন কহিল—না হয় আপনার কথাই মানলুম। কিন্তু যে খারাপ হতে চলেছে—তাকে সৎপথে ফেরাবার কি সমাজের দায়িত্ব নাই?

অরুণ হাসিয়া কহিল - সমাজের সে দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিনে।

—তা হলে এ ভার আপনারই উপর দিলুম। মনিমালিনী যাতে ওপথ থেকে ফিরে আসে এচেষ্টা আপনারই করতে হবে।

বিস্মিত হইয়া অরুণ কহিল - বলেন কি! আমি?

—যুবক সমিতির সভ্য হয়ে অবধি আপনি এপর্য্যন্ত কোন কাজই

করেন নি। এইবার আপনার পরীক্ষা অরুণবাবু। তারপর পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া অরুণের হাতে দিয়া কহিল এতে ঠিকানা লেখা আছে। আজ তাহলে চল্লুম, কাল বিকেল নাগাদ যেন খবর পাই। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

অরুন সেইখানেই স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

— ৯ —

সেদিন রবিবার। কলেজে যাইবার হাঙ্গামা না থাকায় অরুণ স্নানাহার শেষ করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই তাই সে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল তখন বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। অনিদ্রার ক্লান্তি দূর হইয়া দেহ মন সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

সে চোখ মুছিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। এইবার থিয়েটার দেখার কথা তাহার মনে হইল এবং নবীনের স্ত্রীর উদ্ধারের ভার তাহারই উপর অর্পিত হইয়াছে সে কথাও তাহার স্মরণ হইল। সে আর একবার সমস্ত ব্যাপারটি ভাবিয়া দেখিতে লাগিল। সকাল বেলা নবীনকে দেখিয়া কেন যে সে অত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে তখন মনের উত্তেজনায় যে ধারাণা করিয়াছে—তাহা হয়তো প্রকৃত নয়। হয়তো নবীন সত্যই তাহার স্ত্রীকে ভালবাসে এবং ইহার মধ্যে অস্বাভাবিকতাও কিছুই নাই। অশিক্ষিত নবীন যে ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে—শিক্ষিত কোনও ব্যক্তি এইরূপ ব্যবহার করিত না ইহা হয়তো ঠিক। কিন্তু অশিক্ষিত হইলেই যে তাহার ভালবাসার কোনও দাবী থাকিবে না—এ ধারণা তাহার জন্মিল কিসে?

সে কতক্ষণ এইকথাগুলিই ভাবিয়া দেখিতেছিল তাহার ঠিক নাই--- সহসা সমীর আসিয়া বলিয়া উঠিল—কেমন থিয়েটার দেখা হলো অরুণ?

অরুণ হাসিতে হাসিতে কহিল—সে খবর তোমার কানে গেছে দেখছি। কিন্তু ঠিক থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম বল্লে ভুল হয়।

সমীর সহাস্যে কহিল—তাও জানি। পতিতার উদ্ধার-টুদ্ধার এমনি একটা বড় ব্যাপার নিশ্চয়ই রয়েছে। নইলে যতীন মুখুজ্যে সঙ্গী হবে কেন?

সমীরের কথার মধ্যে খোঁচা রহিয়াছে মনে করিয়া অরুণ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল—যতীন বাবুর সম্বন্ধে তোমার কেন এমন বিকৃত ধারণা আমি তো বুঝতে পারিনে সমীর?

সমীর মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিল—কিন্তু আমি তো প্রশংসাই করছি। সে কোনও কাজই বৃথা করে না। যখন কাল তোমাকে নিয়ে থিয়েটারে গিয়েছিল তখন নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে। জীবন তার উদ্দেশ্যহীন নয় একথা বল্লে প্রশংসাই করা হয়—এই তো আমার বিশ্বাস। যাহোক, থিয়েটার কেমন দেখলে?

—সুন্দর। কিন্তু তার চেয়ে আরও সুন্দর জিনিষ দেখা গেছে।

—সে কি?

অরুণ সহস্যে বলিল—পত্নী প্রেম।

সমীর জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার দিকে চাহিল। অরুণ একে একে রাত্রের ও অদ্যকার প্রাতের সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। সমীর সমস্ত শুনিয়া একটু-খানি ভাবিয়া কহিল—তাহলে মণিমালিনীর বাড়ী যাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছ?

অরুণ হাসিতে হাসিতে জবাব দিল—তোমার ভয় নাই আমি যাব না।

—কিন্তু যতীন মুখুজ্যে যখন কৈফিয়ৎ তলপ করবে তখন? যুবক-সমিতির সভ্যের পক্ষে তার হুকুম অমান্য করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

অরুণ কহিল—তাও জানি। তিনি হুকুমের ভঙ্গিতে কাজের ভার দিয়ে তখনই চলে গেলেন—আমাকে কিছু বল্‌বার সুযোগ দেন্‌নি। কিন্তু তাঁর হুকুম পালন করবার লোক অনেক আছে সমীর।

সমীর প্রীত হইয়া কহিল—কিন্তু নবীন বেচারীর উপায় কি হবে ?

—সে ব্যবস্থা যতীন বাবুই করে দেবে। আমার তো ভরসা হয় না মণিমালিনী আবার স্বামীর ঘরে ফিরে যাবে। যে এই মহানগরীর বিলাস-স্রোতে ভেসে যাচ্ছে—সে যে আবার অখ্যাত অজ্ঞাত কোন পলাশপুরের নবীনের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে তার গৃহ উজ্জ্বল করবে—এ তো ধারণায় আসে না।

সমীর কোন কথা কহিল না, অরুণ একটু পরে কহিল—আচ্ছা সমীর তোমার কি মনে হয় মণিমালিনীর ঘরে ফিরে যাওয়াই উচিৎ।

সমীর কহিল---আমিও তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলুম। তোমার প্রশ্নের ভঙ্গিতে মনে হয়—তুমি তার ঘরে ফিরে যাওয়া মনে মনে সমর্থন করতে পারছো না।

অরুণ একটুখানি ভাবিয়া লইয়া বলিল— হয়তো বা তাই হবে। কিন্তু নবীনের দুঃখের চিত্রও যে মনে না উঠছে তা নয়। একদিকে পত্নীর অভাবে স্বামীর মনকষ্ট—অন্যদিকে অভিনেত্রীর অভিনয় কুশলতায় অজস্র আনন্দ সৃষ্টি এর মধ্যে কোনটি যে বেশী গুরুতর ঠিক করা দুস্কর। আজ যদি মণিমালিনী গৃহে ফিরে যায় তাহলে বাংলার অভিনয় ক্ষেত্র থেকে একটি উজ্জ্বল তারকা খসে যাবে—যে অগনিত দর্শক তার অভিনয় দেখে প্রীত পুলকিত হয়, তা থেকে তারা বঞ্চিত হবে। একদিকে একজনের দুঃখ—অন্য দিকে অসংখ্য লোকের আনন্দ—এর কোনটা বেশী প্রয়োজনীয় আমি তা বুঝতে পারছি নে।

সমীর কহিল---এই একজনের দুঃখ যদি প্রকৃত হয় তাহলে এর কাছে পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ তুচ্ছ হয়ে যাবে। মনিমালিনী যে আনন্দ বিতরণ করছে—তার স্বামীর প্রকৃত ভালবাসার দুঃখের কাছে এ নিতান্ত হেয় —এইতো আমার বিশ্বাস। মণিমালিনী যত বড়ই গুনী হোক—বাংলা-দেশে সেই যে একেবারে একমেবাদ্বিতীয়ম্ একথা আমি বিশ্বাস করিনে।

হয়তো এখন যারা গৃহলক্ষ্মী হয়ে একমাত্র স্বামীর মনোরঞ্জন করে জীবনকে ধন্য বলে মনে করছে—তাদের মধ্যেও মণিমালিনীর তুল্য অথবা তার চেয়ে বেশী গুণশালিনী রমণী আছে। কিন্তু সবাই যদি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অগনিত লোককে আনন্দ দান করতে গৃহ ত্যাগ করে তাহলে সমাজের অবস্থা কি দাঁড়ায়?

—এ তোমার অন্যায় কথা সমীর। সবাই যে মণিমালিনীর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করবে---একি কখনও হতে পারে? কিন্তু এর মীমাংসার যখন উপায় নাই—তখন আমাদের তর্ক থাক। যতীন বাবু নবীনের ভাবনা ভাবুন—আমার ওতে আবশ্যক নাই।

সমীর কহিল—সেই ভাল। কিন্তু যতীন বাবু তোমাকে একটা অপদার্থ বলে মনে করবে।

—তা তিনি করুন। কিন্তু আবার নবীনকে নিয়ে হাজির না হলেই আমি রক্ষে পাই।

কথা বলিতে বলিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল—চাকর ঘরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। সমীর জিজ্ঞাসা করিল—মার চিঠি এর মধ্যে পেয়েছ?

অরুণ স্মিত হাস্যে কহিল—পেয়েছি। তিনি লিখেছেন—এবার গরমের ছুটিতে তোমার যাওয়াই চাই।

সমীর কহিল বোধ হয় এবার যেতে পারব না ভাই। আমাদের গ্রাম থেকে ডাক পড়েছে। সেখানে একটা ছেলেদের নুতন ধরনের স্কুলের আয়োজন কিছুদিন থেকেই চলছিল—সেই সম্ভাবনা সত্য হবার পথে এসেছে। তাই আমার গ্রামে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

অরুণ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল—তোমাকে কাজ ফেলে যেতে বলতে পারিনে সমীর—কিন্তু মা ভারী দুঃখিত হবেন।

সমীর কহিল---আমিও যে হব না—তা নয়। তবে পূজোর মধ্যে নিশ্চয় যাব কথা দিচ্ছি।

অরুণ কিছুক্ষণ কোনও কথা কহিল না, তার পর মৌন ভঙ্গ করিয়া কহিল—সমীর, আমি বোধ হয় তোমাকে ঠিক চিনতে পারিনি।

উজ্জ্বল দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া সমীর কহিল—ওকথা কেন ভাই?

অরুণ বলিতে লাগিল—তুমি সেদিন যুবক সমিতির সভ্য হতে চাওনি—সেদিন ভেবেছিলাম দেশের কাজে বুঝি তোমার রুচি নাই। কিন্তু তোমার দেশের স্কুলের জন্য যখন তোমাকে একান্ত আবশ্যক তখন তুমিই যে তার প্রধান উদ্যোগী—একথা স্বীকার করতেই হবে। অথচ যতীন মুখুজ্যেকে বিদ্রূপ করতেও তুমি পশ্চাৎপদ নও।

মৃদু হাসিয়া সমীর কহিল— যতীনবাবু কয়টি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সে তো আমার জানা নাই?

অরুণ সহাস্যে কহিল—আবার বিদ্রূপ? কিন্তু সবাই কি ঐ একই কাজে লাগবে? কেন যুবক সমিতির প্রতিষ্ঠা এওকি একটা কাজের মত কজ নয়?

—কাজ? তা হবে। কিন্তু রাত্রি ক্রমশঃ বেশী হয়ে আসছে—আমার খাওয়া এখানেই হবে, ঠাকুরকে বলে দাও। হ্যাঁ যে কথা হচ্ছিল। তোমাকে আজ স্পষ্টই বলছি যতীন বাবুর যুবক সমিতির উপর আমার একেবারে আস্থা নাই। দেশের লোক যুবকদের দিকে চেয়ে আছে সত্যি কিন্তু এই বাংলাদেশে যুবকতো আমি দেখতে পাইনে। এরা হয় শিশু না হয় বৃদ্ধ। এদের উপর নির্ভর করা একটা মিথ্যা প্রবঞ্চনা বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু চিরকাল কিছু এমনি থাকবে না—এমন দিন আসবে যখন প্রত্যেক শিশু কালক্রমে যৌবনের দীপ্ত টীকা ধারণ করে তাদের কর্ম্মের শক্তিতে, জ্ঞানের গভীরতায় দেশকে ধন্য করবে।

অরুণ কহিল—নিজের পক্ষেও তোমার এই উক্তি বড় সার্টিফিকেট হলো না।

সমীর কহিল—সে সত্যি। আচ্ছা তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি—কয়জন বলিষ্ঠ, চরিত্রবান যুবাপুরুষ তোমার চোখে পড়েছে। এই অগনিত লোকের মধ্যে দুচারটি সে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। যখন আমাদের মত পরাধীন দেশে প্রত্যেক যুবক বলিষ্ট, চরিত্রবান, কর্ম্মী হয়ে গড়ে উঠবে তখনই দেশের দুঃখদৈন্য ঘুচবে। এ জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। যে শিক্ষার চাপে শৈশবকাল পার হতে না হতেই কুব্জদেহ জীর্ণ-শীর্ণ, নৈতিকচরিত্র হীন করে ফেলে সে শিক্ষার দরকার নাই। প্রকৃত মানুষ করে তোলবার জন্য আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। এখানে শুধু বইয়ের চাপে পিষে ফেলে মিথ্যা আড়ম্বর শিক্ষা দেওয়া হবে না এখানে দেওয়া হবে সেই শিক্ষা যাতে দেশাত্মবোধ, ধর্ম্মজ্ঞান, আত্মনির্ভরতা প্রথম থেকেই শিশুহৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।

—সমীর।

—কি ভাই!

—আমি তোমাকে চিন্‌তে পারিনি। দেশের ভাবনা যে তুমি এত ভাব আমি জানতুম না।

সমীর হাসিয়া কহিল—ছাই ভাবি ওসব কিছু না কেবল মুখেন মারিতং জগত। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। যাক্, অনেক বক্তৃতা দেওয়া গেছে—আজ এইপর্য্যন্ত। ক্ষিধেও বড্ড পেয়েছে। লাভের মধ্যে কিছু বেশী খাওয়া যাবে।

১০

বেলা অপরাহ্ন। হরলাল চক্রবর্ত্তী ভাগবত পাঠ বন্ধ করিয়া উঠিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন — এমন সময় সুলোচনা দেবী নিকটে আসিয়া বসিলেন। হরলাল বুঝিলেন স্ত্রীর কিছু বলিবার আছে। তিনি সহাস্যে বলিলেন—কিছু বলবে কি আমাকে ?

সুলোচনা দেবী মৃদু হাসিয়া কহিলেন—বলবার অনেক কথাই আছে কিন্তু তোমার ফুরসুৎ নাই যে! এখনই কি বেরবে ?

—সেইরকম তো মনে করছি। কেনারামের ছেলেটার অসুখ একবার দেখতে যেতে হবে।

—তারপর ?

—অভয়ের মার কাল থেকে আহার ব[illegible], কিছু সাহায্য না করলে সে বাঁচবেনা। মনে করছি—তার ওখানে [illegible]কবার যাব।

সুলোচনা দেবী হাসিতে হাসিতে কহিলেন—[illegible]ল কথা। কিন্তু তার পর ?

—মনি মিত্তিরের মেয়েকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে—সেখানেও আমার আহ্বান আছে।

—যাক্, আর তোমাকে জিজ্ঞেস করবো না, কাজের ফর্দ্দ ক্রমশই বেড়ে যাবে। ঘরে থাক গীতা-ভাগবত নিয়ে তারপর বাহিরে গেলে তো কথাই নাই। কিন্তু আমার কথা শোনবার তোমার ফুরসুৎ হবে কবে বলতে

স্মিত হাস্যে হরলাল কহিলেন—এত লোকের কথা শুনে বেড়াচ্ছি আর তোমার কথা শোনবার অবসর নাই—এমন অপবাদ তুমি আমায় দিও না গিন্নী। আচ্ছা বল দেখি তোমার কি কথা।

গম্ভীর হইয়া সুলোচনা দেবী কহিলেন — গৌরীর কথাই তোমাকে বলতে এসেছি।

বিস্মিত হইয়া হরলাল কহিলেন—গৌরীর কি কথা বল্‌বে?

—বয়স তার চৌদ্দ পেরিয়েছে। এই কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এত লোকের ছেলে মেয়ে বিয়ে দিয়ে বেড়াও কিন্তু নিজের মেয়ের সম্বন্ধে তুমি কেন এত উদাসীন বলতে পার? অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিতে তোমার আপত্তি ছিল তাই এতদিন কিছু বলিনি। হিঁদুর ঘরের মেয়ে আর তো বেশীদিন রাখা যায় না।

হরলাল কি যেন ভাবিলেন, তারপর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—না, আর রাখা যায় না। কিন্তু কি জান গিন্নী, ঐ একটি মাত্র মেয়ে ও পরের বাড়ী গেলে আমরা থাকি কি করে?

স্বামীর মনোবেদনা কল্পনা করিয়া সুলোচনা দেবী অনুভব করিলেন—ম্লান হাসিয়া কহিলেন — মেয়ে সন্তান যে। যতই কষ্ট হোক দাবী ছাড়তেই হবে। গ্রামের মধ্যে কিংবা কাছাকাছি কোন ভাল ছেলে পাওয়া যায় না? দূরে বিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে করে না।

—চেষ্টা দেখ্‌বো। তুমি না হয় একবার জমিদার গিন্নীকে জিজ্ঞাসা ক'রো।

সুলোচনা দেবী ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিলেন। গৌরীকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন, কিন্তু ইহার হেতু তিনি বুঝিতে পারেন না। মাঝে মাঝে এমনও আশা হয় বুঝি গৌরীকে তিনি পুত্রবধূ করিয়া লইবেন। রূপে গুণে তার মত মেয়ে কয়টি পাওয়া যাইবে? কিন্তু তবু এত বড় আশা

হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিতেন না। এখন স্বামীর কথার ইঙ্গিতে তাঁহার মনে হইল— তবে কি তিনিও ঐ কথাই ভাবিয়াছেন।

পরদিন সুলোচনা জমিদার গিন্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। একথা সে কথার পর কহিলেন—গৌরীর বয়স অনেক হয়ে গেল দিদি।

—তা হলো বৈকি। এই বোশেখে চৌদ্দ পেরোবে, না? ওর আবার বয়স আন্দাজে বাড় একটু বেশী দেখতে পাই।

—সেইতো ভাবনার কথা দিদি। এখনতো আর বিয়ে না দিয়ে থাকা যায় না। কিন্তু জানইতো কেমন আলাভোলা মানুষ, ওঁর এদিকে একেবারে দৃষ্টি নাই।

মনমোহিনী হাসিয়া কহিলেন—তার সময় কখন ভাই। বাইরে অনেক লোক তাঁর মুখ চেয়ে থাকে, ভিতরে এলেই পুঁথি হাতে। আজকাল বুঝি তোমার মুখের দিকেও ফিরে দেখেন না।

সুলোচনা হাসিতে হাসিতে জবাব দিলেন—যখন চেয়ে থাকবার মত বয়স ছিল তখনই বড় দেখেছেন। এখনতো দূরের কথা। কি ভাগ্য করেই এসেছিলাম দিদি!

আহা এমনি ভাগ্য করিয়াই যদি সকলে আসিতে পারিত! প্রকাশ্যে কহিলেন—দুঃখু হয় বুঝি?

—বড্ড। কিন্তু ঠাট্টা তামাসা থাক দিদি, এখন গৌরীর বিয়ের কি ব্যবস্থা করি বল দেখি? আমার ঐ একমাত্র মেয়ে ওকে বেশী দূরে পাঠিয়েও থাকতে পারবো না। আর গাঁয়ের মধ্যেও তেমন ভাল ছেলে কই দেখতে পাইনে।

—আচ্ছা, আমি চেষ্টা দেখবো। কিন্তু গৌরীকে সঙ্গে আননি কেন? তাকে যে কদ্দিন দেখিনি।

—বড় হয়েছে, তাই বাড়ী থেকে বেরতে নিষেধ করেছি। তুমি বলতো তোমার এখানে কাল পাঠিয়ে দি।

মনমোহিণী একটু অন্য মনস্ক হইয়া কহিলেন—দিও। না থাক, কাল আমিই তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। সে আমার সঙ্গেই আসবে এখন।

মনমোহিনী নিজে তাঁহাদের বাড়ী যাইবেন শুনিয়া সুলোচনা দেবী বিস্মিত হইলেন—কারণ তিনি কখনও কাহারও বাড়ী যাইতেন না। নিশ্চয় ইহার ভিতর কিছু রহস্য আছে, অথচ সে কথা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেও পারিলেন না, কহিলেন—কষ্ট করে আর তুমি কেন যাবে দিদি, আমিই না হয় গৌরীকে নিয়ে কাল আসবো।

মনমোহিণী হাসিয়া কহিলেন—তোমার কোন ভয় নাই ভাই, চক্কোত্তি মশায়কে আমি গিলে খাব না।

সুলোচনা গৃহে আসিয়া স্বামীকে সমস্ত কথা জানাইলেন। তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন—কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে তো!

পরদিন বৈকালে মনমোহিণী সত্যই হরলাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ী আসিলেন। গৌরী তাহাকে প্রণাম করিল। মনমোহিণী সস্নেহে তাহাকে কোলের উপর বসাইয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একজোড়া কারুকার্য্য খচিত স্বর্ণ বলয় বাহির করিয়া তাহার দুই হাতে পরাইয়া দিলেন। সুলোচনা দেবী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

মনমোহিণী কহিলেন—কাল তুমি মেয়ের বিয়ের কথা আমায় বলছিলে কিন্তু তোমার তো বোঝা উচিত ছিল—এ রত্নটিকে আমি হাতছাড়া হতে দেব না। কত দীর্ঘ দিন থেকে আমি কামনা করে এসেছি গৌরীকে আমার ছেলের জন্য তোমাদের কাছ থেকে চেয়ে নেব। আজ তাই তোমাদের বাড়ী এসে ভিক্ষে চাইছি।

কৃতজ্ঞতায় সুলোচনার চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিলেন—অমন করে বল্লে যে লজ্জা পাই দিদি। গৌরীকে তুমি আমার অধিক স্নেহ কর সে দেখেই আসছি। কিন্তু এত বড় দুরাকাঙ্ক্ষা আমি মনে স্থান দিই কি করে?

মনমোহিনী উজ্জ্বলদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিতেই গৌরী মুখ নত করিল। মনমোহিনী কহিলেন—অমন লজ্জা করলে তো চলবে না গৌরী—তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক্‌বে। হ্যাঁ কি বলছিলে ভাই দুরাকাঙ্খা? দুরাকাঙ্খা আমারও কম নয়। গৌরীর মত মেয়েকে পুত্রবধূ করা—যে অনেক ভাগ্যের কথা। কিন্তু সবইত বুঝতে পেরেছ—এইবার চক্কোত্তি মশায়কে ডেকে পাঠাও, তাঁর মতটাই যে প্রথমে দরকার।

হরলাল চক্রবর্ত্তী নিকটেই কোথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। অগ্রসর হইয়া কহিলেন — আমার মত অনেকক্ষণ দিয়েছি। সে জন্য আপনি চিন্তা করবেন না।

মনমোহিনী মৃদুস্বরে কহিলেন—তাহলেই হলো। আমার আর একটা কথা আছে। অরুণ এম, এ, পাশ করবার পর তখন বিয়ের দিন ঠিক হবে। এতে আপনাদের কোন অমত নাই তো?

হরলাল কহিলেন—গৌরী এখন আমাদের নয়—আপনার। যেদিন ইচ্ছে বিয়ে দেবেন—আমাদের আর কিছু বলবার নাই।

—তবে সেই কথাই রইলো। তারপর গৌরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তুমি কিন্তু মা কোনও লজ্জা করোনা। যেমন আব্দার বায়না আমার সাথে করতে তেমনি কিন্তু করতে হবে।

গৌরী মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। মনমোহিনী সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

সে দিন কলেজের ছাত্রদের একটি সভা ছিল। পাশ্চাত্য দেশের কোন এক লেখিকা ভারতবর্ষের পুরুষ ও নারীচরিত্র সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছে – লেখিকার দুষ্ট মন্তব্যের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত এই সভা আহুত হইয়াছিল। অরুণ এই সভার সভাপতি হইয়াছিল। সে যখন তাহার বক্তৃতায় ভারতীয় নারীর সতিত্ব, স্নেহ করুণা, ধর্ম্মপ্রবণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের কথা দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যক্ত করিতেছিল—তখন মানসপটে তাহার মহিমময়ী জননীর মুখখানাই ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিয়াছিল—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি পৌরানিক কালের হিন্দুনারীর চরিত্র যে কাল্পনিক নয় তার প্রমাণ এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে পাওয়া যাইবে। তাহা-দের জননী ভগিনীগণ কেহই আদর্শে সীতা সাবিত্রীর চেয়ে ন্যূন নহেন।

অরুণ আজ সত্যই প্রাণ ঢালিয়া দিয়া বক্তৃতা করিয়াছিল। সকলেই তাহার বক্তৃতার প্রশংসা করিতে লাগিল। সে পুলকিতচিত্তে বাসায় ফিরিল এবং বারংবার যুক্ত হস্ত কপালে স্পর্শ করিয়া বলিতেছিল—মা, তোমার করুণা-মাখা মুখ আমার মনের উপর সব সময় জেগেছিল বলেই আজ আমি সফলকাম হতে পেরেছি। তোমার মত জননীর যে দেশে অভাব নাই, সে দেশের কুৎসা যারা করে তারা যে প্রকৃতিস্থ একথা বিশ্বাস করিবে কে?

—হ্যালো অরুণবাবু চোখ বুঁজে কি ভাবছেন। এখনও কি বক্তৃতার ঘোর কাটাতে পারেন নি? —মায়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে অরুণের

চোখ দুটি আবেশে মুদিত হইয়া আসি...ছিল, এমন সময় কখন যে যতী... কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, সে জানিতেও পা... নাই। —সে চোখ খুলিয়া সহাস্যে কহিল, আসুন। কিন্তু আপনি বক্তৃতার খবর পেলেন কোথা থেকে?

যতীন কহিল—সভায় আমিও ছিলুম যে। বাস্তবিক আজ আপনার বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

অরুণ আন্তরিক খুসী হইয়া কহিল—তেমন আর কি বলতে পারলুম আরও অনেক কথা বলা যেত। আমার ইচ্ছা হয় হিন্দুনারীর রহস্যময় চরিত্র একটু একটু বিশ্লেষণ করে ওদের দেখিয়ে দি। কিন্তু যেরূপ স্থূলদৃষ্টি ওদের দেখিয়ে দিলেও যে দেখবে তাতো মনে হয় না।

যতীন কহিল—সে কথা ঠিক। কিন্তু আপনার বক্তৃতায় একটা জিনিষ লক্ষ্য করে ছিলুম। অনেকে পাশ্চাত্য দেশের রমণীদের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে বক্তৃতা দিয়েছে—কিন্তু আপনি সেদিক দিয়ে যাননি ওদের যদি একটু 'এ্যাটাক্' করে বলতেন তাহলে খুব উদ্দীপনাময় হতো।

—আমি ইচ্ছে করেই তা করিনি। ওদের সমাজের মেয়েদের সঙ্গে আমি মিশিনি। যাদের কথা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি না, শুধু বইপড়া বিদ্যা নিয়ে অথবা পরের মুখে ঝাল খেয়ে তাদের চরিত্রের সমালোচনা করতে যাব এমন বেয়াদপি যেন আমার কোনদিন না হয়। আমাদের দেশের মেয়েদের রীতি-নীতি, চরিত্রের আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সেটুকু যদি পেরে থাকি, তাহলেই যথেষ্ট মনে করবো।

যতীন কহিল—কিন্তু আপনার এই মত যদি পাশ্চাত্য জগৎ মেনে চলতো তাহলে এ সব বাদ প্রতিবাদের কোনই প্রয়োজন ছিল না।

অরুণ সহাস্যে কহিল—পাশ্চাত্য জগৎ বল্লেও ভুল বলা হয়, কারণ ওদের সবাই একই দলের নয়। এমনও অনেকে আছেন যাঁরা এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্ত অনুকূল মত পোষণ করেন।

যতীন কি যেন একটু ভাবিয়া লইয়া কহিল—আচ্ছা, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি হিন্দু নারীর প্রতি এই যে কুৎসা এর মধ্যে কি এতটুকু সত্য নাই? আমাদের দেশের সব মেয়েই কি সতী, সকলেই কি আদর্শচরিত্রা?

—কোটি কোটি লোকের মধ্যে যৎসামান্য যদি খারাপই থাকে তাতে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয় না।

উত্তেজিত স্বরে যতীন কহিল—এইখানেই আমার মতভেদ আছে, আমি বলি ক্ষতি হয়। আমাদের উচিত সেই অল্পসংখ্যক বিপথগামী লোককে সৎপথে আনবার চেষ্টা করা। আমার বিশ্বাস যে সব বিদেশী লেখক অযথা কুৎসা রটাচ্ছে, তাদেরও একটা ভিত্তি রয়েছে তারা এই অল্প সংখ্যক মুষ্টিমেয় লোকের চরিত্র দেখেই এতটা লিখতে সাহস করে। আচ্ছা বলুন তো, এদের মুক্তির চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য কিনা?

উত্তেজনার মোহে অরুণ ভুলিয়া গিয়াছিল যে যতীনবাবুর অর্পিত কাজের ভার সে সম্পাদন করে নাই। কিন্তু এখন তাহার কথার ভঙ্গী দেখিয়া সেই কথাটাই তার মনে পড়িল এবং কি বলিয়া কৈফিয়ৎ দিবে ভাবিতে লাগিল। যতীন বোধ করি তাহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া কহিল—মণিমালিনীর কথাই ধরুন। সেও হিন্দু ঘরের কুললক্ষ্মী, কিন্তু এখন কোথায় তার হিন্দু রমণীর আদর্শ? সেদিন তার স্বামীকে অপমান করে রাস্তা থেকেই বিদায় করলো—সেই চিত্র দেখে যদি কেউ আঁকে তাহলে তার দোষ দিই কি করে?

—কিন্তু সে চিত্র গোটা হিন্দু সমাজের চিত্র নয় তাও তো বুঝতে হবে। কিন্তু এ কথা থাক—নবীন কি সেখানে গিয়েছিল?

যতীন কহিল—আমিই তাকে নিয়ে গিয়েছিলুম। যদিও সেদিন আপনার উপরই কাজের ভার দিয়ে যাই, তবু আমি জানতুম আপনি যাবেন না।

কারণ, এ সব বিষয়ে সঙ্কোচ শীগগির কাটিয়ে ওঠা কঠিন। হয়ত একদিন আপনি এ সব কাজে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ হবেন, কিন্তু প্রথম প্রথম একটু বাধো বাধো বোধ হবে। না, না,—আপনি কিছুমাত্র লজ্জিত হবেন না, আমি সবই বুঝতে পারি। মনে করেছিলুম—আর কাউকে মণিমালিনীর মন পরীক্ষা করতে পাঠাব। কিন্তু আপনার বাড়ী থেকে যাবার পর নবীন আবার পা-ধরে কান্না সুরু করে দিল, এমন কি আহার পর্য্যন্ত করল না। আমি আর থাকতে পারলুম না তাকে সঙ্গে নিয়েই গেলুম। ব্যবস্থা সেখানে সবই ঠিক ছিল। মণিমালিনী দরওয়ান দিয়ে শুধু আমাকেই অপমান করেনি, হিন্দু রমণীর আদর্শ ভুলে গিয়ে সে নিজের স্বামীকে দস্তুরমত প্রহার খাইয়েছে। কিন্তু প্রহার খেয়েও কি সে ফিরতে চায়! অনেক কষ্টে তাকে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়ে আনি। আমি ভরসা করেছিলুম আপনার মত বুদ্ধিমান লোক যদি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নরম করতে পারত তাহলে হয়ত তার মতি গতি ফিরতো। যাক যা হয়ে গেছে, তার আর কোনও উপায় নাই।

নবীনের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া অরুণ সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হইল, কহিল—নবীন কি দেশে ফিরে গেছে?

—এক রকম জোর করেই পাঠান হয়েছে। যেমন মনের অবস্থা তার এখন নিরাপদে দেশে পৌছুলে হয়।

অরুণ কি যেন একটু ভাবিয়া কহিল—আপনার কি সত্যি মনে হয়, আমি মণিমালিনীকে বোঝাতে পারতুম?

—আমার তো সেই রকমই আশা ছিল।

—তা হ'লে আমি একবার চেষ্টা করেই দেখি।

যতীন উৎসাহিত হইয়া কহিল—আপনার কথা শুনে ভারী খুসী হলুম

[illegible]। যেমন করেই হোক, সমাজের অন্ধকার অংশটা মুছে ফেলাতেই

হবে। মিথ্যা নীতি বোধের চাপে যেন আমাদের মনুষ্যত্ব না হারিয়ে ফেলি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই তো নিয়ত করে থাকি আমি! তাহলে আজ চল্লুম। আপনি কতদূর কি করতে পারলেন, কাল পরশু খবর নেব। আচ্ছা, নমস্কার।

সেদিন শুক্রবার। লিলি থিয়েটারের ছুটির দিন। তাই মণিমালিনীঃ দিবাশয্যা ছাড়িয়া আর উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। কিন্তু বেল একেবারে গড়াইয়া যাইতেছে দেখিয়া সে অগত্যা উঠিল এবং মুখ ধুইয়া, মাথার চুল একটুখানি ঠিক করিয়া সে দোতলার বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে টবের ফুলগাছগুলির ফুল পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর দরওয়ান আসিয়া খবর দিল একজন বাবু তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। মণিমালিনী একটুখানি মুচকি হাসিল - কেননা কিছুদিন হইতে অনেক রকমের বাবু তাহার সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেছে। মণিমালিনী বাবুটিকে উপরে আনিবার জন্য তাহাকে আদেশ দিল এবং নিজে ঘরের ভিতর আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার কেশ বেশ আর একবার দেখিয়া লইয়া বারান্দার চেয়ারে উপবেশন করিল।

অনতিবিলম্বে অরুণ মণিমালিনীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে চাহিয়া দেখিল যুবকটি তাহার পরিচিত নয়, এ গৃহে তাহার প্রথম পদার্পণ। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিপাতেই অন্যের সহিত ইহার পার্থক্য অনুভব করিল। অরুণের গায়ে মোটা খদ্দরের জামা ও চাদর, পরিধানে খদ্দরের কাপড়, পায়ে স্লিপার, তাহার বক্ষ প্রশস্ত, রং শ্যামোজ্জ্বল, উন্নত নাসিকা, চক্ষু তারকা দুটি বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল, দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ চুলগুলি সমানভাবে কাটা অথচ পরিচ্ছন্ন

ভাবে আঁচড়ানো। মণিমালিনী কিছুক্ষণ অবাক হইয়া এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব যুবকের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপরে আত্মস্থ হইয়া কহিল—বসুন।

নিকটেই একখানা চেয়ার ছিল সেখানি একটু দূরে সরাইয়া অরুণ উপবেশন করিল। বুদ্ধিমতী মণিমালিনী অরুণের মনের ভাব বুঝিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল—আপনার কি কিছু দরকার আছে?

শান্ত স্বরে অরুণ কহিল—হ্যাঁ। আমি যুবক সমিতির একজন সভ্য। সমিতির একটা কাজের ভার নিয়ে আমি এসেছি।

মণিমালিনী বোধহয় ব্যাপার কতকটা অনুমান করিয়াছিল, কিন্তু সে পরিহাসের সুরে কহিল—সমিতির জন্য কোনও বেনিফিট নাইট টাইট চাই বুঝি? কিন্তু সে তো আমাকে দিয়ে কিছু হবে না। প্রতুলবাবুকে ধরুন, আমি বরং আপনাদের হয়ে সুপারিশ করব।

অরুণ কহিল—সে সব আমাদের দরকার নাই। আপনার কাছেই আমাদের প্রয়োজন।

মণিমালিনী মৃদু হাসিয়া কহিল—আমার কাছে? বেশ বলুন, কি প্রয়োজন।

অরুণ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল, সে বুঝিতে পারিল না কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিলে সুবিধা হইবে। মণিমালিনী তাহার এই ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে কহিল—বলুন, আপনার কোনও লজ্জা নাই।

অরুণ একটুখানি কাসিয়া বলিতে লাগিল—আমাদের একটা উদ্দেশ্য পতিতার উদ্ধার, তাদের সমাজে স্থান দেওয়া, গৃহে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করা।

অরুণের কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া মণিমালিনীর হাসি পাইতেছিল, কোনও রকমে নিজেকে দমন করিয়া কহিল—আপনি যেই হোন, আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে পারব না। আমারই কাছে বসে 'পতিতার' উল্লেখ!

শাস্ত্রবাক্য জানেন তো? সত্যম্ ব্রুয়াৎ প্রিয়ম্ ব্রুয়াৎ মা ব্রুয়াৎ সত্যম-প্রিয়ম।······এই বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অরুণ মণিমালিনীর কথায় সত্যই লজ্জিত হইল এবং এই রমণীর বাক-পটুতায় বিস্মিতও অল্প হইল না। কিন্তু তবু সে দৃঢ়স্বরে বলিল—কিন্তু আমাদের অপ্রিয় সত্য বলা ছাড়া উপায় নাই। আপনারা যা তা মুখে ফুটে বলতেও হয় কিন্তু আপনাদের যে চিরকাল তাই থাকতে হবে একথা আমরা মনে করি না। যাক্, আমি শুধু জানতে চাই—আপনার গৃহে ফিরে যেতে চান কিনা?

—আমার গৃহ আপনি কোনটাকে বলছেন?

গম্ভীর হইয়া অরুণ কহিল—কেন, আপনার স্বামীর গৃহ। যা প্রত্যেক সতী রমণী—।

মণিমালিনী মৃদু হাসিয়া কহিল—কিন্তু আমি তো সতী রমণী নই।

অরুণ বিরক্ত হইয়া কহিল—আমি আপনার সাথে তর্ক করতে আসিনি; আপনি যা নয় তাও বলতে চাইনে। শুধু আপনার স্বামীর কাকুতি মিনতিতেই আসা। তার যদি ভাব দেখতেন আপনি—তাহলে আপনার কঠিন হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হ'ত।

মণিমালিনীর মুখের উপর দিয়া চিন্তার ঢেউ খেলিয়া গেল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র, পরক্ষণেই তাহার আনন উজ্জ্বল হাসিতে ভরিয়া উঠিল, কহিল—আমি হীন, আমার কঠিন হৃদয়, আমি পতিতা অনেক কথাই বল্লেন, সে সবের কোনও জবাবই নাই। কিন্তু একটি কথা আপনি অন্যায় বলেছেন—স্বামীর হাজার কাকুতি মিনতিতেও আমার কোনও কালেই য়ার সঞ্চার হ'ত না।

মণিমালিনী একটু থামিয়া অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া একটু হাসিয়া বলিতে লাগিল — আপনি রাগ করবেন না। কিন্তু

আপনাদের পতিতা উদ্ধারের চেষ্টা পণ্ডশ্রম হবে। এতে সমাজের কোনও লাভ নাই — আর যাদের টেনে তোলবার চেষ্টা করছেন — তাদেরও মঙ্গল নাই।

অরুণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—আপনার কাছ থেকে উপদেশ নেবার জন্য আসিনি। সমাজের কিসে অপকার আর কিসে মঙ্গল, সে আমরা বেশ ভালই বুঝি।

মণিমালিনী হাসিতে হাসিতে কহিল—যাদের শুভ আপনারা করতে চান—তাদের মুখের দুটো কথাও তো শুনতে হয়। বুঝলাম পতিতার উদ্ধার করলেন—তারপর তাদের নিয়ে কি করবেন বলুন দেখি? সমাজ তাদের মনে প্রাণে গ্রহণ করলো না। যদি তাদের স্বামী থাকে—হয়তো তারা কোনও কারণে তাকে ঘরে স্থান দিল। কিন্তু সমাজের ঘা খেয়ে খেয়ে শেষ কালে তারও মন বিষিয়ে উঠলো, তার জীবন ভারাক্রান্ত হলো। তখন সেই স্ত্রীর জীবন কি ভয়াবহ হয়ে উঠবে! তারপর তাদের ছেলে-মেয়ে হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি সমস্যা জেগে উঠলো। এ সব কথাও ভেবে দেখেছেন তো?

অরুণ কহিল—তা দেখেছি বৈকি! হিন্দুসমাজ যে ক্রমশই উদার হচ্ছে, এ কি আপনারা জানেন না।—

—না, উদার হয়নি। তার প্রমানও যথেষ্ট আছে। এই সেদিন আমাদেরই মত একজন – না, ভুল বলেছি, আমাদের মত নয়, সে ভদ্রঘরের সতী রমণী, ইচ্ছায় নয় জোর করে তাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করা হয়। কিন্তু স্বামী তাকে গৃহে স্থান দিয়েছিল। হিন্দুসমাজ – এই পরিবারের প্রতি কি নির্দ্দয় ব্যবহার করেছে — সে তো জানেন। কি অসহ্য যন্ত্রণায় ঐ স্ত্রী জলে পুড়ে আত্মহত্যা করলো। এই তো আপনাদের সমাজের উদারতা? আরও প্রমাণ চান্?

অরুণ এই রমণীর তর্ক করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে যে অশিক্ষিতা নয়—এ ধারণাও তাহার বদ্ধমূল হইয়া গেল। ইহারই পাশে নবীন মালাকরকে কল্পনা করিয়া তাহার হাসি পাইতে লাগিল। কিন্তু তবু কহিল—না, প্রমাণ চাইনে। কিন্তু হিন্দুসমাজ যত অনুদারই হউক তাই বলে তো চিরকালই আমরা এইরকম থাকতে দিতে পারিনে। উদ্ধার করবার চেষ্টাতেও কি দোষ আছে?

সব্যঙ্গহাস্যে মণিমালিনী কহিল—সে চেষ্টার পরীক্ষাও তো আমাদের উপর দিয়ে চল্‌বে। আচ্ছা, এসব তর্ক থাকুক। আমার স্বামীর কথাই হোক। তাঁকে নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন, হয়তো সেদিন তাঁর সঙ্গে আপনিও থিয়েটারে উপস্থিত ছিলেন। তার ঘর করা কি আমার পক্ষে খুবই সোজা? এ আমার অহঙ্কার মনে করবেন না, কিন্তু আপনিই জবাব দিন। —এই বলিয়া সে দুষ্টামিভরা দৃষ্টিতে অরুণের মুখে দিকে চাহিল।

—কিন্তু নবীন তো আপনাকে খুবই ভালবাসে। যে স্বামী ভালবাসে তার ঘর করা এমন কি কষ্টকর আমি তো বুঝতে পারিনে।

মনিমালিনী হাসিতে হাসিতে কহিল—আপনার এযুক্তি আমি মানতে পারলুম না। যে ভালবাসে তারই ঘর কি সবসময়েই করা যায়? আপনি হয়তো বিবাহিত, আপনার স্ত্রীও নিশ্চয় শিক্ষিতা ও সুন্দরী। কিন্তু তা না হয়ে যদি সে কুৎসিত ও অশিক্ষিতা হতো—তা হলে তাকে নিয়ে আপনি পারতেন সুখে শান্তিতে ঘর করতে? এই ধরুন না যদি আমিই আপনার স্ত্রী হতুম! তা হলে কি করতেন বলুন দেখি? বিয়ের পরদিন ত্যাগ করে নিশ্চিন্ত হতেন।

অরুণের মুখ কঠোর ভাব ধারণ করিল, গম্ভীর স্বরে কহিল—আমি অবিবাহিত। সুতরাং আপনার ও উক্তি খাটবে না। কিন্তু বিবাহিত

হলেও যে আমার স্ত্রী হতো তাকেই আমি ভালবাসতুম।··· তারপর একটু নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল—আপনার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতে আসিনি। যেজন্য এসেছিলাম তা শুনেছেন, আমিও জবাব পেয়েছি। সুতরাং আর নয়—এখন চল্লুম। এই বলিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মণিমালিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল—দয়া করে আর একটু বসুন। আমার সব কথা এখনও বলা হয় নি।

অরুণ মুখ হাঁড়ির মত করিয়া পুনরায় চেয়ারে বসিল। সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে ঝি আসিয়া আলো দিয়া গেল। অরুণ কহিল—রাত হয়েছে আর থাকা যায় না।

মণিমালিনী সহাস্যে বলিল — রাত বেশী হয়নি সবে মাত্র সন্ধ্যা হলো। আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই—কারণ আপনি তো কোন মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন নি। ···তারপর মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিয়া লইয়া কহিল —আমার স্বামী কি এখনও এখানেই আছে ?

—না দেশে চলে গিয়েছে।

—আমার উদ্ধারের ভার বুঝি আপনাদের সমিতির হাতে দিয়ে গেছে ?

অরুণ কোনও কথা বলিল না।

মণিমালিনী অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—সব মানুষের মন কি একই রকমে গড়া আপনার মনে হয় ?

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া অরুণ কহিল—সে কথা আমি বলিনি।

মণিমালিনী সহাস্যে কহিল—আপনি এখনও রেগে আছেন দেখছি। যাক্ আমার সব কথা খুলেই বলি। আমার হৃদয় বিধাতা এম্নি করে গড়েছিলেন যে স্বামীর ঘরে মন বসলো না। অথচ স্বামী আমাকে ভালই

তো বাসতো। হয় তো আমাদের জা... অন্য কোনও মেয়ে স্বাম
কাছে এত আদর পায় নি। কি... ই আদরই তো আমার সর্ব্বন
করলো। শ্বাশুড়ী ননদের মত সেও যদি সমান ভাবেই আমাকে তাড়
করতো—আমার হয়তো কিছুই মনে হতো না। দিনে তাদের অজ
গালাগালি আর প্রহার, রাত্তিরে স্বামীর অযাচিত স্নেহ আমার মন
একেবারে বিষিয়ে তুলেছিল।··· এই বলিয়া সে মুচকি হাসিয়া অরুণের দি
চাহিল। অরুণ কোনও উত্তর দিল না।

মণিমালিনী বলিতে লাগিল—আমি নীচ জাতের মেয়ে বটে—কি
আমার আশা আকাঙ্খা কিন্তু ছোটবেলাথেকে নীচ ছিল না। আ
ইস্কুলে পড়েছি—আর বরাবরই প্রথম হয়ে—পুরস্কার পেয়েছি। কি জা
কেন মনে হতো আমার ভাগ্য খুবই ভাল হবে। কিন্তু আমার সম
কল্পনা বিয়ের রাত্রেই ভেঙ্গে গেল—স্বামীকে আমি বিষ নজরে দেখলুম
তার চেহারা আর বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমার গা ঘিন ঘিন করতো—
আপনাকে স্পষ্টই বল্‌ছি। তবু তো ...ই সহ্য করে ছিলুম। কি
ভগবানের ইচ্ছা বুঝি অন্যরূপ তাই তিনি আমাকে ...ক্তি দিয়ে তবে ছাড়লে
—এখন নবজীবনের সাধ পেয়েছি আর ফিরবার ইচ্ছা নাই।

অরুণ গম্ভীর ভাবে কহিল—বেশ, আপনার স্পষ্ট কথা শুনে নিশ্চি
হওয়া গেল। তাহলে এইবার আসি।

—যাবেন? আমার লাইব্রেরীটা একবার দেখবেন না?

—দরকার নাই। আপনি যে অশিক্ষিতা ... তার প্রমাণ আ
পেয়েছি।

খোঁচা খাইয়া মণিমালিনী কহিল—ঐটুকুই আমার দুর্ব্বলতা। নতু
কেউ এলেই আমি আমার বইগুলো দেখিয়ে দি'। আচ্ছা তাহলে আসুন
ভালকথা আপনার নামটি কি—শুন্‌তে পারি কি?

অরুণ কহিল—প্রয়োজন দেখছিনে—কারণ ভবিষ্যতে আমার আপনার সাথে দেখা হবার সম্ভাবনা নাই। এখন আসি।… এই বলিয়া অরুণ গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অরুণ চলিয়া যাইতেই মণিমালিনী 'আশ্চর্য্য লোক' অস্ফুটস্বরে এই কথা বলিয়া নিজের মনেই হাসিয়া উঠিল। ঝি আসিয়া কহিল—ও বাবুটি কে গা দিদিমণি? কেমন ধারা ভদ্দর লোক? বকশিস চাইতেই কটমট করে তাকালো যেন দিষ্টি দিয়ে ছিষ্টি নাশ করবে। আহা, যেমন পোষাক তেম্‌নি চেহারা। দরওয়ান মিন্সের যেমন কাজ নাই—লোক ঢুকালেই হলো। ছিঃ ছিঃ, গলায় দড়ি!

মণিমালিনী হাসিয়া কহিল—তোর যেমন আক্কল। উনি হচ্ছেন স্বদেশী বাবু, বকশিস দেবেন কেন?

ঝি গালে হাত দিয়া কহিল—স্বদেশী বাবুদের আবার এখানে আসা কেন? যাক্‌গে, এইবার তোমার চা আনি?

—আচ্ছা, নিয়ে আয়।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়াছে এমন সময় প্রতুল গাঙ্গুলী আসিয়া পৌছিল। মণিমালিনী ঝিকে আর এক কাপ চা আনিতে আদেশ করিল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মণি কহিল — আজ এক মজার লোকের পাল্লায় পড়েছিলুম।

মুচকি হাসিয়া প্রতুল কহিল—সে তোমাকে স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার কথা বল্‌ছিল।

বিস্মিত হইয়া মণিমালিনী কহিল…সে কি! তুমি জানলে কি করে?

…আমি দৈবজ্ঞ, জাননা বুঝি? এই বলিয়া সে চিবুকটি নাড়িয়া দিল।

—লোকটা ভারি কাটখোট্টা গোছের, একটুও যদি রস থাকে। যেমন পোষাক তেমনি কথাবার্তা।

সহাস্যে প্রতুল বলিল—তাহলে চেহারাটা নিশ্চয়ই খুব ভাল হবে।

—চলন সই। কিন্তু বিদখুটে লোক। নামটা পর্য্যন্ত বল্লো না। খুব গরীবটরীব হবে বুঝি!

প্রতুল কহিল—বরং তার উল্টো। বছরে চার লাখ টাকা আয়ের মালিক। নাম অরুণচন্দ্র চৌধুরী। প্রেসিডেন্সীতে এম-এ পড়ে—বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছেলে।

চোখ বিস্ফারিত করিয়া মণিমালিনী কহিল—বটে? এতো খবর জানলে কি করে?

—সব বল্‌বো।—কিন্তু কি বলে গেল? আবার আসছে কবে?

—আর আসবে না। সুবিধে বুঝলো না যে!

প্রতুল একটু ভাবিয়া কহিল—মণি, এমনি লোক যদি সহায় পাই। থিয়েটারটা জাঁকিয়ে তুলি।

মৃদু হাসিয়া মণি কহিল—লোকটি রাম শ্যাম যদুর মত নয়—একটু বিশেষত্ব আছে।

শীতের ভোর বেলায় বৃদ্ধা হরিভাবিনী কেঁথা গায়ে জড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দাওয়ায় বসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন—বউমা, মুখ ধোয়ার একটু জল দিয়ে যাও তো।

বধূ চারুবালা রান্নাঘর নিকাইতেছিল, শাশুড়ীর ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া একঘটি জল, পেয়ারার কচি পাতা ও নূন শাশুড়ীর সম্মুখে রাখিল।

হরিভাবিণী প্রীত নয়নে বধূর দিকে চাহিয়া কহিলেন—এর মধ্যে পেয়ারা পাতাও জোগাড় করে রেখেছ? তুমি যদি না থাক্‌তে মা, তাহলে এই বুড়ো বয়সে কি যে দুর্গতি হতো আমার—তা ভাবতেও পারিনে। এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

মুখ ধোওয়া হইলে চারুবালা দাওয়ার উপর মাদুর বিছাইয়া দিয়া কহিল—বেশ রোদ্দূর এখানে, এখানে বসুন—আমি ওষুধ নিয়ে আসি।

তারপর খল নুড়িতে কবিরাজী ঔষধ মাড়িয়া সে শাশুড়ীর হাতে দিল। ঔষধটুকু গিলিয়া মুখ বিকৃতি করিয়া তিনি কহিলেন—কি বিটকেল ওষুধ মা! তারপর মুখ মুছিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন—ওষুধ খেতে আমার ইচ্ছে করে না, শুধু তোমার জন্যই খাওয়া। আর নাতি নাতনির মুখ না দেখে মরতেও যে ইচ্ছে করে না বৌমা!

বধূ লজ্জিত হইয়া মস্তক নত করিল।—হরিভাবিণী বলিতে লাগি-

লেন—নিজে হাতে গাছ বুনে তার ফল খাওয়া যেমন সৌভাগ্যের কথা—নাতি নাতনীর মুখ দেখাও তেমনি। আমার এমনি অদেষ্ট—এতদিন তো দেখতামই — শুধু ভগবান বাদ সাধলেন।······তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—সেবার তো দু'মাসেই নষ্ট হয়ে গেল, এবারই বা আমার কপালে কি আছে কি জানি। ভট্‌চাজ গিন্নীর কাছে মাদুলির জন্য যাব মনে করি—কিন্তু পোড়া শরীর এমনি হয়েছে যে একটু নড়তে গেলেই মাথা ঘুরে ওঠে। দেখি আজ দুপুর নাগাদ যেতে পারি কিনা।

বধূ কাজে চলিয়া যাইতেছিল তাহাকে ডাকিয়া হরিভাবিণী কহিলেন—যতীনের চিঠি কি এর মধ্যে পেয়েছ?

চারু কহিল—না।

—তুমি তাকে চিঠি লিখেছ তো? আমার অসুখের কথা জানিয়েছো? বধূ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল — এ সম্বন্ধে তাহার কোনও ত্রুটি হয় নাই।

হরিভাবিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—লোকে ছেলে ছেলে করে, কিন্তু ছেলে দিয়ে যে কত সোয়াস্তি সে তো আমি হাড়ে হাড়েই বুঝছি। বাড়ীতে বুড়ো মা, কচি বৌ, কোনও পুরুষ মানুষ নাই—অথচ ছেলের এদিকে একটুও দৃষ্টি নাই। আমরা কি খাই, কি পরি—তার খোঁজ খবরও সে রাখতে চায় না। কলকাতায় কি যে তার বড় কাজ সেই জানে!

চারু তাড়াতাড়ি সেখান হইতে রান্নাঘরে গিয়া চোখদুটি একবার কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ঘর নিকাইতে বসিল।

হাতের কাজ সারিয়া স্নান সমাপন করিয়া চারু শ্বাশুড়ীর নিকট আসিয়া কহিল—আপনার জন্য তাহলে সাগু চড়িয়ে দি'?

ব্যস্ত হইয়া হরিভাবিণী বলিলেন—আজ আর সাগুটাগু নয়, দু'টি ভাতই খাব মনে করছি।

বধূ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না মা, কালও যে বেশ জ্বর হয়েছিল। দেখি এখনও আছে কিনা। তারপর হাঁটু গাড়িয়া সম্মুখে বসিয়া তাঁহার কপাল ও গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া কহিল—এখনও জ্বর একটু আছে বোধ হচ্ছে।

শ্বাশুড়ী বিরক্তির সুরে কহিলেন—ঐ তোমার দোষ বৌমা, আমার গায়ে হাত দিলেই তুমি জ্বর দেখতে পাও। জ্বর আবার কোথায়— আমার শরীর কি আর আমি বুঝতে পারি নে? শীতকাল কিনা, সব সময়েই গা অম্‌নি একটু গরমই থাকে। যাই হোক, আমি আর সাগু বার্লি খাচ্ছিনে—জ্বর থাকলেও নয়।

বধূ হাসিয়া কহিল—কবরেজ মশায়কে একবার জিজ্ঞাসা—

শ্বাশুড়ী রুষ্ট হইয়া কহিলেন—কবরেজকে আবার জিজ্ঞাসা করার দরকার কি! তাকে যা বলতে হয়, আসুক সে—আমিই বলবো। তুমি আর কথা কাটাকাটি করো না। পুরণো অসুখে ভাতটাত না খেলে কাহিল হয়ে পড়তে হয়। পলতা পাতার ঝোল আর চারটি ভাত—এতে কিচ্ছু কুপথ্যি হবে না। বঁঠিটা এখানেই দিয়ে যাও না আমি দুটো আলু বেগুন কুটেদি।

চারু কহিল—আপনি শুয়ে থাকুন, আমিই কুটেকেটে নেব এখন। এই বলিয়া অনিচ্ছা সত্বেও শ্বাশুড়ীর আজ্ঞা পালন করিবার জন্য সে রান্নাঘরে গমন করিল।

হরিভাবিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—পরের মেয়ে হয়ে তোমার যেমন দরদ বৌমা — এমন তো নিজের ছেলের কাছেও পাইনে।

কি জানি ভগবান কতদিন এমনি করে বিছানায় ফেলে রাখবেন কতদিনে তোমার দুঃখের দিন শেষ হবে!

রান্না শেষ হইলে কাপড় ছাড়িয়া কয়েকবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া হরিভাবিণী ভাত খাইতে বসিলেন। বধূ নিকটে বসিয়া শাশুড়ীর খাওয়া দেখিতে লাগিল। দুই এক গ্রাস মুখে দিয়াছেন এমন সময় বাহির হইতে কে যেন কহিল—বলি যতীনের মা, কেমন আছ আজ?

হরিভাবিনী সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন—বুড়ো কবরেজ বুঝি? সময় পেলে না আর আসবার! দুটো ভাত খেতে বসেছি—শক্রতা করবার এই সময় হ'লো। তারপর হাতের গ্রাস পাতে ফেলিয়া কহিলেন—থালাটা ঘরের ভিতর রেখে এস বৌমা, ভাত খাওয়া দেখলে আবার কবরেজ চটে যাবে। তার কি, আরামও করতে পারে না, কেবল ভুগিয়ে মারবে!

বধূ শাশুড়ীর দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখিতও হইল। অথচ মনে মনে না হাসিয়াও পারিল না। সে থালা বাটি চট করিয়া ঘরের ভিতর রাখিয়া দিল। কবিরাজ মহাশয় পুণরায় হাঁক দিয়া কহিলেন—বউমাকে একটু সরে যেতে বল। আমি আসছি।...এই বলিয়া হরিধন কবিরাজ চটিজুতা ফট্‌ফট্ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিভামিনী মুখ গম্ভীর করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলেন।

কবিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন আছ যতীনের মা? পথ্যি করেছিলে বুঝি? কি পথ্যি করলে?

বিরক্তির সুরে বৃদ্ধা কহিলেন—পথ্যি আর কি করবো কবরেজ মশায়। একটু পলতা পাতার ঝোল নিয়ে বসেছিলাম।

—ভাল, ভাল। পলতা পাতায় পিত্ত নাশ করে। কাল কি জ্বর এসেছিল?

অপ্রসন্ন মুখে হরিভাবিনী কহিলেন—জ্বর আবার আসবে না? কেমন চিকিচ্ছে করছেন—তা আপনিই জানেন। আমি তো ভুগে ভুগে মলেম।

বৃদ্ধ কবিরাজ অতি সজ্জন লোক, সহাস্যে কহিলেন—ভোগ যতদিন আছে অদৃষ্টে ততদিন তো ভুগতেই হবে দিদি। আমি তো কোনও ত্রুটি করছি নে দেখতে! ওষুধ টষুধ ঠিকমত খাওয়া হচ্ছে তো?

—তা আবার হচ্ছে না! বউমার সেদিকে একটুও ত্রুটি নেই। আপনি যদি বলেন একগুণ--সে করে দশগুণ। বউই তো আমাকে জ্বালিয়ে তুলেছে!

কবিরাজ মহাশয় দন্তবিহীন হাসি হাসিয়া কহিলেন—বেশ, বেশ, বড় লক্ষ্মী বউ তোমার। একালে এমন দেখা যায় না। তারপর যতীনের খবর কি? বাড়ী টাড়ী আসা যে একেবারে ছেড়ে দিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিভাবিণী কহিলেন—এক রকম তো তাই দেখছি। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে তো ছেলের দেখা পাইনি।—কলকাতায় নাকি সে বড় বড় কাজ নিয়ে আছে। কি জানি কেমন তার কাজ! বাড়ীতে তো একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করে না। ভাগ্যিস্ কর্ত্তার আমলের কিছু জমিজমা আর দু'চার ঘর প্রজা আছে। নইলে বুঝি বউটাকে নিয়ে উপোস করে মরতাম! আর কচি বউয়ের মুখের দিকেও তো তাকানো যায় না। তার ওকুলে তো কেউ নাই যে তাদের কাছে গিয়ে দুদিন জুড়িয়ে আসবে। কি যে অদৃষ্টে আছে ভগবানই জানেন।

কবিরাজ মহাশয় কহিলেন—যতীন আসবে বৈকি। নিশ্চয়ই কোনও কাজে টাজে জড়িয়ে পড়েছে। দেখি হাতটা একবার—জ্বর আছে কি না।

হরিভাবিণী বাম হস্ত বাড়াইয়া দিলে কবিরাজ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন — নাড়ীর গতি চঞ্চল দেখছি, জ্বর আবার আসতে পারে। ঐ ওষুধই এখন চলুক, দু'দিন দেখে তারপর যা হয় করবো।……এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

চারুবালা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল—ভাতের থালা এনে দেব মা ?

—থাক্ থাক্। ভগবানের ইচ্ছে নয় যে ভাত খাই। হাত ধোয়ার জল দেও তো বৌমা। গায়ের মধ্যে কেমন সির সির করছে—জ্বর বা বুঝি আবার এসে পড়লো।

সেদিন রাত্রে চারু মাদুর পাতিয়া বসিয়া প্রদীপের আলোকে স্বামীকে পত্র লিখিতেছিল। তক্তপোষের উপর হরিভাবিনী আপাদমস্তক লেপে ঢাকিয়া শুইয়াছিলেন। এতক্ষণ জ্বরের যন্ত্রনায় তিনি ছটফট করিতেছিলেন—একটু সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেই চারু চিঠি লিখিতে বসিয়াছিল। স্বামীর নিকট কিভাবে লিখিলে করুণার সঞ্চার হইবে সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। বারংবার চোখের জলে তাহার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল। ইহার পূর্ব্বে সে তিন চার খানি পত্র লিখিয়াছে—কিন্তু কোনও উত্তর পায় নাই। তাহার ভালবাসায় স্বামী তৃপ্ত নয় তাহা সে জানিত—কিন্তু নিজের জননীকে সে ভুলিল কি করিয়া? এই মা কি কষ্টে তাহাকে অতি শিশুকাল হইতে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন—ইহা চারু চোখে না দেখিলেও কানে তো শুনিয়াছে! সেই মা রোগে শয্যাগত হয়তো তাঁহার জীবনের মিয়াদ নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে—তবু কি তাহার স্বামী একবার চোখের দেখাও দেখিয়া যাইবে না? পুত্রের এই অবহেলা জননীর বুকে যে কতখানি বাজিয়াছে—তাহাতো তাহার জানিতে বাকি নাই।

চারু পত্র লিখিতে বসিয়া প্রথমে কাটাকুটি করিয়া অনেকগুলি কাগজ নষ্ট করিয়া ফেলিল, তারপর মনকে শক্ত করিয়া লিখিল—

শ্রীচরণ কমলেষু—

ইতিপূর্ব্বে চারখানি চিঠি লিখিয়াছি কিন্তু কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই। পুনরায় চিঠি লিখিয়া তোমার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমা

ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মায়ের মুখের দি‌ তাকাইয়া মনকে স্থির করিতে পারি না, তাই চিঠি লিখিতেছি। তুমি তাঁর একমাত্র সন্তান অতি দুঃ তিনি তোমাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি তুমি বি ব্যবহার করিতেছ এটুকু ভাবিয়া দেখিবারও কি তোমার অবসর নাই? এমন কি কাজে মত্ত রহিয়াছ যে নিজের ভুলিতে বাধে না? আমার কথাগুলি কঠোর হইলেও না লিখিয়া পারিতেছি না—ক্ষমা কোরো।

মা জ্বরে জ্বরে একেবারে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আর বেশী দিন বাঁচিবেন বলিয়া মনে হয় না। এ সময় তোমার একবার আসা উচিত, আমার মনে হয়। তুমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলে পত্র পাঠ রওনা হইও। আজ মায়ের জ্বর খুব বেশী হইয়াছে জ্বরের ঘোরে তিনি অচৈতন্য হইয়া আছেন। যা ভাল বিবেচনা কর করিবে। প্রণাম নিও।

সেবিকা—

চারু

লেখা শেষ করিয়া চারু একবার চিঠিখানি পড়িল। লেখাটি খুবই কঠোর হইল কি? স্বামী যদি রাগ করেন? পরক্ষণেই সে ভাবিল সে অন্যায় কিছুই লেখে নাই ইহাতে রাগ ক'রলে তাহার উপায় কি?

রাত্রি বোধ করি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। চারু চিঠিখানা খামে বন্ধ করিয়া ঠিকানা লিখিয়া ফেলিল। বাহিরের বারান্দায় শব্দ পাইতেই চারু মৃদুস্বরে কহিল—কে গোপাল নাকি?

ভেজানো দরজাটি একটু ফাঁক করিয়া গোপাল কহি —হ্যাঁ বউমা।

—আজ এত দেরী করলে যে!

গোপাল কহিল—ছেলে কোথা থেকে তাড়ি খেয়ে এসে বউকে মার ধোর আরম্ভ করেছিল সেই হাঙ্গামায় পড়ে বিলম্ব হয়ে গেল। মা আজ কেমন আছেন বউ মা?

—খুব জ্বর হয়েছে।·· তারপর একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—কাল গোবরাকে সকালে পাঠিয়ে দিও তো গোপাল আমি কতবার নিষেধ করেছি তবু বউয়ের গায়ে হাত তোলে!

গোপাল বলিল—হ্যাঁ বৌমা, পাঠিয়ে দেব। তোমার কথা তো খুবই শোনে। কিন্তু নেশা টেশা করিলে আর জ্ঞান থাকে না। ছেলে তো আমার মন্দ নয়।

বৃদ্ধের সন্তানপ্রীতি দেখিয়া চারু হাসিল, মৃদুস্বরে কহিল—ঐ নেশাই তো ছাড়াতে হবে গোপাল!

গোপাল মণ্ডল হরিভাবিনীদের প্রজা। এম্নি তাহাদের আট দশ ঘর প্রজা আছে। সকলেই নীচ জাতি। কিন্তু তবু ইহাদের নানা রকমের সাহায্যেই তাহাদের দিন চলে। এই কয়েক ঘর প্রজার সহানুভূতি না পাইলে এই দুঃখী পরিবারের কষ্টের বোধ হয় অবধি থাকিত না। তাহারাই বিপদে আপদে আসিয়া বুক দিয়া পড়ে, এই দুইটি রমণীকে জননীর অধিক ভক্তি করে। বিশেষতঃ চারুবালাকে তাহার ভগবতীর অংশ বলিয়া মনে করিয়া থাকে! তাহার রূপগুণ, কথা-বার্ত্তা, আচার ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট। এমন কি তাহার কথাতে ইহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। বাড়ীতে কোনও পুরুষ মানুষ না থাকায় ইহারাই পালা করিয়া দাওয়ায় শুইয়া পাহারা দেয়।

চারু কহিল—রাত অনেক হয়েছে গোপাল, এইবার তুমি শুয়ে পড়।

গোপাল বলিল—হ্যাঁ শুয়ে পড়ছি! আচ্ছা বৌমা, দাদা বাবু কি এর মধ্যে আসবে না?

—সে তোমার দাদা বাবু জানেন। আমি বলবো কি করে!

গোপাল একটু ভাবিয়া কহিল—উঁহু, এ ভাল কথা নয়, আমার মন

যেন ভাল বলে না। কলকাতায় তেনার কি এমন টান যে ঘরের কথা মনে থাকে না।

তারপর একটু থামিয়া মাথা ঝাঁকাইয়া কহিল—আমাকে একবার ঠিক্‌নাটা দিতে পার বউ মা, আমি না হয় একবার দেখে আসি।

চারু হাসিয়া কহিল—তুমি কি যেতে পারবে গোপাল ?

গোপালের যেন আত্মমর্য্যাদায় ঘা লাগিল, সে দর্পভরে বলিতে লাগিল—হেঁ, এই গোপাল মণ্ডল যেতে পারে না এমন দেশ কি পিরথিবীতে আছে। যখন ছোট মেয়ে ফুলীর বিয়ে দিই শ্যামসুন্দরপুর, লোকে বলতে লাগলো, গোপাল, অমন কাজটি করো না, দশ কোস্ দূরে মেয়ের বিয়ে দিলে কুটুম কুটুম্বিতে ভাল চলবে না। তোমার [illegible]ড় কি হাঁটা হাঁটি সহ্য হবে ? কিন্তু কারও কথা কানে তুল্লাম [illegible] আমি ? দশ কোস্—ইঃ, ভারি তো দূর ! আজ সকালে যদি বেরোই বিকেল নাগাদ পৌছে যাব ! হাঁটাকে আমি তো বড়ই ভয় করি। দাদা বাবুর ওখানে যেতে না হয় দুঘড়ি রাত হবে ! তা আমি খুব পারবো, সেজন্য তুমি ভেব না। শুধু একবার ঠিকানাটা দাও।

চারু এই সরল প্রকৃতি বৃদ্ধের কথা শুনিয়া হাসিল, কহিল—আচ্ছা গোপাল, সে না হয় দেব। একখানা চিঠি লিখে রেখেছি কাল সকালে ডাকে দিয়ে এস।

গোপাল কহিল—চিঠি লিখেছ ভালই হয়েছে। কিন্তু চিঠি পেয়েও যদি না আসে আমি নিজে যাব। দেখবো, তখন আসে কি না ? আমি তেমন জমিদারের প্রজা নয় ?···এই বলিয়া সে শুইবার আয়োজন করিয়া লইল।

দরজার খিল বন্ধ করিবার শব্দে হরিভাবিনী জাগিয়া উঠিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—এখনও জেগে আছ বৌমা।

চারু নিকটে গিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিল—ইস্, বড্ড ঘাম বেরোচ্ছে যে মা, জ্বর ছাড়বে বুঝি? এখন না হয় লেপ খুলে ফেলি?

হরিভাবিনী কহিলেন—ঘাম ভাল করে বেরোক তাতেই জ্বর কমে যাবে। তুমি ঘুমোও, রাত অনেক হয়েছে।

চার পাঁচ দিন পর যতীন বাড়ী ফিরিল। হরিভাবিনীর দুই দিন হইল জ্বর ছাড়িয়াছে সেদিন তিনি অন্নপথ্য করিবেন। তিনি পুত্রকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কিন্তু যতীন ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না, কহিল—তুমি ভাল হয়ে গিয়েছ, একথা আগে থেকে জানালেই হ'তো। হাতের কতগুলো দরকারী কাজ ফেলে এই ছুটাছুটি করে আসা। উঃ, কি রকম ক্ষতিটা হয়ে গেল আমার।

পুত্রের কথায় হরিভামিনী অন্তরে অত্যন্ত বেদনা পাইলেন তবু কহিলেন—কাজ তো তোর চিরকালই আছে যতীন! দুদিন না হয় বাড়ী থেকে ঘুরেই গেলি?

অপ্রসন্ন সুরে যতীন কহিল—মেয়ে মানুষ জাতটা এমনি স্বার্থপরই বটে! এ সব কাজের তত্ত্ব তোমরা বুঝবে কি করে? কেবল ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লেখা জানে সব। যেন কি কাণ্ডই ঘটে গেল!

চারু রান্নাঘরে থাকিয়া স্বামীর মন্তব্য শুনিয়া বুঝিল ইহা তাহার উদ্দেশ্যেই হইতেছে। একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হরিভাবিনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তীব্রস্বরে কহিলেন আমার পেটে জন্মিয়ে তুই কেন এমন হলি, আমি তো বুঝে উঠতে পারিনে যতীন। আমার মুখের দিকে না তাকাস্, যাকে ঘরে এনেছিস্ তার ওপরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে? বউমা কি খাবে কি পরবে সে ভাবনাও কি আমাকেই ভাবতে হবে?

যতীন কহিল—কেন জমি জমা যা আছে তোমদের দুটি মানুষের কি তাতে চলে না? আমি তো তার কিছুই নিই না। ঐ যে কর্ত্তব্যের কথা বলছো সে জ্ঞান আমারও যথেষ্ট আছে। শুধু নিজের মা আর বোয়ের দিকে তাকালেই তো চলে না আরও অনেক বড় কর্ত্তব্য আছে। আমি তাই নিয়েই আছি এসব ছোট খাট কর্ত্তব্যের দিকে তাকালে আমার চলবে না। একটা 'মাতৃ আশ্রম' খোলার চেষ্টা করছি, যতসব অনাথা নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোক সেখানে আশ্রয় পাবে। এতে প্রায় লক্ষ টাকার দরকার। এতগুলি টাকা তোলা কি সহজ কথা! তোমরা তো ভাব আমার কোনও কাজই নাই। মা, বুড়ো হয়ে মরতে চলেছ, এখনও নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবতে শেখ।

রান্না ঘরের দরজার পাশ হইাত চারুর মুখখানি দেখা গেল। যতীনের সেদিকে চোখ পড়িতেই চারু হাতছানি দিয়া ডাকিল। যতীন বিরক্ত মুখে অগ্রসর হইলে চারু মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল—মাকে তুমি অমন করে বলো না। জ্বরে ভুগে ভুগে ওঁর শরীরে আর কিছুই নাই—তার উপর তোমার বাক্য যন্ত্রনা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। চিঠি লিখে অন্যায় আমিই করেছি। এ দোষ মায়ের নয়। তবু তোমাকে আমরা ধরে রাখতে চাই নে। আজই তুমি চলে যেতে পার। তোমার যেটুকু কাজের ক্ষতি করেছি সে জন্য মাপ চাচ্ছি!

অত্যন্ত স্পষ্ট কথা। যতীন প্রথমটা কি উত্তর দিবে ভাবি পাইল না। কিন্তু পরক্ষণেই কহিল—নিশ্চয় চলে যাব। আলবৎ যাব সে কথা আর কাউকে বলতে হবে না। আমার কর্ত্তব্যে বাধা দেওয়া অত সোজা নয়।

তাহার কথায় চারুর কি জানি কেন অত্যন্ত হাসি পাইল। মানুষ যে এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন হইতে পারে ইহা বোধ করি তাহার ধারনা ছিল না।

অরুণ ভাবিতে লাগিল—লাইব্রেরীটা দেখিয়া আসিলেও, চলিত। কি রকম বই ইহারা পড়ে সত্যই দেখিতে কৌতুহল হয়। আর তাহাতে এমনই বা কি দোষ হইত। না হয় আর কিছু দেরী হইত মাত্র!

কিন্তু সেতো তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য যায় নাই। কি হইবে তাহার সহিত এতটা মাখামাখি করিয়া? তাহার চেয়ে এই ভাল হইয়াছে। ও সব মেয়েমানুষের সংসর্গে যত কম থাকা যায় ততই মঙ্গল। সত্যই কি বেহায়া এই মণিমালিনী? অম্লানবদনে বলিয়া গেল—যদি তাহার সহিত বিবাহ হইত, তাহা হইলে কি করিতাম? কোনও ভদ্র রমণী কি একথা এমন ভাবে উচ্চারণ করিতে পারিত। যাহা হউক, তাহার জীবনে একটা অভিজ্ঞতা হইয়া গেল।

—অরুণ, সন্ধ্যার পর কোথায় ছিলে?······সমীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া এই কথাগুলি বলিল।

সমীর চমকিত হইয়া কহিল—কে, আমি? একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম। তুমি এসেছিলে না কি?

সমীর সহাস্তে কহিল—হ্যাঁ, একবার ঘুরে গিয়েছি। যাহোক, আজ-কাল তোমার বেড়ানো অভ্যাসটা হয়েছে। আগে তো ঘর থেকে বেরোতেই না।

অরুণ সত্য কথা গোপন করিতেছে বলিয়া মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল,—কিন্তু সমস্ত কথা সমীরের নিকট খুলিয়া বলিতেও তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না। ছিঃ, তাহা হইলে সমীর মনে করিবে কি? কিছুদিন গেলে তাহার নিকট না হয় সমস্ত খুলিয়া বলিবে। সমীর যতীন্ বাবুকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না—তাহারই অনুরোধে সে মণিমালিনীর বাড়ী গিয়াছিল—ইহা শুনিলে সে নিশ্চয় টিটকারি দিবে।

অরুণ কহিল—তুই দুইবার তোমার কিসের জন্য আগমন, সমীর?

সমীর বলিল—কালই আমি বাড়ী যাচ্ছি।

বিস্মিত হইয়া অরুণ কহিল—কালই? কিন্তু কলেজ বন্ধ হতে এখনও দশ দিন দেরী যে।

—বড় জরুরী ডাক পড়েছে ভাই। পরশু দিন আমাদের সেই স্কুলটি খেলার দিন। আমাকে যেতেই হবে। তারপর তুমি বাড়ী যাচ্ছ কবে?

—কলেজ বন্ধ হলেই যাব। এখানে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। এ কটা দিন কেটে গেলেই বাঁচি।

সমীর কহিল—মাকে ব'লো—এবার আর আমার যাওয়া ঘটলো না। পূজোর ছুটিতে পারি তো যাব।

—পারিতো যাব? কেন? সমীর, তুমি যে কি রকম কাজের লোক হয়েছ এতেই বোঝা যায়। আজকাল যেন গ্রামের ওপর একটু বেশী টান তোমার দেখতে পাই।

সমীর হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, একটু টান বেশীই হয়েছে সমীর। জ্যেঠামশায় বড্ড তাগিদ দিয়ে পৃথক করে দেবার বন্দোবস্ত করেছেন কি না! এবার নিজের সংসার নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হবে।

অরুণ জানিত—সমীরের এই জ্যেঠামহাশয় ভিন্ন নিকট আত্মীয় আর কেহ নাই। সংসারে সে সম্পূর্ণ একাকী। এই জ্যেঠামহাশয়টিও কি ভাবে তাহাকে ঠকাইয়া নিজের অংশ বৃদ্ধি করিবেন, সেদিকে তাঁহার অত্যন্ত খরদৃষ্টি। সে কহিল—অমন জ্যেঠামশায়ের সংশ্রবে যত না থাকা যায় ততই ভাল। বরং তোমার পৃথক হওয়াই উচিত।

সমীর হাসিয়া বলিল—আমাকে আর হতে হবে না, তিনিই করে

সত্যই যতীন একটি দিনও অপেক্ষা করিল না। সেইদিন বৈকালেই সে কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

হরিভাবিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—বৌমা, যতীন বুঝি আমাকে মরতে দেখবে ভেবেই এসেছিল। সত্যিই বড় বেদনা পেয়ে গিয়েছে আজ। কিন্তু আর বেশী দিন নয় আমার ডাক পড়েছে। কিন্তু তোমার জন্যেই যে ভাবনায় আমার বুক শুকিয়ে যায় মা।

চারু দৃঢ়স্বরে কহিল—ভাবনা করে আর কি হবে মা! আমি তো নিজের জন্য কিছুই ভাবি নে। ভগবান যা করবেন তাই হবে। আপনিও তাঁরই উপর সমস্ত নির্ভর করুন। মানুষের সাধ্য কিছুই নয়।

হরিভাবিনী আর্দ্রস্বরে বলিলেন—বউমা তুমি এই বয়সে কেমন করে এত কথা শিখলে আমি তো ভেবে পাই নে।

— ১৩ —

সেদিন মণিমালিনীর নিকট হইতে বাসায় ফিরিয়া অরুণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। উঃ, কি ধড়িবাজ মেয়ে মানুষ! তাহার কথার মর্য্যাদা পর্য্যন্ত রক্ষা করিল না! কোথাকার কোন নবীন, হাঁড়ি কলসী গড়িয়া খায়—তাহার জন্য এ কি কর্ম্মভোগ! যে স্থানে যাইবার কল্পনাও সে কোনদিন করে নাই—অবশেষে সেইখানেই যাইতে হইল? ছিঃ ছিঃ, সমীর একথা শুনিলে বলিবে কি?

মনকে সে এই বলিয়া বুঝাইতে চাহিল—ইহাতে তাহার কোনও দোষ নাই। শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরেই ঐরূপ স্থানে গিয়াছিল। তবে ইহাও ঠিক আর সে এরূপ কাজের ভার লইবে না। যতীনবাবুর শত অনুরোধেও নয়—ইহাতে 'যুবক সমিতি' ছাড়িতে হয় তাহাও স্বীকার।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই মণিমালিনী! তাহার রূপ, তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী, হাব ভাব—সমস্তই যেন অত্যন্ত বিস্ময়কর? কে বলিবে এই রমণী হীন নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে! নবীনকে সে দেখিয়াছে- তাহার সহিত ইহার কোনও অংশেই তুলনা হয় না। সত্যই তো তাহার গৃহে মণিমালিনীর মন বসিবে কি করিয়া? সম্ভবতঃ সে অত্যন্ত শিক্ষিত—অন্ততঃ তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাই তো মনে হইল। কিন্তু অহঙ্কারও তাহার কম নয়, শিক্ষিতা বলিয়া অভিমানও বেশ আছে। আসিবার সময় লাইব্রেরী দেখানোর কথাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

দিন দুই তিন পর যতীন মুখুজ্যে আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—দুদিন আপনার কোন খোঁজ নিতে পারিনি, মাপ করবেন অরুণবাবু। এর মধ্যে একবার বাড়ী ঘুরে আসা গেল। যদিও বৃহত্তর কর্ত্তব্যে মেতে রয়েছি তবু মাঝে মাঝে ঘরের দিকেও তাকাতে হয়। সেটাও একটা কর্ত্তব্যেরই মধ্যে কি বলুন?

অরুণ কহিল—নিশ্চয়। বাড়ীর সব ভাল আছে তো?

তা একরকম আছে। আর বাড়ীর মধ্যে তো মা আর স্ত্রী। মা মাঝে মাঝে জ্বরে ভোগেন, আবার সেরে ওঠেন। ম্যালেরিয়া জ্বর আর কি। এখানকার কাজের হাঙ্গামা শেষ করে একবার গ্রামের দিকে মন দেব মনে করছি। আমি দূরে থাকি বলে মা ভারি দুঃখ করেন। কিন্তু কি করি বলুন কর্ত্তব্যের খাতিরে তাঁকে এটুকু মনকষ্ট না দিয়ে উপায় নাই।... এই বলিয়া সে যেন একটি বেদনার নিশ্বাস ফেলিল। অরুন মনে করিল—সত্যই যতীন বাবু অত্যন্ত মাতৃভক্তি পরায়ণ, শুধু নেহাৎ কার্য্যের প্রেরণাতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইতেছে এবং তাহার জন্য বুঝি মনকষ্টের তাহার শেষ নাই।

যতীন কহিল—এইবার কাজের কথা হোক। আপনি মনিমালিনীর কাছে গিয়েছিলেন শুনলাম। আরও শুনে খুসী হলাম তার মনকে আপনি অনেক টলাতে পেরেছেন। আপনার ক্ষমতা আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল না বলেই তো আপনাকে পাঠানোর জন্য আমার এমন চেষ্টা।

অরুণ বুঝিল যতীন কোথা হইতে ভুল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে—এ প্রশংসা যে তাহার প্রাপ্য নয় ইহাই জানাইবার জন্য হাসিতে হাসিতে কহিল আপনি ঠিক সংবাদ পান নি দেখছি। আমি তার বাড়ী গিয়েছিলুম বটে কিন্তু তার দৃঢ়সংকল্পের একবিন্দুও টলাতে পারিনি তার স্বামীর ঘরে ফিরিবার একটুও ইচ্ছা নয়। আমার যুক্তি তর্ককে তার মনগড়া মতবাদ দিয়ে খণ্ডন করে তার মনের অকপট ইচ্ছাই আমাকে খুলে বলেছে। সে একটুও গোপন করেনি।

যতীন অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিল—বলেন কি, আমি কি তাহলে ভুল শুনলাম? না তা কথনই হতে পারে না।

অরুণ বিরক্তি অনুভব করিয়া কহিল—আমি নিজে সেখানে গিয়েছিলুম, সুতরাং আমার চেয়ে আর কারও তো ভাল জানবার কথা নয় যতীনবাবু।

যতীনের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিল—অরুণবাবু মেয়ে মানুষের মন বোঝা অতি কঠিন ব্যাপার ওটা অত সহজে বিচার করা চলে না। আপনি কি করে বুঝলেন তার মনের কথাই সে গোপন করেনি? আপনাকে যা বলেছে সেইটাই তার ছলনা নয়? দেখুন নানা কাজে অনেক রকম মেয়ে মানুষের সাথে মিশতে হয়েছে সুতরাং ওদের মনস্তত্ত্ব কতকটা বুঝতে পারি। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি ওদের কথাকে অত সোজা ভাবে ধরবেন না।

অরুণ কহিল—মণিমালিনীর কথাবার্ত্তার মধ্যে কোনও কপটতা ছিল এ আমি জোর করেই বলছি। আপনি মিছে আশা করবেন না আমি সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হয়েই এসেছি।

পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া অরুণের হাতে দিয়া যতীন কহিল—তাহলে এটাকে কি আপনি অবিশ্বাস করতে বলেন?

দেবেন। জ্যেঠামশায় আর আমার ভার বইতে পারছেন না। যাক্, তা'হলে চল্লাম। রীতিমত চিঠি লিখতে যেন ভুলো না।

বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া সমীর বাহির হইয়া গেল, পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া হাসিমুখে কহিল—একটা কথা বল্‌ছি, রাগ করো না।

অরুণ কৌতুহলী হইয়া বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল। সমীর বলিল—যতীনবাবু আজকাল বড্ড আসা আরম্ভ করেছেন এখানে। তার সঙ্গে যত কম মেশা যায় ততই ভাল।

অরুণ বিরক্ত হইয়া কহিল—আমাকে তো নেহাৎ ছেলে মানুষ পাওনি—বুদ্ধিসুদ্ধি আমারও আছে।

সহাস্যে সমীর কহিল — অনেক সময় সাদা চোখে লোক চেনা যায় না। সে লোক ভাল নয় — এই কথাই তোমাকে বলে গেলুম। তাকে বিশেষ আমল দিও না। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন রাত্রে শয়ন করিয়া সহসা অরুণের ঘুম আসিল না। মণি-মালিণীর কথা, সমীরের নিকট তাহার সত্য গোপন, সমীরের যতীন মুখুজ্যে সম্বন্ধে সতর্কতা—এই সমস্তই তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমীরের নিকট সে এ পর্য্যন্ত কোনও কথাই গোপন করে নাই — এই তাহার প্রথম। কিন্তু সত্যকথা বলিতে বাধিল কেন—তাহার মনে তো কোনও পাপ নাই। তাহার জননীর নিকট কি সমস্ত কথা অকপটে খুলিয়া বলিতে পারিবে? ছিঃ, ছিঃ, কি করিয়া সে মুখে আনিবে এক থিয়েটারের অভিনেত্রীর বাড়ী গিয়া তাহার সহিত কথা বলিয়া আসিয়াছে। এইবার তাহার যতীনের উপর অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। সেই তো এই কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। চুলোয় যাক, তাহার যুবক সমিতির সভ্য হওয়া—যাহার

জন্ম আপনার লোকের কাছে সত্য কথা বলিতে বাধে—তেমন কাজ আর সে করিবে না।

পরক্ষণেই তাহার মণিমালিণীর কথা মনে হইল। সে তো তাহার সহিত কোনও অশুচি ব্যবহার করে নাই। না—ইহা তাহারই মনের দুর্ব্বলতা। সে কর্ত্তব্য করিয়া আসিয়াছে মাত্র—ইহাতে অপরাধ কি তাহার। এই দুর্ব্বলতাটুকু ঝাড়িয়া ফেলিতেই হইবে। একটি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে মনে করিয়া সে এইবার আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল এবং অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

অরুণ বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সম্মুখে মণিমালিনীর খোলা চিঠি পড়িয়া আছে অরুণ সেইখানা তুলিয়া আর একবার পড়িল। কি সুন্দর তাহার হস্তাক্ষর, যেন শুভ্র কাগজের উপর সুবিন্যস্ত ভাবে মুক্তা সাজাইয়া রাখিয়াছে। আর লেখার ভাবটুকুও কেমন সংযত—কোনও বাহুল্য তাহার মধ্যে নাই। নিশ্চয়ই সে সুশিক্ষিতা।

পরক্ষণেই তাহার মনে হইল সে যাহাই হউক, তবু সে থিয়েটারের অভিনেত্রী, অসচ্চরিত্রা গণিকা। তাহার সহিত অরুণের মেলামেশা অত্যন্ত গর্হিত হইবে। এই যে চিঠি লিখিয়া তাহার সহিত আত্মীয়তা করিবার প্রয়াস ইহাতেই যে ছলনা নাই তাহা কে বলিবে? যতীনের কি ইহার মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্র আছে? সমীরের সতর্কতা তাহার মনে পড়িল যতীনের প্রতি তাহার দৃঢ় অবিশ্বাস। কে জানে, যে তলে তলে কি চাল চালিতেছে।

তাহার মন ধীরে ধীরে যতীনের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতেই পুনরায় অজ্ঞাতসারে বিপরীত ভাব খেলিয়া গেল। না, সে মিথ্যা সন্দেহ করিতেছে। ইহাতে যতীনের কি স্বার্থ রহিয়াছে যে তাহার সহিত ছলনা করিবে? এমনি দুই বিরুদ্ধ ভাবের দ্বন্দ্ব লইয়া তাহার সময় কাটিতে লাগিল। তাহার মন কোনও মীমাংসা করিতে পারিল না। সে মণিমালিনীর চিঠিখানি সযত্নে রাখিয়া দিল অথচ তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে না ইহাও মনে মনে সঙ্কল্প করিল।

কিন্তু পরদিন যখন যতীন মুখুজ্যে আসিয়া তাহাকে প্রস্তুত হইতে বলিল সে কি জানি কেন না বলিতে পারিল না। সে বিনা বাক্যব্যয়ে থিয়েটারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যতীন মনে মনে হাসিতে লাগিল।

প্রতুল গাঙ্গুলী বোধ করি অপেক্ষাই করিতেছিল—তাহারা আসিতেই সে অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া দোতালার বক্সে বসাইয়া দিল।

অরুণকে সম্বোধন করিয়া কহিল—আপনি এসেছেন দেখে আমি খুবই সুখী হয়েছি। আপনার পরিচয় পেতে আমার বাকি নাই। যতীন বাবুর মুখেই সব শুনেছি। আর আপনাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছে। এতে আমারও সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে জানবেন।

অরুণ লোকটির কথা বার্ত্তা এবং উদারতা দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

যথাসময়ে প্লে আরম্ভ হইল। চন্দ্রশেখর প্লে হইতেছিল—মণিমালিনী দলনী বেগমের ভূমিকায় নামিবে। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইয়া ড্রপ পড়িলে প্রতুল গাঙ্গুলী অরুণকে কহিল—একবার ভেতরে যাবেন? মণি আপনাকে ডাক্‌ছে।

অরুণ মৃদু হাসিয়া কহিল—এখনই?

—তাতে দোষ কি। গ্রীণরুমটাও অমনি দেখা হবে।

অরুণ উঠিয়া যতীনকে কহিল—আপনি যাবেন না?

যতীন সহাস্যে কহিল—আমার তো ও কাজ নয় অরুণবাবু!

অরুণ আর কিছু না বলিয়া প্রতুলবাবুর পশ্চাৎ নীচে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ছোট্ট একটি কক্ষ দেখাইয়া প্রতুল কহিল—এটিই মণিমালিনীর ড্রেসিং রুম। অপনি ভিতরে যান। আমি পরে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

অরুণ কক্ষে প্রবেশ করিতেই মণিমালিনী কলহাস্যে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল—আমার কি ভাগ্যি অরুণ বাবু। আপনি যে আসবেন এ কল্পনাও করতে পারিনি। বসুন।

অরুণ চাহিয়া দেখিল—বেগমের পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা মণিমালিনী ঠিক যেন রাজ-রাজেশ্বরীর মূর্ত্তিতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া। কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত। তাহার চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। নারীর এত রূপ থাকিতে পারে ইহা সে কোনও দিন কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই।

অরুণ বিস্মিত হইয়া চিঠিখানি হাতে লইয়া পড়িতে লাগিল। মেয়েলী অক্ষরে অতি পরিচ্ছন্ন ভাবে চিঠিখানি লেখা,—অরুণবাবু, আপনি চলিয়া যাইবার পর আপনার কথাগুলিই মনে বাজিতেছে। তখন যাহা বলিয়াছিলাম হয়তো তাহা তর্ক করিবার ঝোঁকেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে আপনার সহিত কিছুক্ষণ আলোচনা হইলে হয়তো আমার মনের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া যাইবে। আশা করি আর একবার পায়ের ধুলা দিবেন। কাল রবিবার আমাদের প্লে আছে। যদি দয়া করিয়া থিয়েটার দেখিতে আসেন তাহা হইলে অত্যন্ত সুখী হইব। সেখানে আমার সহিত দেখা হইতে পারে। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। প্রণতা—মণিমালিনী।

চিঠিখানি পড়িয়া অরুণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল—এ চিঠি আপনি পেলেন কোথায়? আমার নামই বা জানলো কি করে? আমি তো কিছুই প্রকাশ করিনি।

যতীন মাথা দুলাইয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিল—অরুণবাবু, আপনি কি মনে করেন আমি এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত আছি? বাড়ী থেকে ফিরেই লিলি থিয়েটারের ম্যানেজার প্রতুলবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁকে সব কথাই খুলে বলেছি। তিনি হেসে বললেন আপনাদের সমিতির একজন সভ্য সেদিন মণিমালিনীর বাড়ী গিয়েছিলেন যে। তিনি তো তার মনটা একেবারে বিগড়ে দিয়ে এসেছেন। তাঁর কথা শুনেই বুঝলাম এ আপনি ছাড়া আর কেউ নয়। এই সূত্রে আপনার নাম ও পরিচয়ও তারা পেয়েছে। সেখানে মনিমালিনীর সাথে আমার দেখা হয়। এ চিঠি তারই হাতের লেখা।.........এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অরুণ কি জানি কেন আনন্দ অনুভব করিয়া কহিল—প্রতুলবাবু কি বললেন? আপনারা তাদের অভিনেত্রী ভাঙ্গিয়ে নিতে চান এ তো তাঁদের পক্ষে সুখের কথা নয়।

—নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু প্রতুলবাবু অত্যন্ত অমায়িক লোক। তিনি বলেন মণিমালিনী বাংলা ষ্টেজে এমন একটা স্থান অধিকার করেছে যে সে চলে গেলে একটা বিশেষ ক্ষতি হয়ে যাবে—হয়তো এ ক্ষতিপূরণ শীগ্‌গীর হবে না। কিন্তু তবু যদি সে ফিরতে চায় আমি বাধা দেব না। তাহলে কাল থিয়েটারে যাচ্ছেন তো? নিশ্চয়ই আপনার কোনও আপত্তি নাই?

অরুণ কি যেন একটু ভাবিল, কহিল এসব কিন্তু আমার কাছে কেমন ভাল লাগছে না। হাজারই হোক, আজন্ম সংস্কার ছাড়তে বাধে। এদের সাথে মিশতে আমার ইচ্ছে হয় না। আর আপনিও যখন চেষ্টা করছেন আমার এতে হাত দেওয়া আবশ্যক দেখছি না।

যতীন বাবু হাসিতে হাসিতে কহিল—এ যেন আপনার অভিমানের কথা হলো। আমার এমন কোনও গুণ নাই যে মণিমালিনীর মত সুদক্ষ অভিনেত্রীর মন বিচলিত করতে পারি। আমাদের সমিতির মধ্যে এক আপনি ছাড়া এমন দ্বিতীয় লোক নাই যাকে এ কাজের ভার দেওয়া যায়।···কথাগুলি যতীন বিশেষ জোর দিয়া বলিল, অরুণ ইহার কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

যতীন অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—আপনার মত রূপ আর শিক্ষা যদি আমার থাকতো, তাহলে আপনাকে এর মধ্যে টানতে চাইতাম না। কিন্তু ভগবান সেদিক দিয়ে আমাকে মেরে রেখেছেন যে। তাহলে আপনার কোনও আপত্তি নাই তো? প্রতুল বাবু বক্সের পাশ দিয়েছেন চলুন না, যাওয়াই যাক।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি। এই বলিয়া অরুণ চুপ করিয়া রহিল।

—তা ভাবুন।—কাল বিকেল নাগাদ আসছি।·····এই বলিয়া যতীন হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ উঠিতেই মণিমালিনী কহিল—তাহলে কাল যাচ্ছেন তো ?

অরুণ বলিল—দেখি সময় হয় তো যাব।

সহসা অরুণের হাত নিজের হাতের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে মণিমালিনী কহিল—না ও কথা নয়। বলুন যাবেন ?

রমনীর কোমল স্পর্শে অরুণের বুকের ভিতর দুরদুর করিয়া উঠিল। কোনও রকমে মুখে হাসির ভাব ফুটাইয়া কহিল—আচ্ছা কথা দিলুম।

ধন্যবাদ। নমস্কার।···সে তাহার শুভ্র করদুটি একত্রিত করিয়া কপালে স্পর্শ করিল।

নমস্কার।···প্রতুলের সহিত অরুণ বাহিরে আসিয়া নিজের আসনে বসিল। প্লে আরম্ভ হইয়াছে। যতীন তাহাকে কোনও প্রশ্ন করিল না। সে যেন অতি মনোযোগের সহিত অভিনয় দেখিতেছে। অরুণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

সেদিন থিয়েটার হইতে ফিরিয়া অরুণের কেবলই মনে হইতে লাগিল—তাহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। তাহার এই বাইস বছরের জীবনে এমন ভুল আর কোনও দিন হয় নাই। নিজের চরিত্রের প্রতি তাহার সজাগ প্রহরীর দৃষ্টি, তাহাতে কোনও স্থলে এতটুকু ছিদ্র এপর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। তবে মণিমালিনীর উদ্ধারকে আশ্রয় করিয়া কি শেষে সে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিবে? নারীর রূপের যে একটা তীব্র মাদকতা রহিয়াছে—এ পর্য্যন্ত তাহা তাহার চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় নাই। কিন্তু ঐ সুনিপুণা অভিনেত্রী সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্রীভূত করিয়া যখন তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল—তখন তাহার বুকের মধ্যে যে রক্তের দ্রুত নাচন আরম্ভ হইয়াছিল—এখনও কি তাহা সম্পূর্ণ থামিয়াছে? যখন আদি মানব তাহার প্রথম জীবন সঙ্গিনীকে দেখিতে পাইয়াছিল—তখনও হয় তো ঠিক এমনি ভাবেই তাহার বুকের রক্ত দুলিয়া উঠিয়াছিল। এই উন্মাদনা, এই বুকের দপদপানি, শিরায় শিরায় তড়িৎ প্রবাহ, রক্তের নাচন—ইহা অরুণের নিকট কি এক অজ্ঞাত দেশের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। সে বুদ্ধিমান বয়স্থ যুবক—অনভ্যস্ত হইলেও ইহার অর্থ বুঝিতে সে ভুল করিল না। সে নিজের মনকে কঠিন ভাবে পীড়ন করিয়া বলিতে লাগিল—খুব হইয়াছে; উচিত শিক্ষা পাইয়াছি, আমার গর্ব্ব ভাঙ্গিয়াছে। আর নয়—এখানেই ইহার পরিসমাপ্তি হউক।

তাহার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, দোদুল্যমান মুক্তার মালা, অবগুণ্ঠনমুক্ত মস্তক, চোখের বিদ্যুৎ, মুখের হাসি—সমস্ত মিলিয়া যেন এক অপরূপ মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছে। অতি সাবধানী, আজীবন সচ্চরিত্র অরুণের মাথা ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। তাহার বুকের মধ্যে তরুণ রক্ত দ্রুততালে নাচিতে লাগিল। সে বিহ্বল হইয়া তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মণিমালিনী মৃদু হাসিয়া কহিল—কি দেখছেন? বসুন।

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া অরুণ চেয়ারে বসিয়া কহিল—আমাকে আপনি ডেকেছিলেন?

মধুর হাসি হাসিয়া মণি কহিল—হ্যাঁ, সেদিন আপনার সাথে তর্ক করে অবধি আমার মন ভারী খারাপ হয়ে আছে। আপনার কাছে যদি কোনও অপরাধ করে থাকি—ক্ষমা করবেন।

অরুণ ব্যস্ত হইয়া কহিল—অমন করে আপনি বলবেন না—সত্যি আপনার উপর আমার কোনও রাগ নাই। আর রাগ করতেই বা যাব কেন? বরং আপনার স্পষ্ট কথায় আমি খুসীই হয়েছিলাম।

মণিমালিনী কহিল—আপনি চলে যাবার পর আমি অনেকক্ষণ ধরে নিজের মনে আপনার কথাগুলোই ভেবে দেখছিলাম। হয় তো বা এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আর কিছুক্ষণ আলোচনা হলে আমার মনের দ্বন্দ্ব ঘুচে যেতো। কিন্তু সেদিন যে তাড়াতাড়ি চলে এলেন!·····এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল।

সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল—দেখুন আমরা কারও কাছ থেকেই তেমন সহানুভূতি পাইনে। তাই যদি সত্যই এটুকু কেউ দেখায় আমাদের বড় ভাল লাগে। আপনি সেদিন আমার উপর রাগ করেছিলেন কি না জানিনে তবু আপনার কথার মধ্যে সহানুভূতির আভাস পেয়েছিলুম। তাতেই আমি ধন্য হয়েছি। সত্যি আপনার মত লোক আমি দেখিনি।·····এই

বলিয়া সে একবার বিলোল কটাক্ষে অরুণের দিকে চাহিল। অরুণ কি বলিবে বুঝিতে না পারিয়া মাথা নীচু করিল।

মণিমালিনী মৃদু হাসিয়া কহিলেন আপনি সেদিন বলেছিলেন আর আমার সাথে দেখা হবে না। কিন্তু আমি জানতুম নিশ্চয় দেখা হবে। আমার অন্তরাত্মা বলে দিয়েছিলেন একথা—সে কি মিথ্যে হয়! কি বলেন?

তাহার এই কথায় অরুণের গায়ে যেন চাবুক পড়িল। সে গম্ভীর স্বরে কহিল—সত্যি দেখা আর হ'তো না। তবে যখন জানতে পারলাম আপনি স্বামীর ঘরে ফিরতে পারেন তখনই আবার দেখা করা অন্যায় মনে হয় নি। আমার মধ্যে অন্য কোনও কারণ নাই।

খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে মণিমালিনী কহিল—আপনি আবার রাগ করছেন দেখছি।

লজ্জিত হইয়া অরুণ কহিল - না রাগ করিনি।

মণিমালিনী কহিল—আমার অনেক কথা জানবার আছে একথা মিথ্যে নয়। আপনার যদি সময় হয় আর একবার আমার বাড়ীতে দয়া করে পদার্পন করবেন। আমি কৃতকৃতার্থ হবো।

অরুণ একটু কিন্তু কিন্তু করিয়া বলিল—বোধ হয় আর সময় হবে না। পরশু আমি বাড়ী যাচ্ছি।

—পরশু? তাহলে কালই একবার দয়া করে পায়ের ধুলো দিন না অরুণ বাবু। আপনার মনের ভাব কি আর বুঝতে পারছিনে আমি! আমাদের সাথে বেশী সংশ্রব রাখতে আপনার ইচ্ছে নাই। তবু যে কাজে আপনারা হাত দিয়েছেন তাতে সম্বন্ধ তো রাখতেই হবে। আমাদের জীবনকে বোঝবার চেষ্টা করাও কি আপনাদের উচিত নয়?

ড্রপ উঠিবার সময় হইয়াছিল। প্রতুল বাবু আসিয়া কহিল এইবার চলুন অরুণবাবু।

সে আর কলিকাতায় অপেক্ষা করিল না—পরাদনহ বাড়ী রওনা হইল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। হয়তো আজ অপেক্ষা করিলেই মণিমালিনীর বাড়ী যাইতে হইত। আবার কোন ছলনায় যে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিত—কে জানে?

বাড়ী পৌঁছিলে মনমোহিনী বলিলেন—একদিন আগেই এলি যে অরুণ?

অরুণ কহিল—কলকাতা বড্ড একঘেয়ে লাগছিল—তাই আগেই চলে এলুম।

জননীর স্নেহ আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া অরুণের মনের গ্লানি সমস্ত জুড়াইয়া গেল। সে ভাবিল—আর কোনও রকমে একটি বছর কাটিয়া গেলে হয়—তাহা হইলে দেশের ছেলে দেশে ফিরিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

সেদিন অরুণকে গৌরীর বাপ-মা আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। কিন্তু যে ভাবে এই ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হইল—তাহাতে অরুণের কিছু বিস্ময় বোধ হইল।

গৌরীর পিতা বলিলেন—তোমার পরীক্ষার আর কত দেরী বাবা?

অরুণ কহিল—প্রায় একবছর। ও তো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

—এবার তোমার পরীক্ষার ফল খুবই ভাল হবে আশা করি।

অরুণ সহাস্যে কহিল—চেষ্টার তো কোনও ত্রুটি করবো না। এখন আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

সেদিন গৌরীও আসিয়া অরুণকে প্রণাম করিল। এবার আসিয়া অবধি সে তাহাকে দেখে নাই। সুসজ্জিতা কিশোরী বালিকার দিকে চাহিয়া অরুণ বিস্মিত হইয়া গেল—এই বার মাসের মধ্যে কি অদ্ভুত তাহার পরিবর্ত্তন। আর সে চপলমতি বালিকা নয়—যৌবনের প্রথম

সীমায় পৌছিয়া রূপের যেন তাহার আর অবধি নাই। তাহার উজ্জল গৌর দেহের বর্ণ, চোখের লজ্জাভারাবনত চাহনি, গণ্ডের রক্তিমাভা, দেহের নিটোল গড়ন, ঈষৎ উন্নত বক্ষ—সমস্তই যেন অপরূপ লাবণ্য মণ্ডিত হইয়া দেখা দিয়াছে। অরুণ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল—কিছুক্ষণ তাহার যেন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। গৌরী প্রণাম করিয়া আনত মস্তকে নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিল।

অরুণ এইবার হাসিয়া কহিল—ও ভারী লজ্জা দেখতে পাই যে! কেমন আছিস্ গৌরী?

গৌরী মৃদুস্বরে কহিল—ভাল আছি।...অরুণ আর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। গৌরী কাপড়ের কোণটি অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে কহিল—তুমি ভাল আছ তো?

অরুণ কহিল—তবু ভাল যে তত্ত্বটা নিলি। কিন্তু তোর হঠাৎ এত লজ্জা হলো কেনরে?

—জানিনে যাও।...এই বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরক্ষণেই মনমোহিনী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অরুণ কহিল—আজ এত আশীর্ব্বাদ আর প্রণামের ঘটা দেখছি কেন মা?

মনমোহিনী বলিলেন—আজ দিনটা ভাল ছিল। চক্কোত্তি মশায় ছাড়লেন না। আমিও কিছুদিন আগে গৌরীকে আশীর্ব্বাদ করে এসেছি কিনা।

অরুণের এবার কারণ বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না, কহিল—এত তাড়া তোমাদের কিসের লেগে গেল মা? এখনই কি ওসব কাজ শেষ করে ফেলতে চাও?

মনমোহিনী হাসিলেন, কহিলেন—আমার তো কিছুমাত্র তাড়া ছিল না

অরুণ। কিন্তু যাঁদের মেয়ে তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকেন কি করে? গৌরী যে দিব্যি বড় হয়ে উঠেছে। ওঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁদের নিশ্চিন্ত করিতে আশীর্ব্বাদটা শেষ করে রাখতে হয়েছে। তবে শুভকার্য্যের এখনও দেরী আছে। তোর পরীক্ষা হয়ে গেলে তারপর দিনস্থির হবে।

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। মনমোহিনী পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের কথাগুলি পড়িয়া ফেলিতে চাহিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন—তোর তো এ বিয়েতে অমত নেই অরুণ?

অতি বিস্ময়ে অরুণ জননীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার যেখানে মত আমার সেখানে অমত হবে এ কি তুমি ভাবতে পার না?

প্রসন্ন হাসিতে জননীর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সস্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন—শুধু সেই জোরেই তো আমি আগে থেকেই কথা দিয়ে ফেলেছি বাবা।

ইহার পর কি এক আনন্দের শিহরণে অরুণের সমস্ত দেহ প্লাবিত হইতে লাগিল। যৌবন যখন নর দেহে বিপ্লব বাধাইবার জন্য ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করে—তখন তাহাকে শান্ত করিতে নারীদেহধারী জীবনসঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়। যখন যুবক রক্ত বুকের ভিতর ছলছল করিয়া তাণ্ডব নৃত্যের সূচনা করে—তখন সেই তাল সংযত করিতে আর একটি হৃদয়ের প্রয়োজন। ইহাই মানব ধর্ম্ম, নর-নারীর ইতিহাস। এই নিগূঢ় সত্য হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। অরুণ বুঝিল তাহারও সময় আসিয়াছে। এখন একাকী নিজেকে লইয়া আর চলে না। আর একজনকে তাহার একান্ত প্রয়োজন—যাহাকে তাহার সমস্ত মন, সমস্ত দেহ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা আয়ত্ব করিতে পারিবে। যাহার ভালবাসায়, প্রেমে, প্রণয়ে, শ্রদ্ধায় সে সর্ব্বদা আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া থাকিবে। সে

ভাবিয়া দেখিল গৌরী সম্পূর্ণভাবে তাহারই উপযুক্ত। শিশুকাল হইতে যে তাহাকে দেখিয়াছে, স্নেহ করিয়াছে। আজ সেই স্নেহ প্রেমে পরিণত করিতে তাহার এতটুকু বাধিল না, এতটুকু বিলম্ব হইল না। হয় তো সে মনের মধ্যে গৌরীকে জীবন সঙ্গিনী করিবার বাসনাই চিরকাল পোষণ করিয়া আসিতেছে—নইলে কেন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ইহাতে সায় দিবে। গৌরী—সেই বালিকা—আজ সৌন্দর্য্যের প্রতিমা। এই সৌন্দর্য্য ভগবান তাহারই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ভাবিতেও তাহার পুরুষ-মন হর্ষে বিলিলিত হইতে লাগিল।

অরুণ বাড়ী আসিবার কয়েকদিন পর একখানি এন্‌ভেলাপে চিঠি পাইল। হস্তাক্ষর দেখিয়া সে বিচলিত হইয়া উঠিল—এ যে মণিমালিনীর লেখা, ঠিক তেম্‌নি মুক্তার মত সাজানো অক্ষরগুলি। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার ক্রোধে সমস্ত দেহে যেন আগুন ধরিয়া গেল। দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিয়া কহিল—উঃ, কি বজ্জাতি বুদ্ধি। একটা অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের মনের কথা এখনও কি বুঝিতে আমার বাকি আছে! কেন, আমার সঙ্গে তার এই আত্মীয়তার চেষ্টা? এ সমস্তই যতীনের কারসাজি, সেই আমার ঠিকানা প্রকাশ করিয়াছে! এখন হাতের কাছে তাহাকে পাইলে চাবুকের ঘায়ে পিঠের চামড়া তুলিয়া দিতাম। বর্ব্বর, জোচ্চোর, বদমায়েস্!

সে চিঠিখানি খুলিয়া না পড়িয়া খামশুদ্ধ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া মেঝেতে ফেলিয়া আগুন ধরাইয়া দিল। কাগজগুলা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া অবিলম্বে ভস্মে পরিণত হইয়া গেল।

মনমোহিনী সেই সময় কি কাজের জন্য পুত্রের নিকট আসিলেন। ঘরের ভিতর কাগজ পোড়া ছাই দেখিয়া বলিলেন—ও কি পোড়ালি অরুণ?

অরুণ ইতস্তত: করিয়া কহিল—ও একটা বাজে কাগজ মা। হাতের কাছে দেশলাই ছিল আগুণ ধরিয়ে মজা দেখলুম।

মনমোহিনী হাসিয়া কহিলেন—তোর ছেলেমানুষি এখনও গেলনা দেখছি।

অরুণ হাসিতে লাগিল। একবার ভাবিল সব কথা প্রকাশ করিয়া বলে—কিন্তু যে বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিল না।

গোবর্দ্ধনপুরের বাড়ুজ্যেরাই বনিয়াদী বংশ। রামকমল বাড়ুজ্যে এই বংশের কর্ত্তা এবং ইনিই সমীরের জ্যেঠামহাশয়। শ'চার পাঁচ বিঘা জমি, হাজার তিনেক টাকার ক্ষুদ্র জমিদারী—ইহাই এই পরিবারের সম্পত্তি। রামকমল বাবু সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন এবং ইহার ফলে তিনি প্রায় সমস্তই আত্মসাৎ করিতেন। রামকমলের পরিবারটি নেহাৎ ক্ষুদ্র নয়—কিন্তু ঠিক অর্দ্ধেক অংশের মালিক সমীরের আর কেহ ছিল না। একান্নবর্ত্তী পরিবার হিসাবে সমীরের কোনও পৃথক পাওনা নাই—এমন কি রামকমল ভ্রাতুস্পুত্রের জন্য মাসিক চল্লিশটাকা দিতেও অনেক সময় অসুবিধা ভোগ করিতেন। তাঁহার কৈফিয়েতরও অন্ত ছিল না। এ বৎসর অতি বৃষ্টিতে ধান হাজিয়া গেল, পর বৎসর অতি রৌদ্রে মাঠের ধান মাঠেই শুকাইয়া গেল, প্রজারা জোট করিয়া খাজনা বন্ধ করিল—এমনি একটা না একটা অজুহাত দেখাইয়া সমীরকে টাকা পাঠাইতে কার্পণ্য করিতেন। চল্লিশটি টাকা মাসে মাসে গুণিয়া দিবার সাধ্যও যেন তাঁহার নাই! কিন্তু কি করেন নিজের সহোদরের একমাত্র সন্তান—তাহার ভার না বহিয়া যে উপায় নাই!

সমীরের জ্ঞান হওয়া অবধি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু তবু সে বিধিমতে জ্যেঠামশায়ের মনস্তুষ্টি সাধনের প্রয়াস করিত। কিন্তু ধূর্ত্ত রামকমল সমীরকে অত্যন্ত বিষচক্ষে দেখিতেন—অথচ মুখে এমন ভাব দেখাইতেন যেন তাঁহার মত জ্যেঠামহাশয় আর কেহ কোনও দিন পায় নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার রাগ হইত—সমীরের উদারতা দেখিয়া। গ্রামে আসিলেই যত দীন দুঃখী লইয়া তাহার কারবার। সে গ্রামের ছেলে-দের লইয়া মাতিয়া থাকে, কেহ কখন ও বিপদে পড়িলে তাহার ক্ষুদ্র দল লইয়া সাহায্য করে, নীচজাতির ছেলেদের লইয়া পড়ায়। এই সব তিনি অত্যন্ত কুলক্ষণ বলিয়া মনে করিতেন এবং অনেক সময় সমীরের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন।—সমীর বিশেষ কিছু বলিত না—অথচ এসব কাজও পরিত্যাগ করিত না।

রামকমল দেখিলেন—ক্রমশঃ ভ্রাতুষ্পুত্রের গ্রামে আগমন ঘন ঘন হইতেছে। পূর্ব্বে সে ছুটির মধ্যেও দেশে আসিত না, কিন্তু কিছুদিন হইল ছুটি হইতে না হইতেই চলিয়া আসে এমন কি ছুটি ফুরাইলেও যাইতে চায় না। রামকমল কিছুদিন হইতেই মনে করিতেছিলেন—সমীরকে পৃথক করিয়া দিবেন। কারণ এখনও হয়তো সে সম্পূর্ণভাবে সংসারে অভিজ্ঞ হইয়া উঠে নাই। উহাকে ভুলাইয়া সম্পত্তির বখরা অর্দ্ধাংশের পরিবর্ত্তে কিছু বেশী পরিমাণেই লওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু সে যেমন ক্রমশঃ সেয়ানা হইয়া উঠিতেছে—আরও কিছুদিন পরে হয়তো চুল চিরিয়া কাণা কড়ি পর্য্যন্ত ভাগ করিয়া লইবে, এক কপর্দ্দকও ছাড়িবে না। তিনি সুযোগ খুঁজিতেছিলেন —এইবার তাহা পাইলেন।

সমীরের স্কুল যথাসময়ে স্থাপিত হইয়া গেল। কিন্তু টাকার এখনও বড্ড টানাটানি। অন্ততঃ শ'পাঁচেক টাকার একান্ত প্রয়োজন। স্কুলের আসবাব, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, আলমারি, বই এখনও বিশেষ কিছু সংগ্রহ হয় নাই—এ সব অবিলম্বে না আনিলে চলিবে না। সমীরের ইচ্ছা ছিল সে নিজে শ' পাঁচেক টাকা দিবে এবং আর কিছু গ্রামের মধ্যে চাঁদা আদায় করিয়া তুলিবে। কিন্তু এতগুলি টাকা যে তাহার জ্যেঠামশায় বাহির করিবেন—ইহা তাহার মনে হইল না। সে বলি বলি করিয়াও কথাটা বলিতে পারিতেছিল না।

কিন্তু অবশেষে তাহাকে বলিতেই হইল। শুনিয়া রামকমল বাবু আকাশ হইতে পড়িলেন, কহিলেন—এতগুলো টাকা তোমার কি দরকার সমীর ?

সমীর কহিল—ইস্কুল করেছি, সে তো জানেন। তরই খরচ পত্র —।

রামকমলবাবু বলিলেন - ইস্কুল করেছ—খুবই ভাল কথা, কিন্তু তার খরচ পত্র যে আমাকেই বহন করতে হবে সে তো জানতাম না।

সমীর ব্যস্ত হইয়া কহিল—না, খরচ পত্র আপনাকে কিছু বহন করতে হবে না। শুধু পাঁচশত টাকা আপাততঃ চাঁদা—।

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রামকমল বাবু বলিতে লাগিলেন—তুমি আমাকে রাজা বাদসা কি যে মনে কর আমি তো বুঝে উঠতে পারিনে। বাড়ীতে তো আর টাকশাল করিনি যে তোমার ফরমাজ মত টাকা তৈরী করে দেব !

সমীর মনে মনে বিরক্তি অনুভব করিল, কিন্তু তবু শান্ত সুরেই কহিল—আমি যে কথা দিয়ে ফেলেছি জ্যেঠামশায় !

বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া রামকমল বাবু বলিতে লাগিলেন—সংসারে কথা দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না সমীর। আর এতে তোমার লজ্জাই বা কিসের ? কর্ত্তা আমি—তুমি বলবে জ্যেঠামশায় দিলেন না—আমি কি করি ! ব্যস্, এক কথায় এর মীমাংসা হয়ে গেল। হল না ? ··

সমীর সহসা উত্তর দিতে পারিল না।

রামকমলবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ, খাও দাও, দুটো বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর, আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু তার মধ্যে টাকার কথা আসে কেন ? কলকাতা সহরে থাক তাই নানারকম হুজুগ দেখে ঐ

এক রকম স্বভাব হয়েছে। কেন, কিসের স্কুল? কিসের গরীব দুঃখীকে শিক্ষা দেওয়া? ওসব নিছক সময় অপব্যয় করা ছাড়া আর কিছু নয়। আর তাতে দেশের ছোটলোক গুলোও বিগড়ে যাবে। আমাদের মান ইজ্জত, খাতির প্রতিপত্তি আর থাকবে না। ওসব হাঙ্গামা তো না করাই ভাল মনে হয়। তবে এখন তুমি লেখা পড়া শিখেছ, বড় হয়েছে—ভালমন্দ বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। টাকা চাইছ বলেই এত কথা বলা। নইলে আমার আর কি। মধুসূদন!…এই বলিয়া তিনি বোধ করি ভগবানকে ডাকিবার জন্যই চোখ দুটি মুদিত করিলেন।

জ্যেঠামহাশয়ের ভণ্ডামিতে সমীরের ক্রোধে আপাদ মস্তক জ্বলিতেছিল, তবু ধীরে ধীরে কহিল—কিন্তু টাকা আমার চাই-ই জ্যেঠামশায়।…তাহার কণ্ঠস্বরের ভিতর বিলক্ষণ ঝাঁঝ ছিল। রামকমলবাবু ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া কহিলেন—তোমার টাকা চাই, সেতো শুনেছি—কিন্তু আমার টাকা নাই—সে কি তুমি শুনতে পাওনি?

সমীর তবু শান্ত সুরেই কহিল—আপনার সাথে আমি তর্ক করতে আসিনি। কিন্তু টাকা আপনাকে দিতে হবে।

অসহ্য ক্রোধে চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া রামকমলবাবু বলিলেন—দিতেই হবে—তার মানে?

—তার মানে যে আপনি বুঝতে না পেরেছেন আমি তা মনে করি না। আপনার টাকা আমি চাইনে, টাকা চাচ্ছি আমার নিজের অংশের। আপনি আমাকে পৃথক করে দেবার অনেক দিন থেকেই চেষ্টা করেছেন, আমিই গরজ করিনি। কিন্তু আর নয়—এইবার ঘরবাড়ী, জোতজমা, জমিদারী—সমান ভাগে ভাগ করে দিন, আমার ভার আর আপনাকে বইতে হবে না।

রামকমলবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি—তিনি নিজকে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দিলেন না, কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন—এতো আমার পক্ষে অতি সুখের কথা। কৃষ্ণকমলের একমাত্র সন্তান তুমি—আমি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে নিজের ভাগ নিজে দেখে শুনে নেবে—এর চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি আছে! তাহলে কালই গ্রামের পাঁচ জনকে ডেকে—কি বল, দেরী যখন তুমি করতেই পারবে না বল্‌ছো।

সমীর কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, কালই একটা ব্যবস্থা করে দিন।

রামকমল বাবু বলিতে লাগিলেন—তবে একটা কথা আছে সমীর। এই যে সম্পত্তি এখন দেখতে পাচ্ছ, এর অনেকটা আমিই বাড়িয়ে গুছিয়ে করেছি। কৃষ্ণ বেঁচে থাক্‌তে এতটা ছিল না। অবশ্যি যখন একান্নবর্ত্তী পরিবার—তখন তুমি ইচ্ছে করলে, ঐ চুলচেরা ভাগই করে নিতে পার। তবু একটা বিবেচনা করে দেখ। আমার তো দেখতেই পাচ্ছ—বৃহৎ সংসার। তোমার—অবিশ্যি বলতে নেই, আপাততঃ কোনও ঝঞ্ঝাটই নেই।

সমীর বিরক্ত হইয়া কহিল—আপনাকে ঠকিয়ে আমি কিছুই নিতে চাইনে। ন্যায্য মত যা পাব—তাই দেবেন।

পরদিন গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোককে ডাকিয়া বাঁড়ুজ্যে পরিবারের অংশনামা লেখা হইয়া গেল। রামকমল বাবু প্রায় শ'খানেক বিঘা জমি তাঁহার স্ত্রীর নামে এই সম্পত্তির আয়ে বেনামী করিয়া কিনিয়াছিলেন—সেইটি একেবারে নিজস্বভাবে দাবী করিলেন। গ্রামের যাহারা মধ্যস্থ হইতে আসিয়াছিল—তাহারা আপত্তি করিল। কিন্তু সমীর কহিল—জ্যেঠামশায় যদি ঐ নিয়ে সুখী হন তো থাক্—ও দিয়ে আমার দরকার নাই। সকলে অবাক হইল কিন্তু যাহার সম্পত্তি সে নিজে যদি ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে অপরে কি করিবে? সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেল।

সমীরের অংশে দুশো বিঘা জমি, দেড় হাজার টাকার জমিদারী এবং বসত বাটির অর্দ্ধেক পড়িল। নগদ টাকা যাহা ছিল—তাহার বিশেষ কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। লোকে বলিল—বুড়োর কাছে অন্ততঃ কুড়ি হাজার টাকা মজুত আছে। সমীর মাত্র সাতশ' টাকা পাইল।

যথা সময়ে অংশনামা রেজেষ্ট্রী হইয়া গেল। নগদ যাহা পাইয়াছিল তাহাই দিয়া সমীর উৎসাহের সাথে স্কুলের কাজে লাগিল। এ দিকে ভ্রাতুস্পুত্রকে বিধিমতে ঠকাইতে পারিয়াছেন দেখিয়া রামকমল মনে মনে পুলকিত হইলেন। কিন্তু লোকের কাছে তিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন- ছেলেটাকে এতদিন ধরে মানুষ করলাম। যেই বড় হয়েছে, অমনি আলাদা হয়ে গেল। ভাইয়ের ছেলে কি আর আপন হয়। মধুসূদন !

গ্রামের এক প্রান্তে কোনও এক গৃহপ্রাঙ্গনে আসিয়া সমীর ডাকিল মাসীমা !

গৃহের অভ্যন্তর হইতে একজন রমণী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া হাসিমুখে কহিলেন—এসো বাবা, উপরে উঠে এস ।

সমীর দাওয়ার উপর উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তাড়াতাড়ি মাদুর বিছাইয়া দিয়া বলিলেন—বস। আমি ভাবছিলাম, শেষটায় সমীরও বুঝি মাসীর কথা ভুলে গেল ।

সমীর হাসিমুখে কহিল—ভারী হাঙ্গামায় পড়েছিলাম মাসী। জানইতো ইস্কুলটা নিয়ে পড়েছি। সেই ব্যাপার কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই জ্যেঠা-মশায়ের পৃথক করে দেওয়ার তাড়া পড়লো ।

দুঃখিতস্বরে তিনি কহিলেন—সে সবই শুনেছি বাবা। তাহলে, এবার সবই ভাগ হয়ে গেল ?

—তা হলো বৈকি মাসী! জ্যেঠামশায়কে অসুবিধায় রাখতে আর আমার ইচ্ছে হলো না। তিনি বোধ হয় এবার নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। কিন্তু মীরা গেল কোথায় ? তাকে দেখতে পাচ্ছিনে যে।

—পুকুর ঘাটে গা ধুতে গিয়েছে এসে পড়ল বলে। সেই তো অস্থির করে তুলেছে আমাকে। তুমি আসনি দেখে তার অভিমান কত! বলছিল সে আর কক্‌খনো তোমার সাথে কথা বলব না।

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই সিক্তবস্ত্রে একটি কিশোরী অদূরে

দেখা দিল। তিনি তাহাকে বলিলেন—চট্ করে কাপড় ছেড়ে আয় মা, দেখ কে এসেছে।

মীরার মুখের উপর দিয়া যেন আনন্দের আভা খেলিয়া গেল, তবু সে ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল—ও, এসেছেন তো আমি কি করবো? আমার কাজ আছে।

তাহার অভিমান দেখিয়া সমীর সহাস্যে কহিল—আর রাগ করতে হবে না মীরা! দেখে যা তোর জন্য কত রকমের বই এনেছি।

—তোমার বই তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও বাপু আমার দরকার নেই। এই বলিয়া সে দুম্ দুম্ করিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

সমীর কহিল—ভারী রেগে গেছে দেখ্ছি। মীরার মা কিছুই বলিলেন না—শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

একটু পরেই সমীর ডাকিল—মীরা, কাপড় ছাড়া হলো না রে? ঘরের ভিতর হইতে কোনও শব্দ আসিল না।

—তাহলে কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি।···তবু কোনও কথা নাই। তখন সমীর হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর যাইয়া দেখিল মীরা গুম হইয়া ঘরের কোনে বসিয়া আছে। সমীর নিকটে গিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল—রাগ করিস না পাগলী। সময় পাইনি বলেই তো আস্তে পারিনি। আয় আয়, বাইরে আয়। পড়াটড়া কতদূর কি করলি দেখি।

মীরা অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল—ওঃ খবর তো কত নেন! তার আবার কথা।···কিন্তু সে উঠিয়া আসিল।

ইহার পর বাহিরে গিয়া নানারকমের ইংরাজী বাংলা বই দেখিয়া মীরার মুখে পুনরায় হাসি ফুটিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া সমীরের সহিত তাহার গল্প জমিয়া উঠিল। মীরার জননী নিকটে বসিয়াই পুলকিত চিত্তে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

এই পরিবারের ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু বলিতেছি। মীরার পিতা তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী যখন মারা যায় তখন তাহার বয়স এক বৎসর মাত্র। মীরার জননী শ্যামাসুন্দরী তখন পূর্ণ যুবতী—তাঁহার রূপ গ্রামের মধ্যে একটি গল্পের বিষয় ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর এই নিরাশ্রয়া বিধবার প্রতি গ্রামের অনেকেরই কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল। নানা লোক নানা ভাবে তাহার গৃহে আনাগোনার চেষ্টা করিত। কিন্তু শ্যামাসুন্দরী শুধু চরিত্রের দৃঢ়তায় নানা প্রলোভন হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অপবাদ ঘুচিল না—লোকে নানা কথা কানাকানি করিয়া পরে প্রকাশ্যে প্রচার করিতে লাগিল। ইহার ফলে শ্যামাসুন্দরী শিশু কন্যাকে লইয়া একঘরে হইলেন। কিন্তু অভাব যাহার অল্প দৃঢ়তা যাহার প্রভূত তাহাকে শাসন করা অত সহজ নয়। সমাজ তাহার উদ্যত দণ্ড লইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল কিন্তু এই রমণীকে আঘাত করিতে পারিল না।

সমীরের বয়স হইবার পর সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল এবং সে সময়ে অসময়ে তাহার সাধ্যমত এই দুঃখী পরিবারকে সাহায্য করিত। তাহার জ্যেঠামহাশয় এই অস্পৃশ্য পরিবারের সহিত তাহার মেলামেশায় অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু সমীর তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। শাসনের গণ্ডীর বাহিরে যে জোর করিয়া থাকিতে চায়—তাহার সহিত পারিয়া উঠা কঠিন।

শিশুকাল হইতেই সমীর অত্যন্ত ভাবপ্রবণ এবং তাহার ভাবটুকুকে কার্য্যে পরিণত করিবার অদম্য বাসনা অনেকদিন হইতেই তাহার অন্তরের কোনে বাসা বাঁধিয়াছে। সে ঠিক করিয়াছিল মীরাকে মনের মত করিয়া শিক্ষা দিবে। সে এইজন্য বাড়ী আসিলেই প্রত্যহ মীরাকে পড়াইত। লেখাপড়ায় এই বালিকার উৎসাহ এবং তাহার অসাধারণ মেধা দেখিয়া সমীর বিস্মিত ও পুলকিত হইত। তাহার মনে হইতেছিল মীরা তাহার মনের ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিবে।

দুইজনে যখন গল্পে মাতিয়াছিল তখন শ্যামাসুন্দরী অনেক কথাই ভাবিতেছিলেন। কন্যা তাহার বড় হইয়াছে—হিন্দুর ঘরের মেয়ের এ বয়সে বিবাহের কথা ভাবিতে হয়। কিন্তু সমাজ তাহাকে একঘরে করিয়াছে—এতদিন যাহারা কিছুই করিতে পারে নাই, এখন সুযোগ বুঝিয়া তাহারা শোধ তুলিবে। তিনি অনেকবার কথা প্রসঙ্গে সমীরের নিকট মীরার বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন। কিন্তু সমীর ইহাতে অত্যন্ত রাগ করে, বলে—এখনই যদি বিয়ের জন্য তুমি পাগল হও মাসীমা, তাহলে আমাদের সাথে সকল সম্বন্ধ শেষ। কেন, বিয়ে না করে কি চলে না? তোমার কোনও ভাবনা নাই—আমার ওপর সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। আমি এমন ভাবে শিক্ষা দিয়ে তুলবো যে বিয়ের কথা ওর মনেও হবে না। আজ তাঁহার মনে হইতেছিল সমীর কি মীরাকে গ্রহণ করতে পারে না? তাহা হইলে যে তাহার সমস্ত ভাবনার অবসান হইয়া যায়।

কিছুক্ষণ পর শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার ইস্কুল কেমন চলছে বাবা?

সমীর কহিল—এখনও তো চলাচলি কিছু বুঝে ওঠা যাবে না। তবে যাদের আমরা ভদ্দর বলি তাদের বিশেষ কিছু সহানুভূতি পাচ্ছিনে।

—তাহলে কি এত পরিশ্রম এত অর্থব্যয় বৃথাই যাবে?

—তাই কি কখনও যায় মাসীমা? যাদের আমরা নীচ জাত বলে ঘৃণা করি—তেমনি লোকের বাড়ী গিয়ে তাদের ছেলেদের স্কুলে দেওয়ার জন্য সেধে বেড়াচ্ছি। তারা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করছে। যদি তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে পারি, তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হবে। ভদ্দরদের শত্রুতাতেও আমি ভয় করবো না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সমীর বলিতে লাগিল—ছেলে ছোকরাদের সাথে তবু পারা যায়। কিন্তু বুড়োদের নিয়ে যেন এক পাও এগোবার

উপায় নাই। আমার তো মনে হয় জ্যেঠামশায় এরই মধ্যে ইস্কুলটি ভেঙ্গে দেবার জন্ম রীতিমত লেগেছেন।

শ্যামাসুন্দরী শুধু একটু হাসিলেন কারণ সমীরের জ্যেঠামহাশয় লোকটি যে কিরূপ তাহা তাঁহার জানিতে বাকি ছিল না। সমীর বলিতে লাগিল—আমাকে কিন্তু তোমারও কিছু সাহায্য করতে হবে মাসীমা। মনে করেছি এখানে মেয়েদের একটা ইস্কুল করবো। মেয়েরা চরকায় সুতো কাটা, তাঁত বোনা, সেলাইয়ের কাজ আর তার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিখবে। তুমি কি এই ইস্কুলটির ভার নিতে পারবে না?

শ্যামাসুন্দরী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—কিন্তু কেউ কি আমার কাছে মেয়ে পাঠাবে রে সমীর?

উত্তেজিত হইয়া সমীর কহিল—কেন পাঠাবে না? আলবৎ পাঠাবে। তুমি শুধু একবার স্বীকার কর আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। আর বলতে কি এই কথা মনে করেছি বলেই তো মীরাকে অমন আগ্রহের সাথে পড়াই, উৎসাহ দিই, ওকে আর কিছু দূর শিখিয়ে নিলে আর আমার কোনও চিন্তা থাকবে না। কি বলিস মীরা?

মীরা মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

সমীর বলিতে লাগিল—আমার মাত্র তিন মাস ছুটি, এরই মধ্যে তোমার ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাও করে যাব। আমি যে ভাবে ছেলেদের গড়ে তুলতে চাচ্ছি তার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও শিখিয়ে না তুললে আমার সমস্ত উদ্দেশ্যই বিফল হয়ে যাবে। বামুন কায়েতের মেয়ে না পাও নীচু জাতের মেয়ে অনেক পাবে। তোমার তো ছোঁয়াছুঁয়িতে ভয় নেই মাসীমা?… এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

যাইবার জন্য সমীর উঠিলে, মীরা কহিল—কাল আসবে তো সমীর দাদা?

—নিশ্চয় আসবো। এ কয়মাস কেমন পড়েছিস কাল তার পরীক্ষা হবে।

মীরা হাসিয়া কহিল—যদি পরীক্ষায় পাশ করতে না পারি?

—তাহলে তার শাস্তিও নিতে হবে। এই বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিল।

দিন দুই তিন পর রামকমলবাবু কহিলেন—দেখ সমীর, তুমি এখন পৃথক হয়েছ, সুতরাং আমার কিছু বলতে যাওয়াই অন্যায়। কিন্তু তবু যে রক্তের টান আছে, সে তো আর ঐ কি বলে, কিছুতেই দূর করা যাবে না। সেদিন সারারাত আমি চোখের দুটি পাতা এক করতে পারিনি কৃষ্ণকমলের মুখখানাই চোখের সম্মুখে ভেসে বেড়িয়েছে। কোথায় ছোট ভাই সেই বেঁচে থেকে সংসার করুক, তা নয় আমারই ঘাড়ে সব ঝক্কি রেখে গেল। মধুসূদন! স্বভাবানুযায়ী আবেশে তাঁহার চোখ মুদিত হইয়া আসিল।

সমীর বুঝিল—এই ভাবাবেশের পশ্চাতে কোনও বড় রকমের অভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে।

চোখ খুলিয়া রামকমল বলিতে লাগিলেন—তোমার খাওয়া শোওয়ার কিছুই তো ঠিক নাই দেখতে পাই। অবিশ্যি ইচ্ছে করলে আমার ওখানেও চলতে পারে। আর তুমি তো আর স্থায়ীভা‍ এখানে থাকতে পারছো না যে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ‍েবে। তার চেয়ে যে কয়দিন আছে আমার এখানেই না হয় খাওয়া দাওয়া কর।

সমীর হাসিতে হাসিতে কহিল—আমার খাওয়া দাওয়ার কোনই অসুবিধে নাই জ্যেঠামশায়। স্কুলঘরের একপাশেই আমাদের কজনার রান্না হয়—দিব্যি চলে যাচ্ছে তো। অবিশ্যি যখন অসুবিধে হবে—এখানেও খাব বৈকি।

—তাই খেয়ো। আলাদা হয়েছে বলে যেন একেবারেই পর ভেবো না। আমি তোমার সেই জ্যেঠামশায়ই আছি।···তারপরে কি যেন একটু ভাবিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—হ্যাঁ, আর একটা কথা তোমাকে কদিন থেকেই বলবো বলবো মনে করি কিন্তু সুযোগ করে উঠতে পারিনে কিন্তু কথাটা এমনি দরকারী যে শীগগির না বল্লেও উপায় নাই।

সমীর বুঝিল এইবার আসল কথা আরম্ভ হইবে, এতক্ষণে ভূমিকা শেষ হইল।

রামকমল বলিতে লাগিলেন—গ্রামের লোকে নেহাৎ কাণাঘুসা করছে—তাই বলা। নইলে আমার এসব কথায় থাকবারই দরকার ছিল না। শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছেলে তোমরা, তোমাদের কোনও উপদেশ দিতে গেলে বিরক্ত হও—এ কি আর বুঝি না। খুব বুঝি। কিন্তু তবু চুপ করে থাকতে পারিনে যে!

সমীর মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, অসহিষ্ণু ভাবে কহিল — আপনার যা বলবার আছে, সবই খুলে বলুন না জ্যেঠামশায়।

একটুখানি রাগিয়া রামকমল বলিলেন—বল্‌ছি। অনেকে গোপনে বলাবলি করছে, আর গোপনেই বা বলি কেন সেদিন যদুগোপালতো আমার মুখের ওপরেই বলে গেল যে তুমি ভারী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ। তিনকড়ির পরিবারের সাথে তোমার অতটা মেলা মেশা তাদের যেন কেমন কেমন ঠেকে। অবিশ্যি তোমাকে এ বিষয়ে অনেকবার বলেছি, কিন্তু তুমি গ্রাহ্য করনি, তবু আপনার লোক আমি—ওসব কথা শুনলে মন খারাপ হয়ে যায় বলেই আমার বলতে যাওয়া। শোনা না শোনা অবিশ্যি তোমার ইচ্ছে।

দুর্নিবার ক্রোধে সমীর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল—কিন্তু তাঁদের কি অপরাধ আমি তো বুঝতে পারিনে।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া রামকমল বলিলেন—যদি বুঝতেই তাহলে আর ও পথে এগোবে কেন। ছেলেমানুষ, এখন রক্ত দিব্যি গরম আছে কিনা, সব কথা কি আর তোমরা তলিয়ে বুঝতে পারবে বাবা! কিন্তু সংসারে ঘা খেয়ে খেয়ে আমরা পেকে গিয়েছি যে। সুতরাং আমাদের ফাঁকি দেওয়া ঐ তিনকড়ির পরিবার কেন, গ্রামের যত বজ্জাত মেয়ে আছে সবাই এক সাথে হলেও পারে না।...এই বলিয়া তিনি গৌরবে স্ফীত হইয়া ঘন ঘন মাথার টাকে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

ঘৃণায় সমীরের শিক্ষিত মন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। জ্যেঠামশায়ের প্রতি কোনও দিনই তাহার শ্রদ্ধা ছিল না। গ্রামের তেলে জলে মানুষ এই প্রবীণ ব্যক্তিটির চরিত্রবল কতখানি তাহারও সে অনেকবার পরিচয় পাইয়াছে। আজ তাঁহার এই নির্লজ্জ উক্তি ও অহঙ্কার দেখিয়া সে মনে মনেই হাসিল।

রামকমল বলিতে লাগিলেন—এতদিন মাগী একা ছিল এখন মেয়েটাও নাকি সেয়ানা হয়ে উঠেছে। কথায় বলে এক রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব তার সাথে। এ হয়েছে ঠিক তাই। গ্রামটা যে ছারে খারে যাবে—এ আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। মধুসূদন!

সমীর আর সহ্য করিতে পারিল না, তীব্রস্বরে বলিল—ভদ্দরলোকের স্ত্রী সম্বন্ধে আপনি বুঝে সুঝে কথা বলবেন।

কিন্তু রামকমল বিচলিত হইলেন না, শান্ত স্বরেই বলিতে লাগিলেন—ভদ্র পরিবার তুমি কাকে বলছো সমীর? তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিবার হলো ভদ্দর? আর হাসিও না বাপু! অবিশ্যি তুমি আমার সন্তানতুল্য ও সব কথা তোমার সামনে বলা উচিত নয়। কিন্তু তুমি এখন কচি খোকাটিও নও তোমার ভুল ভেঙ্গে দেওয়াই ভাল। ঐ যে তিনকড়ির

মেয়ে বলে চলছে সে তো প্রকৃতপক্ষে তাই নয়। ও মাগীর স্বভাব স্বামী বেঁচে থাকতেই দূষ্য হয়েছিল কিনা। আর তাতে অবিশ্যি তারও দোষ তেমন দেওয়া যায় না। তিনকড়ি তো ছিল আজন্ম রুগ্ন, হাঁফ কাসের রোগী শক্তি সামর্থ্য বলতে কিছুই তার ছিল না। হ্যাঁ, ন্যায্য কথা বল্‌তে এই রামকমল বাঁড়ুজ্যের বাধে না। তার সাধ্য কি যে অমন স্ত্রীকে মুঠোর মধ্যে রাখে! না, তাতে ওর পরিবারের দোষ দিই না। কিন্তু ঐ যে সতী রমণী বলে বড়াই, ঐটুকুই ছাড়ো না বাপু, তাহলেই তো চুকে বুকে শেষ হয়ে যায়। গ্রামের মধ্যে কি আর সবাই সতী সাবিত্রী, সীতা দময়ন্তী! সবাই কি আর একভাবে চলতে পারে!

সমীর বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে অথচ মৃদুভাবেই কহিল—আপনার কথাতো এবার শেষ হয়েছে? আমি যেতে পারি? অনেক কাজ আমার আছে।

সমীর যে মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াছে, রামকমল তাহা বুঝিলেন, কিন্তু তবু হাসিয়াই বলিলেন—কাজ তোমার অনেক সে তো আমি দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আমার কথার উত্তরটা দিয়ে যাও বাবা। তুমি বাঁড়ুজ্যে বংশের ছেলে এ কুলের মুখ হাসিও না। তুমি ওদের বাড়ী যাওয়া ছাড়।

সমীর দৃঢ়স্বরে কহিল—আপনার কথা আমি রাখতে পারবো না—ক্ষমা করবেন। আপনারা যাদের খারাপ বলছেন আমি তাদের মত পরিবার এ গ্রামে দেখতে পাইনে।

—খুব ভাল কথা। তাহলে তোমার বাপের দাদা, নিজের জ্যেঠামশায় হলো খারাপ তো? কলিকালে এ সব কথা শুনতে হবে বৈকি!

সমীর কোনও উত্তর দিল না, রামকমল বলিতে লাগিলেন—লোকে অনেক কথাই বলে, কিন্তু আমি গ্রাহ্য করিনে। বরং তাদের কথার প্রতিবাদই করে এসেছি। কিন্তু এখন দেখছি সে সব মিথ্যে নয়।

ঠোঁট দুটি চাপিয়া ধরিয়া সমীর কহিল—তারা কি বলে শুনতে পাই কি ?

একটু কিন্তু কিন্তু করিয়া তিনি বলিলেন—বলে বৈকি, অনেক কথাই বলে। সব কি আর মনে আছে আমার! তিনকড়ির পরিবার নাকি এতদিন তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে—তাদের নাকি গোপনে সাহায্য কর, টাকা পাঠাও, এমনি সব কত কি! আজ কাল তো তার মেয়েটাও দিব্যি যুগ্যি হয়েছে এখন নাকি আবার তার দিকেও—।

সমীরের রক্তবর্ণ চক্ষুর দিকে চাহিয়া তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। ক্রোধে সমীরের হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল—জ্যেঠামশায়, থামুন আপনি। আমি চল্লুম।...কিছুদূর চলিয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া সে কহিল—আর কোনও দিন যেন রক্তের টানের দোহাই দিতে যাবেন না। সমস্ত সম্বন্ধ আজ শেষ করে দিয়ে গেলাম। এই বাড়ীর অর্দ্ধেক ভাগ আমার। কিন্তু এখানে থাকলে আপনার মুখ অনেক বার আমাকে দিনের মধ্যে দেখতে হবে—সে আমি সহ্য করতে পারবো না। তার চেয়ে যে ক'দিন দেশে থাকবো, ইস্কুল ঘরেই আমার চলে যাবে।..এই বলিয়া সে আর অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া আসিল।

সে স্কুলে ফিরিয়া দেখিল তাহার কতকগুলি চিঠি আসিয়াছে। তাহার মধ্যে একখানি অরুণের, অপরখানি মনমোহিনীর। চিঠি দুইখানি পড়িতে পড়িতেই সমীরের মনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ নিঃশেষে মিলাইয়া গেল। মনমোহিনী অনেক কথা লিখিবার পর এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন—এতদিন তোমার নতুন বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে বোধ হয়। কি ভাবে ব্যাপারটি সম্পন্ন হইল, দেশের লোকের কিরূপ উৎসাহ, তোমার জ্যেঠামশায়ের মনোভাব কি, স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কত, তোমাদের কার্য্য পদ্ধতি কিরূপ—আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাইবে। আজ তোমার

নামে পাঁচশত টাকা ইন্‌সিওর করিয়া পাঠাইলাম। টাকাটি তোমার স্কুলের কাজে লাগাইও। অরুণ আর তুমি দুইই আমার পাগল ছেলে। তোমাদের দেশের কাজে নিযুক্ত দেখিলে, আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়।

সমীরের মন পুলকিত হইয়া উঠিল। যে মহিয়সী রমণীর বাৎসল্য, সৎশিক্ষা, মনের প্রসারতা, মহানুভবতা তাহাকে অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই মুগ্ধ করিয়াছিল—আজ তাঁহার প্রাণখোলা আশীর্ব্বাদ পাইয়া সে ধন্য হইয়া গেল। তাহার পর সে অরুণের পত্র পড়িল, সে লিখিয়াছে :—

ভাই সমীর, তুমি যাইবার পর কোনও চিঠিপত্র লেখ নাই। প্রথমটায় আমার ভারী রাগ হইয়াছিল অবশেষে মায়ের কথায় তাহা সংবরণ করিলাম। এক এক সময় আমার এই বলিয়া হিংসা হয় তিনি বুঝি আমার চেয়ে তোমাকেই অধিক স্নেহ করেন। তুমি তোমার স্কুল লইয়া মাতিয়া আছ বলিয়া সময়মত আমাকে চিঠি লিখতে পার নাই—এই কথা মা বলিতেছেন। আচ্ছা, সে কথা আমি মানিয়া লইলাম, কিন্তু এই চিঠি পাওয়ার পরও যদি তুমি উত্তর না দাও তাহা হইলে আমার রাগ সামলানো কঠিন হইবে। অতএব সাবধান হইও।

তারপর একটি নতুন কথা জানাইতেছি। এখানে আসিবার পর গৌরীর বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদের ঘটা দেখিয়া সেদিন ভড়কাইয়া গিয়াছিলাম। পরে মা বলিলেন—তিনিও নাকি গৌরীকে তেমনি ভাবেই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তাঁহারা যে তলে তলে আমার বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করিয়াছেন—তাহা কি করিয়া জানিব! সেবার পূজার সময় গৌরীদের বাড়ীতে প্রণাম করিয়া ফিরিবার পথে তুমি যাহা বলিয়াছিলে—এখন সেই কথাই আমার মনে পড়িতেছে। সেদিন তোমার পিঠে যে বিরাশী সিক্কার কিল মারিয়াছিলাম—তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ?

তুমি শুনিয়া সুখী হইবে আমি যতীন মুখুজ্যের যুবক সমিতি একেবারে

ছাড়িয়া দিব। তুমি যখন তাহার সম্বন্ধে ভাল মত পোষণ কর না তখন তাহার সংসর্গে থাকা আমার উচিত নয়। তোমারই জয় হউক। আর একটি কথাও তোমাকে জানাইয়া রাখি তোমাদের স্কুল আমি একবার দেখিতে যাইব। অবশ্য এসময় যাইতে পারিব কি না ঠিক নাই তবে একবার যাইবই, তোমাকে কথা দিলাম।

সেদিন বৃহস্পতিবার স্কুলের ছুটির দিন। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবার বলিয়া এই দিনটিতেই ছুটির ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেদিন সেখানে কেহই ছিল না। সমীর মনমোহিনীর এই স্নেহের দানের কথা তাহার সহকর্মীদের না বলিয়া শান্তি পাইতেছিল না। জ্যেঠামশায়ের নিকট হইতে অশ্রাব্য কটূক্তি শুনিবার পর ভগবান তাহার মনকে শান্ত করিবার জন্য এমন বস্তু মিলাইয়া দিয়াছেন এজন্য সে ভগবানকে করযোড়ে প্রণাম করিল। সে মনে মনে কহিল আর আমি ভয় করি না। একদিকে মনমোহিনী এবং অন্য দিকে শ্যামাসুন্দরী—এই দুই পূতচরিত্রা মহিলা[illegible]ত্রিম স্নেহাশীর্ব্বাদ, কার্য্যে অগ্রসর হইবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এখন শত জ্যেঠামশায়ের কটূক্তিও তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

সেই দিনই শ্যামাসুন্দরীর বাড়ী গিয়া মনমোহিনীর দানের কথা বলিল। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

সমীর বলিতে লাগিল—মেয়েদের স্কুলের জন্য ভারী টাকার অভাব বোধ করছিলাম ভগবান আমাকে জুটিয়ে দিলেন। এই টাকা দিয়ে এখন বেশ ভাল ভাবে এখানকার কাজ আরম্ভ করা যাবে।

সমীর শ্যামাসুন্দরীর সহিত নানা কথা বলিতে লাগিল কিন্তু জ্যেঠামশায়ের কোনও কথাই প্রকাশ করিল না। অবশেষে যাইবার সময় বলিল, তোমাকে এতদিন 'মাসীমা' বলে ডাকতুম। এখন যদি 'মা' বলি, রাগ করবে না তো?

শ্যামাসুন্দরী আকুল হইয়া কহিলেন—ওরে তুই কি পাগল ছেলেরে।

মৃদু মৃদু হাসিয়া সমীর কহিল—আর মাসীমা নয় অত বড় কথাটা মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। আজ থেকে তুমি আমার মা—এই বলিয়া সে নত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। হর্ষ বিহ্বলচিত্তে শ্যামাসুন্দরী সমীরের মস্তক চুম্বন করিলেন। তাঁহার দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মীরা সেখানেই ছিল। তাহারও চোখ দুটি আনন্দে ছলছল করিতেছিল, তবু দুষ্টামির হাসি হাসিয়া কহিল সমীর দা, ভারী দুষ্টু, তো। মাকে এইবার ভাগ করে নিচ্ছ বুঝি।

শ্যামাসুন্দরী প্রীতিবিহ্বল আননে কহিলেন—সেকি আর আজই হয়েছে মীরা!

সমীর হাসিতে হাসিতে কহিল—ও, হিংসে হচ্ছে বুঝি?

সেদিন সমীর চলিয়া গেলে শ্যামাসুন্দরী অনেকক্ষণ আনন্দে অভিভূত হইয়া রহিলেন। সমীরের মাতৃসম্বোধন তখনও তাঁহার কানে ধ্বনিত হইতেছিল। যদিও তিনি ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না তবু ইহা নিশ্চিত জানিলেন আর কোনও চিন্তার আবশ্যক নাই। সমীর তাহাদের সম্পূর্ণ ভার লইয়াছে।

তিনি মীরাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন—সমীর যেমন ভাবে বলে তেমনি করেই পড়িস তো মীরা?

মীরা কহিল—পড়ি বৈকি মা।

মীরাকে বোধ হয় অনেক কথাই বলিবার ছিল কিন্তু আর কিছুই বলিলেন না। মীরা মায়ের মুখের দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

সমীরের সহকর্ম্মীদের মধ্যে মনোরঞ্জন মিত্রই সর্ব্বপ্রধান। এই যুবক আই, এ, পড়িতে পড়িতে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া কলেজ ছাড়িয়াছিল—কিন্তু তাহার পর হুজুগ থামিয়া গেলেও সে কলেজে যায় নাই। বস্তুতঃ মনোরঞ্জনই সমীরের মনেরভাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। সমীর বরাবর কলিকাতায় থাকে সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও সে খাটিতে পারে না। সে উপদেশ দেয় মনোরঞ্জন তাহার ক্ষুদ্র দল লইয়া কাজ করে। তবে সমীরই ছিল সমস্ত কার্য্যের প্রাণস্বরূপ।

মনোরঞ্জন স্কুলের প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিষ আনিতে কলিকাতায় গিয়াছিল সেদিন ফিরিয়া আসিল। লাইব্রেরীর কতকগুলি বই, নানা দেশের মানচিত্র, গ্লোভ, ছেলেদের খেলিবার জন্ম ফুটবল, ব্যায়ামের জন্ম ডাম্বেল, ডেভেলপার, মুগুর, বাগানের কাজের জন্ম নানারকমের যন্ত্রপাতি, ফুল ও তরিতরকারির বীজ সমস্তই মোটামুটি আনা হইয়াছিল। সমীর সেইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। স্কুলের ছেলেগুলি নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্য কতরকম নতুন জিনিষ আনা হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

স্কুলটি অতি সুন্দর জায়গায় স্থাপিত হইয়াছিল। সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী—চারি পাশে বিস্তৃত ফাঁকা মাঠ। স্কুল ঘরটির পশ্চাতে দক্ষিণ

দিকে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ। পুষ্করিণীর চারি পাশ ঘেরা হইয়াছিল—সেইখানে নানাবিধ ফুলের গাছ রোপণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। পিছনে বামদিকে যে ফাঁকা জায়গাটি পড়িয়াছিল—তাহাই ঘিরিয়া তরিতরকারী শাক-সব্জির বাগানে পরিণত করিবার উদ্যম চলিতেছিল। তাহার পাশেই ছোট একটি নতুন চালা তোলা হইয়াছে—এখানে কয়েকটি গাভী রাখিবে। সমীরের ইচ্ছা আছে এই স্কুলটিকে কেন্দ্র করিয়া সে আশ্রম গড়িয়া তুলিবে। এইখানে সমস্ত ছাত্র ও কর্ম্মীবৃন্দের আহার ও বস্ত্রের সরবরাহ হইবে। কোনও সামান্য জিনিষের জন্যও যেন বাহিরে না যাইতে হয়। কি করিয়া মানুষ স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত এই বিদ্যালয় হইতেই সে দেখাইতে পারিবে। মাঠে ধান হইবে, ক্ষেত্রে সরিষা, মটর, মুগ, কলাই প্রভৃতি শস্য জন্মিবে। বাগানে নানারকমের শাক সব্জি উৎপন্ন হইবে। আশ্রমের গাভী অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ দিবে, রোপিত কার্পাস বৃক্ষ অমিত পরিমাণে তূলা জোগাইবে, তাহা হইতে চরকায় সুতা কাটা হইবে। তারপর আশ্রমের তাঁতে কাপড় নির্ম্মিত হইবে। আঃ! কবে তাহার আশ্রমটি এমনিভাবে গঠিত হইয়া উঠিবেরে! ইহারই পার্শ্বে স্ত্রীলোকদের লইয়া আর একটি আশ্রমের কল্পনাও তাহার মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু এখনও তাহার সময় আসে নাই। সেই জন্য সে শ্যামাসুন্দরীর বাড়ীতেই কয়েকটি মেয়ের শিক্ষার আয়োজন করিয়াছে। যদি ইহাতে উৎসাহ পায় তাহা হইলে পৃথকভাবে আর একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া তাহার ভার শ্যামাসুন্দরী ও মীরার উপর স্থাপন করিবে।

সমীরের ভাবুকমন শুধু এইটুকু চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলনা। সে কল্পনায় দেখিত খুব বেশী দিন নয়, যখন এই দুইটি আশ্রমের নরনারী মিলিত হইয়া তাহাদের আদর্শে ভারতবর্ষকে মোহিত করিবে! হয়তো তখন আর জাতিভেদ থাকিবে না, তখন এই দুই আশ্রমের নরনারী

চিত্তের উদারতায়, জ্ঞানের গরিমায়, সমস্ত কুসংস্কারকে পদদলিত করিয়া প্রেমে, প্রণয়ে, শ্রদ্ধায়, গর্ব্বে একে অপরের সহিত মিলিত হইয়া ধীরে ধীরে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাদের উচ্চ আদর্শ শুধু বাঙালায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে বিতরণ করিবে। তারপর পঞ্চাশ বৎসর পর আর এ দেশকে চেনা যাইবে না। হায়! কবে সেদিন আসিবে রে!

স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বেশী নয় মাত্র কুড়ি জন। সমীর মনে করিল বেশী ছেলে লইয়া প্রথমে সামলানো যাইবে না। অল্প লইয়াই কাজ আরম্ভ করা যাউক। সমীর দেখিল গ্রামের মধ্যে যাহারা ভদ্র বলিয়া অহঙ্কার করে, তাহারা কোনও কথাই কর্ণপাত করে না বরং নীচ-জাতিরাই তাহাদের কথা বুঝিতে চায়। ইহা সত্যই অত্যন্ত আশার কথা।

তেত্রিশকোটি লোকের মধ্যে অন্ততঃ ত্রিশকোটি অশিক্ষিত। নিজের ভালমন্দ বিচারে অক্ষম। এই অসংখ্য জনগণের মনে যদি বিচারবুদ্ধি জাগাইয়া তোলা যায় তাহা হইলেই তো দেশের পনরো আনা দুর্গতি ঘুচিয়া যাইবে। সুতরাং সে আর ভদ্রলোকদের খোসামোদ করিত না বরং সময় পাইলেই সে গ্রামের ছোটলোকদের বাড়ী যাইয়া সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাদের মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিত।

জিনিষপত্রগুলি পরীক্ষা শেষ করিয়া সেগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতেছিল এমন সময় গোবিন্দ মণ্ডল তাহার আট দশবছরের ছেলেটিকে লইয়া আসিয়া সমীরকে প্রণাম করিল।

সমীর হাসিয়া কহিল—ছেলেকে এনেছিস্ গোবিন্দ? বেশ, বেশ!

গোবিন্দ কহিল—তোমাকে কথা দিয়েছি দাদাবাবু, তা ঠেলি কি করে? এখন ভালমন্দ সবই তোমার হাতে।

সমীর কহিল—তোর কোনও ভয় নেই রে গোবিন্দ, ছেলেকে আমি মানুষ করে দেব।

গোবিন্দ মণ্ডল সমীরদের চাষী—তাহাদেরই জমির কতকাংশ চাষ করিয়া থাকে। সে বলিতে লাগিল—তাই দাও দাদাবাবু, ছেলের একটা হিল্লে হোক।

সমীর ছেলের নাম খাতায় লিখিয়া লইল।

যাইবার সময় গোবিন্দ বলিল—কর্ত্তা মশায় তো ভারী রাগ করছিলেন। এবার বুঝিবা জমিটাও ছাড়িয়ে নেন!

সমীর সহাস্যে কহিল—তার জন্য তোমার ভয় নেই গোবিন্দ, তিনি ছাড়িয়ে নেন, আমার জমি চাষ করবে!…গোবিন্দর মন আশ্বস্ত হইল, কহিল—কর্ত্তা তো অনেক কথা বলছিলেন, ইস্কুল টিস্কুল কিছু থাকবে না। পুলিশে সব ভেঙ্গে দিয়ে যাবে, তোমার হাতে দড়ি পড়বে! ছিঃ! ছিঃ! ভদ্দরলোক হয়ে নিজের ভায়ের ছেলেকে দেখতে পারে না। এ সব হিংসের কথা। আমরা চাষা হলেও কি আর এটুকু বুঝতে পারিনে? তাহলে তোমার জমি আমিই চাষ করবো কি বলো? ও বুড়োর পায়ে গড় করি।

তেমনি হাসিয়া সমীর কহিল—তোমার ভাবনা নাই গোবিন্দ, আমি কথা দিলাম।

গোবিন্দ এইবার তাহার পদধূলি জোর করিয়া লইয়া মস্তকে জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিল।

মনোরঞ্জন নিকটেই বলিয়াছিল, সমীরের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল—সমীর দা', তোমার জ্যেঠামশায় শত্রুতা করতে কখনও ছাড়বে না।

সমীর মৃদু হাসিল মাত্র।

অল্পক্ষণ পরেই স্কুলের সমস্ত ছাত্র বটগাছের তলায় একত্রে শ্রেণীবদ্ধ

হইয়া উপবেশন করিল। তারপর শিক্ষক ও ছাত্র সমবেত হইয়া গাহিতে লাগিল —

স্বজলাং স্বফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

মণিমালিনীর চিঠিখানি ভষ্মীভূত করিয়া প্রথমে অরুণ খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিল কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক শীতল হইলে তাহার আচরণ নিজের কাছেই কেমন অদ্ভুত বোধ হইতেছিল। সত্যই এতটা উত্তেজনার কোনও কারণ ছিল না। সে যখন তাহার সহিত দেখা করিবেই না ঠিক করিয়াছিল তখন চিঠিখানি পড়িলেই বা এমন কি ক্ষতি হইত। বরং তাহার মনের কি ভাব তাহা অন্ততঃ সে জানিতে পারিত। কিন্তু মণিমালিনীর মনোভাব কি তাহা জানিবারই বা তাহার আবশ্যক কি? সে যখন যুবক সমিতির সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে তখন এসব দিয়া তাহার কোনও প্রয়োজন নাই।

পুনরায় সে ভাবিতে লাগিল না হয় সে এসব ছাড়িয়াই দিবে, তাই বলিয়া চিঠিখানির প্রতি অমন রূঢ় ব্যবহার করা তাহার উচিত হয় নাই। মণিমালিনী তাহার সহিত তো এপর্য্যন্ত কোনও মন্দ ব্যবহার করে নাই। তাহার কথায় মণিমালিনীর মন বিচলিত হইয়াছে — ইহার মধ্যে হয়তো সত্য কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে। যে গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছে, সতীত্ব ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহার মনের গতি একদিনে ফিরিবে এমন আশা করা যায় না। হয়ত অরুণ একটু চেষ্টা করিলেই একটি নারী জীবনকে উদ্ধার করিতে পারিত। সে অবহেলায় এই সুযোগটি নষ্ট করিয়াছে মাত্র।

তাহাকে উদ্ধার করিয়া স্বামীর ঘরে পাঠাইয়া দিলেই যে তাহার নারী জীবন সার্থক হইত ইহাও কি সত্য? যে অভিনেত্রী হইবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে জোর করিয়া গৃহধর্ম্মে নিযুক্ত করিলে সমাজের কি উপকার হইবে? বরং এই ভাল হইয়াছে—সে নিজের পথ নিজে বাছিয়া লইয়াছে। অরুণের প্ররোচনায় যদি সে গৃহে ফিরিত—তাহা হইলেই তাহাকে সারা জীবন দগ্ধ হইতে হইত কি না কে জানে! ঐ তো নবীন তাহার সঙ্গে একত্র বাস—ভাবিতেও তাহার হাসি পায়।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহার রূপ। সেদিন দলণীর বেশে সুসজ্জিতা মণিমালিনী রূপের জ্যোতিতে তাহার চোখ ঝলসাইয়া দিয়াছে। নীচ জাতির মেয়ে বলিয়া তাহাকে কে মনে করিবে?

রূপের আলোচনায় যখন অরুণের মন নিযুক্ত হয় তখন তাহার কল্পনাকে বাধা দেওয়া কঠিন হইয়া উঠে। তখন সে সম্ভব অসম্ভব নানারূপ চিন্তায় মসগুল হয়। সে তুলনার সমালোচনা করে। নিজের মনেই কাটাছেঁড়া করিয়া কি যে মীমাংসা করিতে চায় তাহার ঠিক নাই। অরুণেরও তাহাই হইল। সে অনেক সময় বিনা কারণেই গৌরীর সহিত মণিমালিনীর রূপের তুলনা করিতে বসিত। নিজের মনের ভিতর তর্ক উদ্দাম হইয়া উঠিলে সে অনেক সময় এই ভাবিয়া লজ্জিত হইত যে এক অসচ্চরিত্রা রমণীর পাশে গৌরীকে বসাইয়া বিচার করিতেছে! ছিঃ! এত নীচমন তাহার হইল কেন? সে তখনই নিজের মনকে শাসন করিয়া বলিত—গৌরীর কাছে মণিমালিনী? চাঁদের কাছে নক্ষত্র? সূর্য্যের কাছে বিদ্যুতের আলো? ছিঃ!

এমনি নিজের মনেই তর্ক করিয়া, মীমাংসা করিয়া, ভাল মন্দ বিচার করিয়া অর্থাৎ কিছুই না করিতে পারিয়া সে যে কবে অন্তর হইতে মণিমালিনীকে ক্ষমা করিয়া বসিয়াছে তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিল না।

তাই যেদিন তাহার আর একখানি পত্র তাহার হাতে আসিয়া পড়িল —সেদিন অরুণ মনে মনে আনন্দই অনুভব করিল, তাহা নষ্ট করিবার সঙ্কল্প তাহার মনে একটিবারও জাগিল না। সে চিঠিখানি খুলিয়া পড়িল,—

অরুণবাবু, আগেকার চিঠি পাইয়াছেন কি না জানি না। অপনি কি রাগ করিয়াছেন? কোনও অপরাধ করিয়াছি বলিয়াও তো মনে হয় না। আমি কিছুদিন হইতে কঠিন পীড়ায় শয্যাগত—বাঁচিবার আশা নাই। শেষ সময় আপনাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। আপনি যে আসিবেন না তাহা জানি তবু লিখিলাম। আমি থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়াছি। যদি রক্ষা পাই আপনার আদেশে স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব। প্রণাম লইবেন।

প্রণতা—

মণিমালিনী।

অরুণ মনে মনে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। সত্যই তো এই নারীকে সে চিনিতে পারে নাই। যে রমণী এমন উদার এমন মহৎ তাহার বিরুদ্ধে এতদিন কি অন্যায় হীন ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছে সে! তাহার কথায় সে থিয়েটার ছাড়িয়াছে, স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত, হায়রে! এমন সময় ভগবান কেন এমন কঠিন পীড়া দিলেন? মণিমালিনীর মঙ্গলের জন্য সে বার বার ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

ছুটী ফুরাইতে তখনও মাসখানেক দেরী, সুতরাং সে যাইবার কথাও বলিতে পারে না। অথচ যাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কোনও রকমে পনেরো দিন কাটিয়া গেলে অরুণ মাকে কহিল ছুটি তো ফুরিয়ে এলো। এইবার কলিকাতায় যাই মা?

মনমোহিনী বিস্মিত হইয়া কহিলেন—এখনো পনেরো দিন আছে না?

—তা আছে। কিন্তু এখানে পড়াশুনা কিছুই হলো না। ছুটিট অমনি অমনি কাটলো। এ কয়দিন কলিকাতায় গিয়ে পড়া শুন করি।

মনমোহিনীও পুত্রের পাঠের প্রতি অমনোযোগ লক্ষ্য করিতেছিলেন সুতরাং তিনি আপত্তি করিলেন না। অরুণ কলিকাতায় রওনা হইল।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই অরুণ বুঝিতে পারিল সে একটি মস্ত ভুল করিয়া বসিয়াছে। মণিমালিনীর অসুখ, তাহাতে তাহার মন খারাপ হয় কেন? একটা মিথ্যা কথার ছলনায় জননীকে ভুলাইয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার অনুশোচনা হইতে লাগিল। অবশেষে সে মিথ্যাবাদীতে পরিণত হইয়া গেল! এ কিসের জন্য—কিসের জন্য? অরুণ একবার ভাবিল মায়ের নিকট ফিরিয়া যায়, কিন্তু লজ্জায় ফিরিতে পারিল না। মাকে আবার কি কৈফিয়ৎ দিবে?

কলিকাতা পৌছিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সে মনে মনে ঠিক করিল—যখন আসিয়াছে, তখন আর উপায় নাই। তবে সে কিছুতেই মণিমালিনীর বাড়ী যাইবে না। সে মায়ের কাছে যে কথা বলিয়া আসিয়াছে তাহাই করিবে। সত্যই তাহার ছুটির মধ্যে কিছুই পড়াশুনা হয় নাই। এই পনরোটা দিন—দিন রাত পরিশ্রম করিয়া ক্ষতিপূরণ করিয়া লইবে। তাহার এমনও মনে হইতে লাগিল ওসব ছলচাতুরী, তাহাকে বিপথে টানিবার অভিসন্ধি। আর কিছুই নয়। মণিমালিনীর ঘরে ফিরিবার কথা মিথ্যা! থিয়েটার ছাড়িবার কথা মিথ্যা! তাহার অসুখের সংবাদ মিথ্যা! সে এবার সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছে!

কিন্তু কলিকাতায় পৌছিয়া ট্যাক্সিতে বাসায় যাইতে যাইতে পুনরায় তাহার মন বিপরীত দিকে চালিত হইল। দেওয়ালের গায়ে থিয়েটারের প্ল্যাকার্ড মারা রহিয়াছে। সে দেখিল আজ লিলি থিয়েটারে চন্দ্রশেখর

হইবে—অথচ দলনী বেগম অথবা অন্য কোনও ভূমিকায় মণিমালিনীর নাম নাই। তাহার বুক আরও দ্রুততালে দুলিতে লাগিল। তাহা হইলে, তাহা হইলে তো মণিমালিনী মিথ্যা কথা লেখে নাই! সে হয় তো এতদিন বাঁচিয়া নাই—তবু তাহার মন মণিমালিনীর উপর অবিচার করিবে? সে ট্যাক্সি থামাইয়া ভাল করিয়া দেখিল দুই-তিন সপ্তাহের প্ল্যাকার্ড অনেক স্থানে অবিকৃত রহিয়াছে কিন্তু তাহাতেও মণিমালিনীর নাম নাই! মনের ভিতর সে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

কিন্তু মনে যাহাই বলিতে থাকুক, সে মণিমালিনীর সংবাদটাও লইতে পারিল না। তাহার সংযত চরিত্র তখনও লাগাম ধরিয়া ছিল আজন্ম সংস্কার ত্যাগ করাও সহজ নয়। কিন্তু মনে মনে সে উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই সে যতীনবাবুর সংবাদ লইয়াছিল ভাবিয়াছিল হয় তো তাহার নিকট মণিমালিনীর সংবাদ পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে তখন তাহার মহিলা আশ্রমের জন্য চাঁদা আদায় করিতে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। সে একবার ভাবিল লিলি থিয়েটারে যাইয়া সংবাদ লয়। কিন্তু তাহাও যেন কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতেছিল। অবশেষে সে একদিন তাহার পরিচিত কোনও লোককে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, এ সপ্তাহে মণিমালিনী থিয়েটারে নামেনি কেন জানেন?

অরুণের প্রশ্নে লোকটি কহিল—কি জানি মশায়। ওদের খেয়াল বুঝবে কে। হয় অসুখ বিসুখ করেছে না হয় কারও সাথে লম্বা দিয়েছে। ওদের কথা বলেন কেন?

অরুণ তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইল না। অবশেষে কলিকাতা আসিবার পাঁচ দিন পর সে মণিমালিনীর বাড়ী উপস্থিত হইল।

অরুণকে দেখিয়া মণিমালিনী কলহাস্যে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিল—আসুন, আসুন অরুণবাবু। ওঃ, আমার কি সৌভাগ্য আজ, কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলুম রে। বেশ ভাল আছেন তো? কবে এলেন? আমার কথা আপনার মনে আছে? চিঠির উত্তর দেন নি কেন? না, না ওখানে বসবেন না। খাটের উপর উঠে বসুন।

অরুণ চেয়ার টানিয়া লইয়া কহিল—আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার এখানেই বেশ হবে।

মণিমালিনীকে সশরীরে দেখিতে পাইয়া অরুণের মন আশ্বস্ত হইল—আসিতে আসিতে কত সম্ভব অসম্ভব কল্পনাই তাহার মনে খেলিয়া গিয়াছে যে। অরুণ দেখিল—মণিমালিনীর শরীরের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই—তবে একটু যেন রোগা হইয়া গিয়াছে। মুখের জ্যোতিও যেন একটু মলিন। কিন্তু এই পাণ্ডুর মুখখানি কি এক সৌম্য শ্রীতে ভরা। মণিমালিনীর এই নতুন স্নিগ্ধ রূপটি অরুণকে আর একভাবে মুগ্ধ করিল, সে হাসিয়া কহিল—আপনি তো প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে গেলেন, আমি এখন কোনটার জবাব দিই—বলুন দেখি?

মণিমালিনী আর একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া নিকটে বসিয়া সহাস্যে কহিল—সেটা আপনার খুসী। কিন্তু কেন আপনি এমন নিষ্ঠুর হয়েছিলেন? ভগবান কি দয়ামায়া বলে কিছুই আপনার শরীরে দেন

নি ?····· এই কথা বলিতেই তাহার চোখ দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল।

অরুণ এই অভিযোগের উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

মণিমালিনী জিজ্ঞাসা করিল—আমার দুখানা চিঠিই পেয়ে ছিলেন তো ?

অরুণ কহিল—পেয়েছিলুম।

—তবু উত্তর দেন নি ? বুঝেছি এখনো আমাকে তেম্‌নি ঘৃণা করেন !

অরুণ ব্যস্ত হইয়া কহিল—না, ঘৃণা করবো কেন ? সময় পাইনি বলেই উত্তর দিই নি।

সে যে প্রথম চিঠিটার কি দুর্গতি করিয়াছিল—তাহা যদি মণিমালিনী জানিত !

মৃদু হাসিতে পাতলা রাঙা ঠোঁট দুখানি বিকসিত করিয়া মণি বলিল—আপনারা পুরুষ মানুষ, কাজের লোক, একটা কৈফিয়ৎ তো দিতেই পারেন। কিন্তু আমাদের বলবার কিছুই নাই যে ! তারপর একটু নীরব থাকিয়া সে বলিতে লাগিল—তবু একটা কাজ ছিল,। কিন্তু থিয়েটার ছাড়বার পর একেবারে একঘেয়ে জীবন আমার। তারপর অসুখে পড়লুম, বাঁচবার তো কোনই আশা ছিল না। জ্বর, নিমোনিয়া—বিছানায় শুয়ে ছটফটানি ! উঃ, কি কষ্টেই না দিন আমার কেটেছে ! তবু ওরই মধ্যে চিঠি লিখে আপনাকে জানালুম। দিনের পর দিন যেতে লাগল—শুধু আপনার প্রতীক্ষা করে দিনরাত থাকতাম। যার কথায় সুখ, ঐশ্বর্য্য, যশ সমস্ত হেলায় ত্যাগ করেছি—তার অবহেলা—। বলিতে বলিতেই তাহার গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল, সে অঞ্চল দ্বারা চোখমুখ আবৃত করিয়া কাঁদিবার ছলে হাসি দমন করিতে লাগিল।

অরুণ ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। স্ত্রীলোক লইয়া কারবার তাহার এই প্রথম, তাহাদের মন বুঝিবার বিশেষ করিয়া মণিমালিনীর ন্যায় নিপুণা অভিনেত্রীর মন বুঝিবার ক্ষমতা তাহার নাই। সে তাহার সমস্ত কথা-গুলিই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করিল। এতবড় অসুখে ভুগিয়া যে কি করিয়া সে ইহারই মধ্যে এমন সুস্থ হইয়া উঠিল—ইহা সে ভাবিয়া দেখিল না। এই নারী মোহনাগপাশে তাহাকে শক্ত করিয়া জড়াইবার প্রয়াস করিতেছে এবং হয়তো বা কিছু জড়াইয়াও ফেলিয়াছে—ইহা সে ধরিতে পারিল না। সে কহিল—আপনিও আমার প্রতি অবিচার করবেন না। আপনার দ্বিতীয় চিঠিটা পেয়েই আসবো ভেবেছিলুম—কিন্তু তথনও ছুটী ফুরোতে একমাস বাকি ছিল। তবু পনরো দিন থাকতেই চলে আসি। এখানেও তো পাঁচ দিন এসেছি।

মণিমালিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—তবু একবার পায়ের ধূলো পড়েনি? এখনও কি আপনাকে নিষ্ঠুর বলতে পারিনে? আচ্ছা অরুণ বাবু, ভগবান যদি আমাকে ভাল না করতেন—আপনার কি একটু অনুশোচনা হতো না? আমার ভাল না হওয়াই উচিত ছিল। না জানি কত দুঃখু দেওয়ার জন্যই ভগবান আমাকে সুস্থ করে তুললেন।

অরুণ সহাস্যে কহিল—তাহলে ভগবান আমারই উপর অবিচার করুন। এই বুঝি আপনার মনের ভাব? আপনিও স্বার্থপির কম নন দেখছি।

বিলোল কটাক্ষ হানিয়া মণিমালিনী কহিল—আপনার চেয়ে নিশ্চয়ই নয়! আমার কথা যাক, আপনি তো ছুটীতে বেশ ভাল ছিলেন? আপনার স্ত্রী। ছেলে পুলে—।

অরুণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—এ যে দেখছি গাছে না

করে। যিনি এই দুয়েরই স্রষ্টা—তিনি বুদ্ধিমান হতে পারেন, চতুর নীতিশাস্ত্রবিদও হয়ত বলতে পারি—কিন্তু ন্যায়পরায়ণ বা পক্ষপাতশূন্য তো তিনি নন। এতে আপনি রাগই করুন আর যাই ভাবুন।

তাহার কথার ঝাঁঝ দেখিয়া অরুণ হাসিতে লাগিল। মণিমালিনী বলিতে লাগিল—হাসছেন কেন? পুরুষের ঐ হাসিই তো সর্ব্বনাশের মূল।

অরুণ তেমনি হাসিতে হাসিতে কহিল—আপনার ভাব দেখে সত্যি হাসি পায় যে! আমার কিচ্ছু হয়নি—তবু আপনি বিশ্বাস করবেন না।

—সত্যি কিছু হয় নি? ভালকথা! তাহলে আমিই মিথ্যেবাদী হলুম।...এই বলিয়া সে অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিল।

অরুণ ব্যস্ত হইয়া কহিল—আপনি রাগ করবেন না। আপনার অসুখ হয়েছিল বল্লেই যদি আপনি সন্তুষ্ট—

জিভ কাটিয়া মণিমালিনী কহিল—ছিঃ, ছিঃ, একি বলছেন আপনি! আপনার মুখে কিছুই বাধে না দেখতে পাই। তারপর ফিক করিয়া একটু হাসিয়া সে বলিল—আপনি ভালই ছিলেন এ শুনে তো আমি সুখীই হয়েছি। আপনার ভাল মন্দ যে আমার কাছে কি বস্তু——। সহসা থামিয়া গিয়া সে বলিয়া উঠিল—চিঠিখানি লিখে দিয়েছেন তো? কৈ তিনি তো এখনও এলেন না? এত দেরী কচ্ছেন কেন আমি তো ভেবে পাইনে।

তাহার কথায় অরুণ মনে মনে যেন অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিল—তবে কি মণিমালিনী গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে? সে মাথা নীচু করিয়া কহিল—না, দেওয়া হয়নি। যতীনবাবু এখানে নাই—তাঁকে একটা জিজ্ঞাসাবাদ না করে—

একটুখানি হাসিয়া মণিমালিনী কহিল—তাঁকে জিজ্ঞাসা করার দরকার কি অরুণবাবু? আপনি আদেশ দিয়েছেন আমি স্বামীর ঘরে ফিরে যাচ্ছি

এতে আর অন্যের কথায় কি যায় আসে ? আপনার কথা আমার বেদবাক্যেরও অধিক—একি আপনাকে বলিনি ?

অরুণ একটুখানি ভাবিয়া কহিল—তাহলে শুধু আমার কথাতেই চলেছেন—আপনার নিজের ইচ্ছা এতটুকুও নাই ?

মধুর হাসি হাসিয়া মণিমালিনী কহিল—অত কথা শোনবারই বা আপনার দরকার কি ? আমি রাজি আছি—এই কি যথেষ্ট নয় আপনার কাছে ?

অরুণ স্পষ্টভাবেই কহিল—না এতে যথেষ্ট নয়। আপনি যদি স্বামীকে ভালবেসে ঘরে ফিরে যান আমি সন্তুষ্ট হব, কিন্তু শুধু আমারই কথার উপর নির্ভর করে গেলে আপনার কিংবা আপনার স্বামীর কারুরই মঙ্গল হবে না !

মণিমালিনী দুষ্টামিভরা দৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—আপনি সবই জানেন, অথচ কিছুই স্বীকার করতে চান না। যদি স্বামীকে ভালইবাসবো, তাহলে ঘরে ফিরবার সুযোগ পেয়ে কেনই বা না গেলাম—ফিরবার সুযোগ তো পেয়েছিলাম। আপনি এ জেনেই রাখুন, স্বামীকে ভালবাসার মত অবস্থা বুঝি আমার কোনও দিনই হবে না। তবু, সমাজের মঙ্গলের জন্য, আপনার কথায়—

বাধা দিয়া অরুণ কহিল—দরকার নাই তাহলে আপনার ফিরে গিয়ে।

মণিমালিনী মনে মনে খুসী হইয়া অথচ মুখখানিতে বিষণ্ণতার ছায়া মাখাইয়া কহিল—আপনি কি রাগ করছেন নাকি ?

অরুণ হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—আপনি তো কেবল আমার রাগই দেখতে পান—আর কিছুই তো চোখে পড়ে না।

মণিমালিনী সহাস্যে জবাব দিল—না দেখে করি কি ! প্রথম দিনের কথা কি মনে নেই ?

—ও, সেইদিনের কথাই বুঝি চিরদিন মনে গেঁথে রাখবেন আপনি।

মণিমালিনী হাসিতে লাগিল—কিন্তু উত্তর দিল না।

অরুণ তাহার মুখের দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতে লাগিল—এ কয়দিন অনেক কথাই ভেবে দেখেছি আমি। আপনার স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া সত্যিই অন্যায় হবে। তার চেয়ে আপনি আবার থিয়েটারে ঢুকুন। সংসারে শুধু পতিপত্নীত্বই চরম নয়, সংসার করাই একমাত্র কাম্য নয় এ ছাড়াও অনেক বড় কাজ আছে। অন্ততঃ আর্টের খাতিরে আপনার ঘরে ফেরা উচিতই নয়। এ কয়দিন আপনি নামেন নি—পাবলিক ছটফট করছে। আপনি তাদের শান্ত করুন।

ধীরে মণিমালিনী অরুণের একখানি হাত নিজের দুই হাতের ভিতর তুলিয়া লইল, তারপর বিলোল কটাক্ষ হানিয়া মধুমাখা স্বরে কহিল—কিন্তু তাহলে তো আমাকে ঘৃণা করবেন না, অরুণবাবু।

অরুণ কহিল—না।

ছলছল নেত্রে মণিমালিনী বলিল—এর পরও যদি তুমি ঘৃণা কর আমি বাঁচবো না।

অরুণের বুকের ভিতর দপ দপ করিতে লাগিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মণিমালিনীর দিকে একটু আগাইয়া দুই হাত দিয়া তাহার দুই গাল চাপিয়া ধরিয়া কহিল—করবো না, করবো না, করবো না—তোমাকে কথা দিলুম।

দিন দুই তিন পর প্রতুল আসিয়া কহিল—আপনি বাঁচালেন অরুণবাবু। লিলি থিয়েটার তো যেতে বসেছিল, শুধু আপনার কৃপাতেই রক্ষা পেল। উঃ, কি যে মন্তর দিয়ে গেলেন আপনি—মণি আর কিছুতে থিয়েটারে নামবে না। তার কনট্রাক্টের সময় শেষ হয়নি, অনুনয়, বিনয়, জোরজুলুম, মামলা মোকর্দ্দমায় ভয় কিছুতেই তার মনকে টলাতে পারিনি। বাস্তবিকই আপনার ক্ষমতা দেখে অবাক হতে হয়। এ ধরনের একটা পাবলিক ওম্যানের মনকে এমনভাবে আয়ত্ব করা সে এক অভিনব ব্যাপার। এই বয়সে থিয়েটারের কাজে অনেক মেয়েমানুষই দেখে এলাম—কিন্তু এমনটি কোনও দিন দেখিনি, শুনি নি—বোধ করি কোনও দিনই শুনবো না।

অরুণের বিকারগ্রস্থ মন প্রতুলের খোসামোদে প্রীত হইয়া উঠিল। প্রতুল বলিতে লাগিল—আপনিই তার মন ভেঙ্গেছিলেন আবার আপনি তাকে জুড়ে দিলেন। এবার বুঝিবা তার শক্তি আরও বেড়ে যাবে।

অরুণ কহিল—বেড়ে যাবে, এ কি করে বুঝলেন আপনি?

প্রতুল মৃদু হাসিয়া কহিল—এ বোঝা তো কিছুই শক্ত নয় অরুণবাবু। ফিমেল সাইকলজি তেমন পড়া না থাক, অভিজ্ঞতা দিয়ে অনেকটা জানা আছে কিনা। প্রেমহীনা নারীর অভিনয় যত সুন্দরই হোক তত প্রাণস্পর্শী হতে পারে না যত হয় সে ভালবাসার আস্বাদ পেলে। মণিমালিনী একদিন ছিল স্নেহ ভালবাসা শূন্যা, কঠিন হৃদয়া, স্বার্থান্বেষিণী নারী কিন্তু এখন সে সত্যই প্রেমের পরশে নবজীবন লাভ করেছে।

প্রতুল কি যে বলিতে চায় অরুণ তাহা জলের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, সে কহিল—থিয়েটারে আবার কবে নামছে সে ?

—কালকের অভিনয়েই সে নামবে। সেইজন্যই তো আপনার নিকট ছুটে এলাম। কাল আপনি থিয়েটারে যাবেন এই আমার একান্ত বিনীত অনুরোধ।

অরুণ একটু ভাবিয়া কহিল—আমার অবিশ্যি যাওয়ার কোনও বাধা নেই কিন্তু এতে ভারী পড়াশোনার ক্ষতি হয়। রাত্রি জাগার ফলে শরীরও তেমন ভাল থাকে না।

প্রতুল হাসিতে হাসিতে কহিল—যতই কৈফিয়ৎ দিন আমি আপনার কথা না নিয়ে যাব না। মণিমালিনীর কালকের প্লে আপনাকে দেখতেই হবে। কাল অগণিত দর্শকের আনন্দোচ্ছ্বাস দেখলেই বুঝতে পারবেন—ওকে স্বামীর ঘরে না পাঠিয়ে কি মঙ্গল করেছেন।

অরুণ বলিল—বেশ, কাল না হয় যাব। কিন্তু এর পর আর আপনারা বিশেষ পীড়াপীড়ি করবেন না।

—বিলক্ষণ! এই তো সবে আরম্ভ এখনই ও কথা বললে তো আমরা শুনতে পারবো না অরুণবাবু। আপনি থিয়েটারের কত বড় হিতাকাঙ্ক্ষী তা যখন বুঝতে পেরেছি তখন আপনাকে ছাড়া আমাদের পক্ষে সহজ হবে না। এতে আপনি রাগই করুন আর যাই করুন। আচ্ছা, আজ তাহলে আসি।···এই বলিয়া প্রতুল নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

বিপুলকায় তরণীর নিম্নদেশে সামান্য একটু ছিদ্র হইলে যেমন সে ধীরে ধীরে গভীর জলে নিমজ্জিত হইয়া যায় তেমনি মনের দৃঢ়তা ও চরিত্র সংযমের একটুখানি শিথিলতা দেখা দিলে মানুষ ধীরে ধীরে কোথায় যে নামিয়া যায় সে নিজেই বুঝতে পারে না, অথবা বুঝিতে পারিলেও প্রত্যাবর্ত্তন অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অরুণেরও ঠিক তাহাই হইল।

থিয়েটার দেখিয়া, মণিমালিনীর সহিত বারংবার সাক্ষাৎ করিয়া, প্রকাশ্য ভাবে তাহার প্রেম নিবেদন শুনিয়া, অবশেষে নিজের ভালবাসা ব্যক্ত করিয়া যখন সে মনের দিকে চাহিল তখন দেখিতে পাইল সে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, ফিরিবার তাহার সত্যই উপায় নাই। বাড়ী হইতে সে প্রায় দশ বারো দিন আসিয়াছে কিন্তু জননীর নিকট পৌছাসংবাদ দেওয়া হয় নাই। তিনি ইহারই মধ্যে তিন চারখানি পত্র লিখিয়া উত্তর না পাইয়া টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

কলেজ খুলিবার আর দুই তিন দিন বাকি। ইহারই মধ্যে সমীর আসিয়া পড়িবে। কিন্তু বন্ধুর আসন্ন আগমন সম্ভাবনায় তাহার মন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সমীরকে সে সমস্ত কথা গোপন করিয়া চলিবে কিরূপে? কলেজ খুলিবার দীর্ঘদিন পূর্ব্বে কলিকাতা আগমনের সংবাদ পাইলেই সে সন্দেহ করিয়া বসিবে। জননীকে সে ফাঁকি দিতে পারিয়াছে বটে কিন্তু বন্ধুকে সে ভুলাইবে কোন অবলম্বনে? তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল—নিজের কাছে নিজেই যেন সে অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু মণিমালিনীর ভালবাসাকেও সে আর উপেক্ষা করিতে পারে না। এই কয়দিনেই এ ধারণা তাহার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে মণিমালিনী রমণীরত্ন। তাহার ভালবাসার নাগপাশে সে চিরকালের মত আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর নিজের মনের কথা তো তাহার অবিদিত নাই—সত্যই সে তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছে ইহার মধ্যে কপটতা নাই। তরুণ যুবকের প্রথম ভালবাসার ন্যায় ইহা অত্যন্ত উত্তেজক, অত্যন্ত তীব্র। এ যেন উগ্র উন্মাদক সুরা, পান করিলে নেশায় বিহ্বল হইতেই হইবে।

কলেজ খুলিয়া গেল—কিন্তু সমীর আসিল না। তাহা হইলে কি সে কলেজ ছাড়িয়া দিল? স্কুল লইয়া বুঝি মাতিয়া আছে সে? তাহাকে

আসিতে না দেখিয়া অরুণ মনে মনে স্বস্তি অনুভব করিল অথচ এটুকুও বুঝিল এরূপ মনের ভাব তাহার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়। ইহারই মধ্যে তাহার এত অধঃপতন ?

কলেজ খুলিবার তিন চার দিন পরই অরুণ সমীরের পত্র পাইল। সে লিখিয়াছে—ভাই অরুণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি পড়া ছাড়িয়া দিলাম। দেশের অনেক নিরক্ষর লোকের দিকে চাহিয়া মনে হইতেছে আর উচ্চ শিক্ষার আমার প্রয়োজন নাই। যেটুকু শিখিয়াছি তাহারই যদি সদ্ব্যবহার করিতে পারি তাহা হইলেই ধন্য হইব। আমার গ্রামের লোক—না গ্রামের সব লোক নয়, যাহাদের আমরা এতদিন ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি শুধু তাহারাই—আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহাদের ফেলিয়া আর আমি দূরে যাইতে চাহি না। কিন্তু ভাই তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতেও আমার কষ্ট হইতেছে। এবার পূজার ছুটিতে তুমি যখন বাড়ী যাইবে—তখন তোমাদের ওখানে যাইব। তুমি কি সত্যই 'যুবক সমিতি' ছাড়িয়া দিয়াছ ? যদি না দিয়া থাক—তবে আমার অনুরোধ—তুমি ছাড়িয়া দাও। এখন আমি দূরে থাকিব—সত্যই তোমার জন্য ভাবনা হইতেছে।

সমীর কলেজ ছাড়িয়া দিল—ইহা অরুণের পক্ষে দুঃসংবাদ। কিন্তু সে ভাবিয়া বিস্মিত হইল ইহাতে তাহার মন ভিতরে ভিতরে খুসী হইয়া উঠিয়াছে। অরুণ তাহার মনের ভাব দেখিয়া লজ্জা বোধ করিল বটে—কিন্তু মন তাহার হাল্কা হইয়া গেল।

সেদিন প্রায় সন্ধ্যার সময় অরুণ মণিমালিনীর নিকট আসিল, গম্ভীর ভাবে কহিল—মনটা তেমন ভাল নাই মণি।

মণিমালিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল—কি হয়েছে বল দেখি ?

—আমার বন্ধু সমীর পড়া ছেড়ে দিল। সে আর কলকাতায় আসবে না।

মণিমালিনী সমীরের কথা অনেকটা শুনিয়াছিল, তাই সে পুলকি হইয়া উঠিল। আঃ! তাহা হইলে শীকার লইয়া খেলা তাহার কঠি হইবে না।

মণিমালিনী সহসা তাহার নিটোল শুভ্র দুই হাত দিয়া অরুণের গল জড়াইয়া ধরিয়া অতি কোমল সুরে কহিল—তুমি অমন মুখ ভার করে থাকতে পারবে না বলে দিচ্ছি। তোমার গম্ভীর ভাব আমি সহ্য করতে পারিনে। বল কিসে তোমার মুখে হাসি ফুটবে?

অরুণ মৃদু হাসিল। মণিমালিনী আরও একটু আগাইয়া গিয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া মধুর স্বরে কহিল—তোমার বন্ধুর অভাব কি আমি পারবো না পূরণ করতে?

মণিমালিনীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অরুণ কহিল—মণি, সত্যই কি তুমি আমাকে ভালবাস?

মুখ তুলিয়া টানা-টানা চোখ দুটি অরুণের চোখের দিকে ন্যস্ত করিয়া আবেগ ভরা সুরে সে কহিল — সে কথা কি এখনও বুঝতে পারনি তুমি? আজ কেন—প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি—সেইদিন থেকেই ভালবেসেছি যে। আমার নিজের জন্য আর কিছুই রাখিনি। কিন্তু তুমি নিষ্ঠুর, তাই এতদিন আমাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছ।

অত্যন্ত আবেগে অরুণ তাহার প্রশস্ত বক্ষে মণিমালিনীকে চাপিয়া ধরিয়া তারপর তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

— ২৬ —

বউমা জানলাটা খুলে দাও তো।

তখন প্রায় অপরাহ্ন—সূর্য্য অস্ত যায় যায় হইয়াছে। হরিভাবিনী বিছানায় চোখ মুদিত করিয়া শুইয়াছিলেন চোখ মেলিয়া মৃদুস্বরে এই কয়টি কথা বলিলেন। চারু নিকটেই বসিয়াছিল উঠিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের জানালাটি খুলিয়া দিল। তারপর নিকটে বসিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে শ্বাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—এখন কেমন বোধ করছো মা?

হরিভাবিনীর শীর্ণ রোগপাণ্ডুর মুখে যেন ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন—আর বোধ করাকরি কি মা। সময় তো হয়ে এসেছে। এবার যেতে পারলেই তো রক্ষা পাই!

চারু করুণ সুরে বলিয়া উঠিল—ও কথা বল্লে আমার যে বড় কষ্ট হয় মা!

সস্নেহে পুত্রবধূর মুখের দিকে চাহিয়া হরিভাবিনী কহিলেন—আচ্ছা, তাহলে না নয় বলবো না।····তারপর খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—এখনই কি স্বপ্ন দেখছিলুম শুনবে মা? তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্লেন—অনেক দিন অপেক্ষা করে আছি—আর থাকিতে পারিনে যে! কাজ কি তোমার ফুরায় না? আমি বল্লুম—আমার কাজ ফুরিয়েছে অনেক দিন, শুধু বউমার জন্য—। তিনি হেসে বল্লেন—বউমা আমাদের লক্ষ্মীর অংশ তাঁর জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

তাঁর কথাগুলি যেন এখনও আমার কানে বাজছে।……এই বলিয়া তিনি পুনরায় চক্ষু মুদিত করিলেন।

রোগে ভুগিতে ভুগিতে হরিভাবিনী একেবারে শয্যাশায়ী হইয়াছেন তাঁহার উঠিবার শক্তিও লোপ পাইয়াছে। কয়েকদিন হইল বুকে সর্দ্দি বসিয়াছে, কবিরাজ ডাক্তার যাঁহারা গ্রামে ছিলেন সবাই দেখিয়া বলিয়াছেন ঔষধে আর কিছু হইবে না, তবে বুড়ো হাড়ে ভুগিয়া ভুগিয়া যদি বাঁচিয়া ওঠেন, ভাল—না হইলে, আর কোনও উপায় নাই। চারু বুঝিয়াছিল শ্বাশুড়ীর জীবনের কোনও আশা নাই। এই সংসারে তাহাকে একাকী ফেলিয়া তিনি অতি শীঘ্রই মহাপ্রস্থান করিবেন। তাঁহার বিরহদগ্ধ প্রাণ এইবার স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া সান্ত্বনা পাইবে। কিন্তু এত শীঘ্রই হয়তো তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইত না। একমাত্র পুত্রের অবহেলা, কুব্যবহার তাঁহাকে অতিক্রত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। শ্বাশুড়ী তো চলিলেন—কিন্তু এই মহাসমুদ্রে কি অবলম্বন করিয়া সে থাকিবে? স্বামী থাকিয়াও নাই! তাহার স্নেহপ্রেম বলিয়া যে কিছুই নাই তাহা সে বুঝিয়াছে। তাহার চরিত্রও যে কিরূপ তাহাও আর তাহার কাছে গোপন নাই। দুই দুইটিবার সে সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছে কিন্তু দুইবারই শুধু তাহাকে সন্তান ধারণের কষ্টটুকু প্রদান করিয়া অকালে তাহারা চলিয়া গিয়াছে। এবার শ্বাশুড়ী কত আশা করিয়াছিলেন কিন্তু আট মাসে তাহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যখন সাত দিনের অধিক বাঁচিল না, তখনই তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। এই সন্তানটি সর্ব্বাঙ্গে গলিত ক্ষত লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল। এতদিন যাহা মনের মাঝে শুধু সন্দেহের সৃষ্টি করিত এখন তাহা স্বচ্ছ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। স্বামী বড় বড় কথার পশ্চাতে তাহার চরিত্রের যেটুকু গুপ্ত রাখিয়াছিল—এখন তাহা অনাবৃত নগ্ন হইয়া গিয়াছে। অপমানের গুরুভারে চারু একেবারে

নত হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীর অবহেলা সে সহ্য করিয়াছে, নিজের দারিদ্র্য দুঃখকে সে গ্রাহ্য করে না, এমন কি সন্তান গিয়াছে তাহাতেও তাহার দুঃখ নাই—কিন্তু এই গৌরবময়ী তেজস্বী তরুণীর এই কথাটাই কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল—কিসের মুখোস পরিয়া স্বামী তাহাকে ভুলাইয়াছিল! নারীর হৃদয় দান করা অসম্ভব নয়, হৃদয় দান করিয়া সে ঠকিতেও প্রস্তুত কিন্তু যখন সে বুঝিতে পারে শুধু ছলনায় ভুলাইয়া পুরুষ তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছে তখন আর তাহার লজ্জার সীমা থাকে না। সে নিজের মনে নিজেই দগ্ধ হইতে লাগিল। শুধু শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে সমস্তই নীরবে সহ্য করিত। মনে করিত—এই বৃদ্ধা জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া যে ব্যথা অনুভব করিতেছেন সত্যই তাহার তুলনা নাই। তাঁহার দুঃখের নিকট চারুর নিজের দুঃখ নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত।

যতীন চলিয়া যাইবার পর আর একটিবারও হরিভাবিনী তাহার নাম মুখে আনেন নাই। কিন্তু বুকে যে তাঁহার কি ব্যথা তাহা চারু মনে মনে অনুভব করিত। যখন চারু বুঝিল হরিভাবিনীর জীবনের আশা নাই, তখনই সে তাহাকে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল যে যদি তাহার মাকে শেষ দেখা দেখতে চায় এখন একবার আসিতে পারে। সে আজ সাত দিনের কথা। কিন্তু যতীন আসিল না!

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া হরিভাবিনী বলিলেন—সন্ধ্যে কি হয়ে গেছে বৌমা?

চারু তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। এখন শরীরটা একটু ভাল বোধ হচ্ছে নাকি?

হরিভাবিনী চোখ মুদিত করিয়াই কহিলেন—কৈ শরীরের কোনও যন্ত্রণাই এখন তো বোধ করছি নে মা! আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া

তিনি বলিলেন—বউমা, যতীন আর আসবে না! তাঁহার চোখের দুই প্রান্ত দিয়া দুই ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল।

চারু অঞ্চল দিয়া তাহা মুছাইয়া নিজের উদ্গত অশ্রু নিরোধ করিয়া কহিল—আসবেন বৈকি মা। আপনি ভাল হয়ে উঠুন।

অনেকদিন পর আজ সন্তানের খোঁজ তিনি যে কেন করিতেছেন চারু বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

হরিভাবিনী আবার একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিলেন—এর পর এলে তো আমার সাথে আর দেখা হবে না মা। যদি আমি চলে যাবার পর সে আসে, তাকে বলো আমি তাকে সর্ব্বান্তকরণে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি।

চারুর চোখের জল সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দেখিল—গোপাল মণ্ডল তার পুত্র গোবরাকে লইয়া আসিতেছে। চারু চোখ মুছিয়া গোপালকে কহিল—গোপাল, একবার চট করে কবরেজ মশায়কে ডেকে আনতো। মা যেন কেমন করছেন। গোবরা, তুমি এখানেই থাক।

গোপাল কবিরাজের বাড়ী ছুটিল। চারু ঘরে ফিরিতেই হরিভাবিনী চোখ খুলিয়া কহিলেন—কোথায় গিয়েছিলে মা? গোপাল এসেছে?

চারু কহিল—এই এলো। তাকে কবরেজ মশায়ের কাছে পাঠিয়েছি।

আর কবরেজ আমার কি করবে মা! তার চেয়ে গ্রামের পাঁচজনকে ডেকে পাঠানোই তো ভাল। তুমি একা ছেলেমানুষ কি বিপদেই যে আমি ফেলেছি!

চারু এ ইঙ্গিত বুঝিল—কিন্তু কোনও উত্তর না দিয়া তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। হরিভাবিনী পুনরায় তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর কবিরাজ আসিলেন, তিনি হাত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন নাড়ীর গতি অতি খারাপ। গোপাল মণ্ডল ও তাহার প্রতিবেশী

সবাই বারান্দায় বসিয়া রহিল। রাত্রিটা কোনও রকমে কাটিল। ভোরবেলায় হরিভাবিনীর জ্ঞান হইল, তিনি শোকপরায়ণা পুত্রবধূর মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর স্বামীর চরণ ধ্যান করিতে করিতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। চারু নিস্তব্ধ হইয়া রহিল কিন্তু গোপাল মণ্ডল ও অন্যান্য লোক হা-হুতাশ করিয়া পল্লী চমকিত করিয়া তুলিল।

মানুষের যখন পতন আরম্ভ হয় তখন কোথা হইতে তাহা সুরু হইল এবং কোথায় গিয়া শেষ হইবে কিছুই তাহার চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর থাকে না। অরুণ দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধীরে ধীরে অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌছিয়া গেল। তাহার প্রতিদিন মণিমালিনীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়া চাই—হয় তাহার বাড়ীতে না হয় থিয়েটারে। যেখানে হউক তাহাকে দেখিতে না পাইলে তাহার মন ছটফট করে। প্রতুল গাঙ্গুলী তাহাকে অত্যন্ত খাতির করে, লিলি থিয়েটারের সে একজন পৃষ্ঠপোষক। ইহার উন্নতির জন্য অরুণ কিছু টাকা দিবে বলিয়াও প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

অথচ সে যে মাঝে মাঝে এই অধঃপতন হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা না করিয়াছে তাহা নয়। কিন্তু মনের সহিত সমস্ত সংগ্রাম বৃথা হইয়াছে মণিমালিনীর আকর্ষণ ছিন্ন করিতে সে সক্ষম হয় নাই। এ যেন হাত-পা বাঁধা বন্দীর মুক্তির প্রয়াস—এ যেন পর্ব্বত চুড়া হইতে স্খলিত পদ মুমূর্ষ লোকের উঠিয়া দাঁড়াইবার নিষ্ফল চেষ্টা।

কিন্তু একদিন একটি ধাক্কা খাইয়া তাহার মনের গতি ফিরিতে চাহিল। মনমোহিনী জানাইয়াছেন সহসা গৌরীর পিতা হরনাথ চক্রবর্ত্তী হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রোধ হওয়ায় মারা গিয়াছেন। তাহার পত্নী সুলোচনা দেবীও এ আঘাত সহ্য করিতে পারেন নাই স্বামীর মৃত্যুর তিন দিন পর তিনিও এই

ধরা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। গৌরী শোকে অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে, মনমোহিনী তাহাকে তাঁহাদের বাড়ী লইয়া আসিয়াছেন।

এই সংবাদে অরুণের মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। গৌরীর তো তাহা হইলে কষ্টের সীমা নাই! তাহার কোমল প্রাণে একসঙ্গে পিতা-মাতার অভাবের বেদনা যে কি নিদারুণ ভাবে বাজিয়াছে—তাহা সে মনে মনেই অনুভব করিল। গৌরীর বিবাহ দিবেন বলিয়া তাহার পিতামাতা কত আশা করিয়াছিলেন যে! মানুষের আশার কি এইরূপেই চিরসমাধি হইয়া যায়!

সেদিন অরুণ গৌরীর কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—সে যে অধঃপতনের যাত্রা সুরু করিয়াছে, এই গৌরীই তাহাকে সে পথ হইতে ফিরাইতে পারে। তাহার সুন্দর পবিত্র মুখখানি তাহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিল। সে বুঝিয়াছিল আর কিছুদিন কলিকাতায় থাকিলে আর তাহার পরিত্রাণের উপায় থাকিবে না। এখানকার সমস্ত প্রলোভন পশ্চাতে ফেলিয়া মায়ের কাছে, তাহার ভাবী বধূর কাছে যদি সে চলিয়া যায়—তাহা হইলে হয়ত মণিমালিনীকে ভুলিয়া যাওয়া কঠিন হইবে না।

মণিমালিনীকে অরুণ সত্যই ভালবাসিয়াছে, তাহার তরুণ যৌবন মণিমালিনীর উগ্ররূপ শিখা দেখিয়া মোহিত না হইয়া পারে নাই। তাহার ছলা কথা, তাহার বাকচাতুর্য্য, তাহার ভালবাসা নিবেদন —অরুণের মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মিলন যে অতি অস্বাভাবিক সমাজে অচল তাহাও যে জানিত। তাহার ভাল-বাসার এই ঘূর্ণী হইতে উদ্ধার চাহিলে এ স্থান পরিত্যাগ ভিন্ন উপায় নাই। এখান হইতে দূরে সরিয়া গেলে, সে ধীরে ধীরে মণিমালিনীর কথা ভুলিবে এবং তাহার অধঃপতনের ইতিহাসও অপ্রকাশিত থাকিবে।

সে একেবারে মনস্থির করিয়া সেই দিনই পত্র লিখিয়া দিল যে গৌরীর পিতার মাতার মৃত্যু সংবাদে সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছে। এবং আরও জানাইল যে ছুটির পর এখানে আসিয়া তাহার শরীর ভাল নাই—সুতরাং সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মায়ের নিকট যাইতে চায়।

মনমোহিনী চিঠিখানি পড়িয়া মনে মনেই হাসিলেন। মনে করিলেন—গৌরীর জন্য অরুণের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্যই তাহার বাড়ী আসিবার এই প্রস্তাব। গৌরী, তাঁহার ভাবী পুত্রবধূ—সুতরাং সে যে অরুণকে মুগ্ধ করিয়াছে ইহাতে তিনি আনন্দিতই হইলেন। কিন্তু সে পড়া ছাড়িয়া এই অসময়ে চলিয়া আসিবে ইহাও তাঁহার নিকট ভাল বোধ হইল না। তিনি লিখিয়াদিলেন—তাহার এখন আসিবার আবশ্যক নাই। গৌরী এখন সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। অরুণের একেবারে পূজার ছুটিতে আসিলেই চলিবে।

অরুণ পত্র পাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মনের ভাব তাহার মা বুঝিতে পারেন নাই। কি দ্বন্দ্ব লইয়া যে তাহার দিন কাটিতেছে—তাহা সে ভিন্ন আর কে অবগত আছে। কিন্তু বুঝিবা আর উপায় নাই—অধঃপতনই তাহার বিধিলিপি! জননীকে চিঠিখানি লিখিয়া দিয়া অতিকষ্টে অরুণ এ কয়দিন মণিমালিনীর নিকট যাইবার বাসনা রোধ করিয়াছিল—কিন্তু আজ সেই চিঠির উত্তর পাইয়া পুনরায় তাহারই নিকট যাইবার জন্য তাহার মন উসখুস করিতে লাগিল।

সে সাজ গোজ করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় যতীন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুণ্ডিত মস্তক, কামানো গোঁপদাড়ি দেখিয়া অরুণ বলিয়া উঠিল—যতীনবাবু যে! মাথাটাকে এমন ন্যাড়া বেল করে তুলেছেন কেন?

যতীনের মুখ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কহিল, 'মা মারা গেছেন কিনা!

অরুণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া কহিল—তাই নাকি? তাহলে আপনি বাড়ীতেই ছিলেন বলুন!

—না। মায়ের শেষ সময় আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। তিনি দু'মাস আগে গত হয়েছেন—তবু আমি মাত্র পরশু এখানে এসে জানতে পেরেছি।

অরুণ বিস্মিত হইয়া কহিল — সে কি! খবরটা পর্য্যন্ত জানতে পারেন নি?

ম্লান হাসিয়া যতীন কহিল—এতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি অরুণ বাবু! দেশের কাজে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ালুম—মায়ের শক্ত অসুখের কথা কানেই পৌঁছলো না। একটা কর্ত্তব্য করতে গিয়ে আর একটায় বাধা পড়লো। তবু আমি দুঃখু করিনে—ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হয়েছে। তবে জানেন তো মানুষের মন—ব্যথা তার যাবে কোথায়? মায়ের মৃত্যু আমার পক্ষে যে কি ব্যাপার সে শুধু আমিই জানি।......এই বলিয়া সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। এই সদ্য মাতৃহীনের কথায় অরুণের মনও ব্যথায় পীড়িত হইয়া উঠিল।

যতীন বলতে লাগিল—আমি মায়ের একমাত্র সন্তান। সুতরাং শেষ সময়ে আমাকে দেখতে পেলেন না—এ যে তাঁর বুকে কতখানি বেদনা দিয়েছে—এতো আমি বেশ অনুভব করছি। কিন্তু ভগবানের এই বুঝি ইচ্ছা ছিল—নইলে মহিলা আশ্রম স্থাপন করবার সংকল্প এই সময়ই আমার মাথায় গজিয়ে উঠবে কেন! এই কাজে অজস্র টাকার প্রয়োজন—সেতো আর একদিনে সম্ভব নয়। তাই বেরিয়েছিলুম—ভিক্ষার ঝুলি হাতে, দেশের ধনী দরিদ্রের কাছে। তাদের মনে করুণা জাগিয়ে যদি অন্ততঃ পঁচিশ হাজার টাকাও আপাততঃ সংগ্রহ করতে পারি—তাহলে কাজ আরম্ভ কর' যায়।'

অরুণ কহিল—কাজে কতদূর সফল হলেন ?

—সফল কিছু কিছু হয়েছে বটে কিন্তু তেমন নয়। এদেশের লোককে জাগাতে এখনও দেরী আছে। নইলে এখন এই সব ব্যাপার ও কূট-তর্ক দিয়ে বিচার করতে যায়। একটা পয়সা দিতে হলেই নানা জিজ্ঞাসাবাদ—যেন তাদের ফাঁকি দেওয়ার জন্তই আ... ষড়যন্ত্র করেছি।

তাহার কথার ঝাঁঝ দেখিয়া অরুণ হাসিয়া কহিল—জিজ্ঞাসাবাদ, কূটতর্ক করেও যদি কিছু দেয় তবু ভাল। কিন্তু যারা তর্ক করে—ফাঁকিও আবার তারাই দেয়। শুধু সময় অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

যতীন কহিল—ঠিক ধরেছেন আপনি। তবু আমি দমিনি। হাজার পনের উঠেছে—আরও পাঁচ হাজারের প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। এখন কাজে আরম্ভ করতে পাঁচটি হাজার বাকি। এই টাকা কিন্তু আপনাকে দিতে আমি অনুরোধ কর্‌ছি। অবশ্য এ আশ্রমের উদ্দেশ্য কি তাও আপনাকে বলি। দেশের অভাগিনী নারীরা এই আশ্রমে স্থান পাবে। অনেক স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পড়ে পদস্খলন হয় কিন্তু অবশেষে তারা ফিরতে চাইলেও আর সৎআশ্রয় পায় না। আমার এই আশ্রম সেই অপমানিতা, নির্য্যাতিতা, ধর্ষিতা আশ্রয়হীনা রমণীদের আশ্রয় দেবে। যুবকসমিতি প্রতিষ্ঠানের পর থেকে এমন অনেক ঘটনা চোখে পড়েছে যে শুধু আশ্রমের অভাবে অনেক স্ত্রীলোক পাপের পথ ত্যাগ করতে পারেনি। আমার এই আশ্রম সেই অভাব পূরণ করবে। এখানে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। যাদের সমাজ ঘৃণ্য বলে পরিত্যাগ করেছিল—আমি দেখিয়ে দেব—তারাই সমাজের কত বড় প্রয়োজনীয় অংশ। আপনি কি একাজ সমর্থন করেন না ?

অরুণ সহাস্যে জবাব দিল—খুবই সমর্থন করি। আমার এতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

যতীনও হাসিতে হাসিতে কহিল—তাহলেই হলো। আপনাদের মত লোকের সহানুভূতি পেলে আর আমার ভয় নাই। বেশ তারপর মণিমালিনীর খবর কি?

অরুণের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ভুলিয়া গিয়াছিল—যুবক সমিতির অধ্যক্ষ যতীন মুখার্জ্জি তাহাকে যে কাজের ভার দিয়া গিয়াছিল এখনই তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। কিন্তু সে জবাব দিবে কি বলিয়া? কি করিয়া সে বলিবে — যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সে নিযুক্ত হইয়াছিল — তাহারই সে ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে? কোথায় গেল তাহার চরিত্র গৌরব? সে অরুণ কিছুদিন পূর্ব্বেও থিয়েটার দেখিতে আপত্তি করিয়াছিল—সেই আজ কি করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিবে যে থিয়েটারের অভিনেত্রী লইয়া সে মজিয়াছে!

যতীন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিল—আপনার কিসের এত সঙ্কোচ অরুণবাবু? আমি প্রতুলের কাছে কাল সব কথাই শুনেছি কিনা! আপনি বিশ্বাস করুন আমি এতে সন্তুষ্টই হয়েছি।

বিস্মিত হইয়া অরুণ কহিল—সন্তুষ্ট হয়েছেন? আপনি কি বলছেন যতীনবাবু?

—আমি মিছে বলিনি। প্রেমহীনা রমণীর মনে প্রাণে প্রণয়ের শিখা জ্বালাতে পারলেই তো তাকে উদ্ধার করা হ'লো, অরুণবাবু! আপনি সেদিক দিয়ে তো কোনও ত্রুটি করেন নি।

অরুণ বুঝিতে পারিল না—একি প্রকাশ্য ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অথবা ইহাই তাহার মনের কথা!

যতীন পুনশ্চ বলিতে লাগিল—যে নারী কখনও কাউকে ভালবাসেনি বা ভালবাসতে পারেনি—সেই তো সমাজের বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। একবার যদি তার মনের কোণে প্রণয়ের অগ্নি জ্বলে ওঠে তাহলে তার মনের ময়লা,

আবর্জ্জনা, পাপ সব পুড়ে গিয়ে সে একেবারে পাকা সোনার মত উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় হয়ে ওঠে। তখন তাকে দিয়ে সমাজের মঙ্গল ছাড়া আর অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না। যখন প্রতুলের কাছে সব কথা শুনলাম মনের ভিতর কেমন খচখচ করতে লাগলো। এই নিয়ে নিজের মনেই আলোচনা করতে করতে এক অপূর্ব্ব তত্ত্ব মনের মাঝে খেলে গেল। ভাবলুম—ভগবান কি দিয়ে কখন যে মানুষের ভুল ভেঙ্গে দেন তা বুঝে ওঠা যায় না। এতদিন ভেবে এসেছি—কুলত্যাগিনী রমনীর স্বামীর গৃহে ফিরে যাওয়াই বুঝি পরম কামনার বস্তু। কিন্তু এই সত্য ঝোঁকের মাথায় আমরা ভেবে দেখেনি—স্বামীকে যে ভাল না বেসেছে—সে তারই কাছে ফিরে গেলে কি উপকার হবে! প্রথম দিন মণিমালিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে আপনি অনেকটা এমনি কথাই বলেছিলেন—কিন্তু আমি তা গ্রাহ্য করি নি। যাক্, মণিমালিনীর সম্বন্ধে এর চেয়ে যে ভাল ব্যবস্থা হতে পারে না এ আপনি বিশ্বাস করুন। আর স্বামী তাকে সত্যই ভালবাসতো কিনা জানিনে কিন্তু একথা ঠিক যে মণিমালিনী তাকে কিছুতেই ভালবাসতো না। সুতরাং জোর করে যদি আপনি তাকে পাঠাতেনও ফল কিছুই হতো না। হয় তো বা আর কোনও বিপত্তি ঘটে যেত। কিন্তু এখন আর তাকে দিয়ে কোনও অপকারের সম্ভাবনা নাই কারণ সে ভালবাসার অমৃত পান করেছে। যে স্বামীকে ভালবাসেনি, যার সাথে গৃহত্যাগ করেছিল তাকে ভালবাসেনি, যে অগণিত লোক তার ... প্রেম নিবেদন করে এসেছে, তাদের ভালবাসেনি—সে এক মুহূর্ত্তও আপনাকে দেখবা মাত্রই——, সত্যি, এর চেয়ে আর বিস্ময়ের বস্তু কি আছে! সত্যি প্রেমের ফুল যে কার পরশে ফুটে উঠবে এ কেউ বলতে পারে না। এইজন্যই তো আমাদের সমাজে চলিত বিবাহ বন্ধনে, পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনে এত বিড়ম্বনা। এ নিয়ম ভাঙ্গতেই হবে অরুণবাবু। প্রকৃত মিলনকামী

আমরা, ও সব ধার করা মনের মিলে আমাদের তৃপ্তি হবে না। আজ এখানেই থাক, আর একদিন এই নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করবো। আমার মহিলা আশ্রম এ বিষয়ে একটা নতুন আলো সমাজে দান করবে।

এই বলিয়া সে যাইবার জন্য উঠিল। অরুণ বুঝিতে পারিল, যতীন যে অনর্গল বকিয়া গেল—ইহা তাহাকে কিছু না বলিতে দিবার জন্যই। আর কিই বা তাহার বলিবার আছে!

যতীন ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছিল, পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল—হ্যা, একটা কথা। গোটা পঁচিশেক টাকা ধার দিতে পারেন? ক'মাস ঘুরে ঘুরে তো একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়েছি। অবিশ্যি হাজার পনরো হাতেই আছে—কিন্তু তার এক কাণাকড়িও নিজের জন্য ব্যয় করতে হাত ওঠে না অরুণবাবু! না খেয়ে যদি মরি, তবুও নয়।

অরুণ বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া দিল। যতীন ধন্যবাদ জানাইয়া, শীঘ্রই আবার আসিতেছে কথা দিয়া এবং পুনরায় নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

পূজার আর পাঁচ দিন বাকি। জমিদার বাড়ীতে আয়োজনের ধুম পড়িয়াছে। পূজার কয়দিন গ্রামের সমস্ত প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে এখানেই প্রসাদ পায়। গ্রামের কাহারও বাড়ীতে একরূপ হাঁড়ি চড়ে না।

মনমোহিনীর বিশ্রাম ছিল না। তিনি সমস্ত কার্য্যের তদারক করিতেছিলেন, গৌরীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক পূজার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে জমিদার বাড়ীতে কাজে লাগে। কেহ চাল বাছিতেছে, কেহ ডাল ঝাড়িতেছে, কেহ ভাঁড়ার সাজাইতেছে, কেহ মশলাপাতি ঝাড়িয়া বাছিয়া রাখিতেছে। কাজের মধ্যেই তাহারা পরস্পর সুখদুঃখের কাহিনী বলিয়া যাইতেছে। মনমোহিনী হাসিমুখে সকলকে কাজ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন।

এত কাজ কর্ম্মের মধ্যে মনমোহিনীর প্রাণটি পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়াছিল। অরুণ যে সমস্ত জিনিষ খাইতে ভালবাসে, পূর্ব্বে মনমোহিনী নিজহস্তে সেইগুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। সেদিন তিনি ক্ষীরের তক্তি, মগধের নাড়ু, তিলের খাজা, নারকেলের সন্দেশ প্রভৃতি নিজহস্তে প্রস্তুত করিতেছিলেন, গৌরী নিকটে বসিয়া জোগাড় দিতেছিল। মায়ের হাতে তৈয়ারী এই সব অতি সাধারণ খাদ্য খাইতে যে সে কত ভালবাসে—মনমোহিনী তাহাই গৌরীকে বলিতেছিলেন। অতীতের অনেক

ক্ষুদ্রতম ঘটনা বলিতে বলিতে পুত্রগর্বে জননীর হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিতেছিলেন—এইবার তো আমি বুড়ো হয়ে পড়েছি মা, তুমি এখন দেখেশুনে ভার বুঝে নাও। এর পরতো তোমাকেই সব করতে হবে!···গৌরী মুখ লজ্জায় নত করিল।

মনমোহিনী তাহার লজ্জায় রাঙ্গা মুখখানির দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—এতে আর লজ্জার কথা কি গৌরী! অরুণের ভার তোমার উপর ন্যস্ত করে যেদিন তোমাদের ঘরকন্না নীরবে বসে দেখতে পাব—সেইদিনের অপেক্ষাই তো করে আছি মা!···গৌরী যেন লজ্জায় আরও একটু জড়সড় হইয়া পড়িল।

আরও কিছুক্ষণ পরে মনমোহিনী বলিলেন—অরুণ বোধ হয় আজ কি কালের মধ্যেই এসে পড়বে, কি বল? খাবারটাবারগুলো আর নষ্ট হবে না। যদি দু'একদিন দেরী করে তাহলে ক্ষীরের তক্‌থিটা একটু খারাপ হয়ে যেতে পারে। আর দেরীই বা করবে কেন। ছুটি তো এরই মধ্যে হয়ে যাবে। আগে থেকে না করলে—অরুণ আবার রাগ করে বসবে। বাড়ীতে আসবার পরই তো তার মায়ের হাতের খাবার চাই-ই-চাই!

গৌরী পুলকিতচিত্তে মনমোহিনীর কথাগুলি শুনিতেছিল। এই স্নেহশীলা রমণীর পুত্রের প্রতি মমতা যে কত গভীর তাহার পরিচয় সে প্রতিক্ষণেই পাইত। আর গৌরীর প্রতিও কি অপর্যাপ্ত স্নেহ তাঁহার!

মনমোহিনী বলিলেন—অরুণের কদিন চিঠি পাওয়া যায়নি গৌরী?

গৌরী মৃদুস্বরে কহিল—দিন দশেক হবে।

মনমোহিনী একটু ভাবিয়া কহিলেন—তাই তো! এত দেরী তো সে কোনও দিন করে না।

কিন্তু তাঁহার আর প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে হইল না, সেই দিনই অরুণের পত্র আসিল—সে এবার বাড়ী আসিবে না।

পত্র পাইয়া মনমোহিনী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—তাঁহার সমস্ত উৎসাহ, আনন্দ একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। পড়াশুনায় তাহার এত আগ্রহ হইল কবে হইতে? বারমাস সে বাড়ীছাড়া অন্ততঃ একটি সপ্তাহের জন্যও কি আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইতে পারিত না? তাঁহার বক্ষভেদ করিয়া একটি উত্তপ্ত নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। তিনি চিঠিখানি হাতে লইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

গৌরী আসিয়া কহিল—ও কার চিঠি মা? ম্লান হাসিয়া মনমোহিনী কহিলেন—অরুণ লিখেছে। সে এবার ছুটিতে আসবে না।

গৌরীর বুক যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল, চোখও ছলছল করিতে লাগিল বোধ হয়। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনমোহিনী বলিলেন—নিশ্চয় সে আমার ওপর রাগ করেছে গৌরী। সেবার সে পড়া ছেড়ে এখানে আসতে চেয়েছিল—আমি নিষেধ করেছিলাম, তাই সে অভিমান করেছে। আরে অবোধ ছেলে, মা কি এটুকুও ধরতে পারে না মনে করিস! মায়ের কাছে তোর অভিমান কতদিন থাকবে রে পাগ

গৌরী ধীরপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। মোহিনী বুঝিলেন—অরুণ আসিবে না শুনিয়া গৌরীরও মন খারা ইয়া গিয়াছে। তিনি মনে মনে হাসিলেন। তবু তো বিবাহ হয় নাই।

মনমোহিনী ভাবিতে লাগিলেন হয়তো তিনিই অন্যায় করিতেছেন। অরুণ বয়স্থ যুবক, গৌরীও যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। তাহারা যে পরস্পরকে ভালবাসে ইহার প্রমান তিনি অনেক পাইয়াছেন। শুধু তাহাদের বিবাহই হয় নাই কিন্তু মনের আদান-প্রদান পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যখন ঘটনাচক্রে গৌরীকে তাহাদের আশ্রয়ে থাকিতে হইতেছে

তখন আর দীর্ঘদিন বিবাহ না দেওয়া বোধ হয় ঠিক হইবে না। ইহার চেয়ে শীঘ্রই শুভকার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলেই গোল চুকিয়া যায়। গৌরীর এখানে আসিবার সংবাদ পাইয়া অরুণের বাড়ীতে চলিয়া আসিবার ব্যগ্রতার কারণ তিনি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহা হয়ত সেও বুঝিতে পারিয়াছে। তাই স্বেচ্ছায় অভিমানে এবার বাড়ী আসিতে চায় নাই। তিনি এবার সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

মনমোহিনী অবিলম্বে দেওয়ানজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বৃদ্ধ দেওয়ানজি আসিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন অরুণের চিঠি আজ পেলাম।

বৃদ্ধ কহিলেন—তিনি কবে আসছেন মা ?

– সে ছুটিতে আসবে না লিখেছে যে !

বৃদ্ধ কি যেন একটু ভাবিয়া বলিলেন - কেন আসবেন না মা ?

—তার নাকি পড়ার ব্যাঘাত হবে, এখানে এলে।

দেওয়ানজী মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

মনমোহিনী বলিতে লাগিলেন — কিছুদিন আগে সে একেবার বাড়ী আসবে বলে লিখেছিল, আমি নিষেধ করেছিলাম। তাই বুঝি অভিমান করেছে অরুণ !

দেওয়ানজী তবু কোনও উত্তর দিলেন না। অরুণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা তাঁহার পূর্ব্বেই কানে গিয়াছিল কিন্তু তাহা বিশ্বাস করেন নাই। সেই কথাগুলি এই সময় তাঁহার মনে পড়িল।

মনমোহিনী হাসিয়া কহিলেন—অভিমান তার কিসের জন্য সেও আমি বুঝতে পেরেছি। আজই আপনি ভট্‌চাজ মশায়কে ডেকে পাঠান অগ্রাণের মধ্যেই একটা দিন ঠিক করে –

দেওয়ানজী উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন— সেই ভাল মা। আজই

ডেকে পাঠাব। বউরাণী তো ঘরেই এসেছেন আর শুভকাজ ফেলে রাখাটা তেমন ভাল দেখায় না।

—আমিও সেই কথাই ভেবে দেখলাম দেওয়ানজী, অরুণ এখন না আসে নাই এলো। মাঝে কার্ত্তিক মাসটা তারপর অগ্রাণের প্রথমেই তো আসতে হবে। না হয় এ কটা দিন কলকাতা থেকেই পড়াশোনা করুক।

দেওয়ানজী প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, মনমোহিনী তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন—আর দেখুন, আপনি না হয় কাউকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিন। সে দেখে আসুক ছেলে আমার কেমন আছে।

দেওয়ানজী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিল। মনমোহিনী গৌরীকে ডাকিলেন। গৌরী সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বসিল। সস্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন — অ... এলো না দেখে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে গৌরী মা?

গৌরী লজ্জায় আরক্ত হইয়া কহিল—আমার কেন কষ্ট হতে যাবে, বাঃ! পরম আদরে গৌরীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মনমোহিনী তাহার মস্তক চুম্বন করিলেন, মনে মনে কহিলেন—তোমরা বেড়াও ডালে ডালে আর আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। দাঁড়াও, দুজনকেই এবার জব্দ করছি।

যথাসময়ে পূজা আসিল। চারদিন জমিদার ...হে উৎসাহের আর অবধি রহিল না। মনমোহিনী সমস্ত কার্য্যই সমা... ...রিলেন কিন্তু পুত্রের জন্য মনটা অনুক্ষণ খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। স...লেই শুনিয়া গেল— আ... একটি মহৎ উৎসবে শীঘ্রই তাহাদের যোগদান করিতে হইবে।

যে লোকটি কলিকাতায় গিয়াছিল যথাসময়ে সে ফিরিয়া আসিল তাহার মুখে দেওয়ানজী সমস্ত কথাই শুনিলেন। কলিকাতার বাসা সরকার পূর্ব্বেই গোপনে তাঁহাকে দুই এক কথা জানাইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা বিশ্বাস করেন নাই। এবার আর অবিশ্বাসের উপায় রহিল না

কিন্তু কি করিয়া এই সমস্ত কথা তিনি মনমোহিনীকে জানাইবেন? অথচ না জানানোও ঠিক নয়—অন্ততঃ কিছু আভাস না নিলে হয়তো তাঁহার পুত্রের পক্ষেই অমঙ্গল হইবে।

কলিকাতা হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া মনমোহিনী দেওয়ান জীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন অরুণ ভাল আছে তো?

দেওয়ানজী কহিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একটু মোটা-সোটা হয়েছে না রোগা হয়েছে দেখে এল?

দেওয়ানজী অত কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন—আজ্ঞে, যেমন ছিলেন বোধ হয় তেমনি আছেন।

—পড়াশোনা করছে তো?

দেওয়ানজী বিব্রত হইয়া পড়িলেন তিনি উত্তর দিবেন কি? কিন্তু কিন্তু করিয়া কহিলেন—তা করছেন বৈকি কিছু কিছু। না করলে চলবে কেন।

মনমোহিনী হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা, আপনি ভাল করে জিজ্ঞাসা করে আমাকে বলবেন। এবার আসুন আপনি।

দেওয়ানজী দেখিল কিছুই বলা হইল না। কিন্তু কিছু না বলিলেও কর্ত্তব্যের হানি হইয়া যায়। তিনি মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। মনমোহিনী বুঝিতে পারিলেন তাঁহার আরও কিছু বলিবার আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আর কিছু বলতে চান?

—আজ্ঞে, অরুণবাবু দু'হাজার টাকা পাঠাতে বলেছেন।

মনমোহিনী সহাস্যে কহিলেন—এত টাকার তার হঠাৎ কিসের দরকার? কোনও সমিতি টমিতিতে চাঁদা দেবে বুঝি? পাগল ছেলে! ওকে ঠকিয়ে যে কত লোক নিচ্ছে আমি তাই ভাবি দেওয়ানজি। দানের নামে তো অরুণ একেবারে মুক্তহস্ত।

দেওয়ানজী কহিলেন—সেতো দেখতেই পাই। কিন্তু আজকাল তাঁর টাকার চার্জ্জ বড্ড বেড়ে গেছে। আপনাকে কিছু বলা হয় নি। গেল মাসেও আটশো টাকা—।

মনমোহিনী কি একটু ভাবিয়া বলিলেন—দরকার যদি হয় পাঠাতেই হবে। কিন্তু অত খরুচে হলেও চলবেনা। আমি তাকে লিখে দেব। আচ্ছা, আপনি আসুন।

দেওয়ানজী তবু গেলেন না। মনমোহিনী একটু বিরক্তি-বোধ করিয়া কহিলেন—আরও কিছু বলবার আছে আপনার?

দেওয়ানজী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন আজ্ঞে, অরুণবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা—।

মনমোহিনী একটু ধমক দিয়া কহিলেন — অমন একটু একটু করে না বলে পষ্টাপষ্টি খুলেই বলুন না।

—আজ্ঞে, তিনি নাকি বড্ড বেশী থিয়েটারে যান। কোন এক অভিনেত্রীর সঙ্গে নাকি তাঁর—।

অসহ্য ক্রোধে মনমোহিনীর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কটুকণ্ঠে কহিলেন — আপনি কাকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন?

ভীত হইয়া দেওয়ানজি বলিলেন—জমা সেরেস্তার ধীরেন দত্তকে।

—তাকে আজই বিদেয় করে দেবেন দুমাসের আগাম মাইনে দিয়ে।

অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া দেওয়ানজী বলিলেন কিন্তু তার কোনও—।

—কোনও কথা শুনতে চাইনে আমি। হুকুম মত যেন কাজ হয়।

হিতে বিপরীত হইল দেখিয়া দেওয়ানজী ক্ষুণ্ণমনে ফিরিলেন।

আবার কি যেন ভাবিয়া মনমোহিনী দেওয়ানজীকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন—আচ্ছা, তাকে এবারের মত ক্ষমা করলাম। কিন্তু নুণ খেয়ে নেমকহারামি যেন আর কেউ না করে এই কথা বলে সব্বাইকে

সাবধান করে দেবেন। জমিদার বাড়ীর অনেক কুৎসা একদিন হয়েছে কিন্তু মনে রাখবেন সেদিন আর নাই।...এই বলিয়া মনমোহিনী নিজেই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যে অন্তরে অন্তরে কিরূপ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন ইহাই মনে করিয়া প্রভুভক্ত বৃদ্ধ দেওয়ানজীর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

দিন দুই তিন অরুণ একেবারেই বাসায় ফিরিল না। যেদিন ফিরিল, দেখিতে পাইল—দেশ হইতে তাহার সংবাদ লইবার জন্য একজন কর্ম্মচারী দুই দিন বসিয়া আছে। অরুণ মনে মনে বিচলিত হইল—কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করিল না। শুধু কহিল—আপনি কেন এসেছেন ?

লোকটি কহিল—গিন্নিমা পাঠালেন। হুজুরের শরীর ভাল তো ?

—হ্যাঁ। বাড়ীর সব কেমন আছেন ?

লোকটি জানাইল—সবাই ভাল আছেন। তবে হুজুর বাড়ী না যাওয়ায় রাণীমা দুঃখিত হয়েছেন।

অরুণ বলিল—পড়াশুনা নিয়ে ভারী ব্যস্ত হয়ে আছি। এই দেখছেন না—কি বলে—দুদিন বাড়ীতেই আসতে পারিনি। ভারী শক্ত পরীক্ষে কিনা।

দুইদিন লোকটি বৃথাই বসিয়াছিল না। বাড়ীর সরকার, চাকর বামুন সকলেরই নিকটে তাদের মনিব সম্বন্ধে যথাযোগ্য সংবাদ লইয়াছে। সুতরাং অরুণের মিথ্যা কৈফিয়তে সে মনে মনে হাসিল, কিন্তু মুখে কহিল—আজ্ঞে, সেতো বটেই। তাহলে আজই আমি ফিরি। গিন্নিমাকে কি জানাবার আদেশ হয় ?

—বলবেন, আমি বেশ ভালই আছি। তিনি যেন কোনও চিন্তা না করেন।

লোকটি নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, অরুণ কহিল—হ্যাঁ, আর এক কথা। দেওয়ানজীকে বলে এক সপ্তাহের মধ্যে দু'হাজার টাকা আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। আর দেখুন, মাকে ঐ টাকার কথা জানাবার কোনও দরকার নাই। বুঝলেন না? আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

'যে আজ্ঞা'—বলিয়া লোকটি প্রস্থান করিল।

অরুণের মনে নানারূপ দুর্ভাবনা খেলিতে লাগিল। কে জানে, লোকটি সব ঠিক পাইয়াছে কিনা। বাড়ীতে গিয়া যদি সত্য কথা প্রকাশ করে তাহা হইলে মায়ের সম্মুখে কোনও দিনই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না যে। কিন্তু পরক্ষণেই অরুণের মন জননীর প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। নিশ্চয় তাহার চালচলন দেখিবার জন্যই মা এই গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সে তো এখন ছেলেমানুষ নয় আর এমন কিছু সে অন্যায়ও করে নাই। সে মনকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিল যে ভালবাসা মনের ধর্ম্ম। সে একজনকে ভালবাসিয়াছে মাত্র। ইহাতে তাহার অপরাধই বা হইল কোথায়। তাহার বিকার গ্রস্থ মন এই ভাবে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে একটা বিশেষ চাঞ্চল্য খেলিয়াই যাইতে লাগিল।

কয়েকদিন পর অরুণ একখানি বই লইয়া পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময় একটি লোক অতি ভক্তিভরে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। অরুণ বিস্মিত হইয়া কহিল—এ কি! বৃন্দাবন যে! কোথা থেকে?

হাতজোড় করিয়া বৃন্দাবন কহিল—বাড়ী থেকে হুজুর। না খেতে পেয়ে মরবার দাখিল হয়েছি। শ্রীচরণে স্থান না দিলে পাঁচ সাতটি ছেলে মেয়ে নিয়ে মারা যাই হুজুর।

বৃন্দাবন অরুণের পিতার অত্যন্ত পেয়ারের চাকর ছিল। তাঁহার

মৃত্যুর পর মনমোহিনী শ'খানেক টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া-ছিলেন—কয় বৎসর পর আবার তাহার এই আগমন!

তাহাকে দেখিয়া অরুণ সুখী হয় নাই, তাহার কথা শুনিয়া অরুণের ক্রোধের উদ্রেক হইল, কহিল — মা তোকে বিদায় করেছেন আর আমি তোকে আবার রাখতে পারি—এই বুঝি তোর বিশ্বাস?

—আজ্ঞে, হুজুর ইচ্ছা করলেই—

চোখ মুখ পাকাইয়া অরুণ বলিয়া উঠিল — মুখ সামলে কথা বল্। আমার মায়ের বিরুদ্ধে যাব আমি? হুজুর ইচ্ছে করলেই — সয়তান, পাজি! ওসব খোসামুদে কথা আমার কাছে চলবে না। দূর' হ' দূর হ' এখান থেকে। আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।

কাঁদিতে কাঁদিতে বৃন্দাবন কহিল—কিন্তু মারা যাই যে হুজুর! ছোটকাল থেকে হুজুরের অন্নে প্রতিপালন হয়ে এসেছি। রাণী মার দয়ার শরীর, তিনি দুঃখের কথা শুন্‌লে নিশ্চয়ই—।

অরুণ বলিয়া উঠিল — হাঁা, হ্যা—তাই বরং যা। মা যদি তোকে রাখেন আমার আপত্তি নাই।

যে আজ্ঞে, তাই যাব—এই বলিয়া অরুণে[illegible]য়ের ধুলা লইয়া প্রস্থান করিল।

দিন সাত আট পরে, পুনরায় বৃন্দাবন [illegible]া উপস্থিত। তাহার মুখের ভাব অতি বিষণ্ণ, দেখিয়াই মনে হয় তাহার কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই।

অরুণ কহিল—আবার এখানে কেন?

হাত জোড় করিয়া কাঁদো-কাঁদো সুরে বৃন্দাবন কহিল—মায়ের দয়া হ'লো না। এত হাতে পায়ে ধরলাম—তবু নয়। বরং তিনি অনেক কটুকাটব্য কথা—। সে এইবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অরুণ বিরক্ত হইয়া কহিল—নে, নে কান্না থামা। কি বল্লেন মা?

তেমনি হাতজোড় করিয়াই বৃন্দাবন বলিল—হুজুরই নাকি আমাকে দেশ থেকে আনিয়েছেন। হুজুরই নাকি উপদেশ দিকে আমাকে মার কাছে পাঠিয়েছিলেন। হুজুরের স্বভাব চরিত্তির—ওসব কথা আমার মুখ দিয়ে বের হবে না হুজুর।

ক্রোধে অরুণ জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল, ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া কহিল—মা বল্লেন আমিই উপদেশ দিয়ে তোকে—।

চোখ মুছিতে মুছিতে বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল—হুজুর।

—মা বল্লেন আমিই দেশ থেকে তোকে আনিয়ে—

বৃন্দাবন কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ! আমাকে নিজের কাজে লাগিয়ে শুধু ছল করে—

ধমক দিয়া অরুণ কহিল—চুপ চুপ! আর বলতে হবে না। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

অরুণ ভাবিল—মায়ের এত অবিশ্বাস! কেন? কিসের জন্য? সে অবিশ্বাসের মত কোন কাজ করিয়াছে? এমন মিথ্যা অপবাদের প্রয়োজন কি ছিল? তাহার মুখের উপর দিয়া ছায়ার মত নানা ভাব খেলিতে লাগিল—আর ধূর্ত্ত বৃন্দাবন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাই পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। অবশেষে বৃন্দাবন কহিল—আজ্ঞে, আমার প্রতি কি আদেশ হয়?

ভ্রুকুটি কুটিল নেত্রে অরুণ কহিল—আদেশ? এখনও আশা আছে তোর যে আমি চাকরি দেব? এখনই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও—আবি যাও!

উপায়ন্তর না দেখিয়া বৃন্দাবন ঘরের বাহির হইয়া গেল। অস্থির চিত্ত অরুণ ঘরের ভিতর দ্রুত পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার মনে উন্মত্ত ঝড়ের ন্যায় নানা চিন্তা এলোমেলো ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। সে সহসা ডাকিল—বেন্দা! বৃন্দাবন!

বৃন্দাবন বোধ হয় নিকটেই ছিল, ডাক শুনিয়া অরুণের সম্মুখে দাঁড়াইল।

অরুণ হাতে একখানি বেতের ছড়ি লইয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল—ছোটবেলায় একদিন তোকে মেরেছিলুম। মনে আছে ?

হাতের ছড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে বৃন্দাবন কহিল—হুজুর খুব মনে আছে।

ক্রূর হাসি হাসিয়া অরুণ কহিল—চাকরি কি নিতান্তই চাই তোর বেন্দা ?

—হুজুরের দয়া হলে গরীবের—

ধমক দিয়া অরুণ কহিল—বক্তৃতা রাখ। চাকরি চাইতো এই বেতের দশটি ঘা খেতে হবে। রাজি ?

—হুজুরের যদি তাই ইচ্ছে—।

কি এক অসহ্য ক্রোধে অরুণের সর্ব্ব দেহ জর্জ্জরিত হইতেছিল, হাত দুটি নিস্‌পিস্‌ করিতেছিল। ছড়ি উঠাইয়া কহিল—হ্যাঁ। এই আমার ইচ্ছে! এই বলিয়া সে নির্দ্দয় ভাবে তাহার গাত্রে আঘাত করিতে লাগিল। বৃন্দাবন নিশ্চলভাবে প্রহার সহ্য করিল। সাতটি আঘাত করিয়া অরুণ ছড়িখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিল—এইবার সম্মুখ থেকে চলে যা আমার। কাজে তোকে বহাল করলুম!

বৃন্দাবন তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া বেদম হাসিতে লাগিল, যেন হাসিতে হাসিতেই তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবে!

কিন্তু অরুণ রুদ্ধ আবেগে ছটফট করিতে লাগিল। বুক ঠেলিয়া তাহার কান্না বাহির হইতে চাহিতেছিল—কিন্তু চোখ দিয়া এক ফোটাও জল গড়াইল না। সে কেবলই ভাবিতেছিল—মায়ের এত অবিশ্বাস! আচ্ছা, তাহা হইলে সেও দেখিয়া লইবে!

সেদিন মনমোহিনী দেওয়ানজীর মুখে পুত্রের চরিত্রের আভাস পাইয়া যে কিরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কে বুঝিবে? অরুণ তাঁহার একমাত্র সন্তান অরুণ, জীবনের একমাত্র সুখ, একমাত্র সান্ত্বনা সেই অরুণ এমন হইবে? যে সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি স্বামীর দেওয়া অসহ্য অপমান নীরবে সহ্য করিয়াছেন, যাহাকে শৈশব হইতে সৎ শিক্ষায়, সৎ উপদেশ দিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন সেই অরুণ, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার ধন কি কখনও তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারে? না, না, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। ইহা তাহাদের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র, নিষ্ঠুর চক্রান্ত। তিনি এই অতি অবিশ্বাসযোগ্য কথা শুনিবামাত্রই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন এবং বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে লোকটি কলিকাতা গিয়াছিল, সেই কোনও কারণে জমিদার গৃহে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিতেছে। তাই তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যই মোহিনীর প্রথম আদেশ বাহির হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু ইহার পর যখন তিনি সমস্ত কথা ভাবিয়া দেখিতে লাগিলেন তখন মন তাঁহার আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সত্যই যদি অরুণ বিপথে গিয়া থাকে? ক্ষুদ্র একজন ভৃত্যের মনিব সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করিয়া লাভ কি? ইহাতে তাহার কি কার্য্যসিদ্ধি হইবে? কিন্তু অরুণ অসৎ হইয়া যাইবে মায়ের দেওয়া শিক্ষা মায়ের অনুশাসন এমনি ব্যর্থ হইবে ইহাই বা তিনি বিশ্বাস করেন কি করিয়া? অরুণ তাঁহার অতি বাধ্য শিক্ষিত সন্তান

না, না, কলঙ্ক তাহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, ইহা অসম্ভব। আর তাঁহার গর্ভে জন্মিয়া সে কি কখনও এমন হইতে পারে ?

কিন্তু সান্ত্বনা পাওয়া এত সহজ নয়। অরুণের কার্য্যকলাপ একটু ভাবিয়া দেখিলে সত্যই মনে খট্‌কা লাগে। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়া কেন সে পনরো দিন আগেই কলিকাতা গিয়াছিল। কেন আবার সে কলেজ ছাড়িয়া একেবারে চলিয়া আসিতে চাহিয়াছিল, কেনই বা পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিল না ! উপরন্তু তাহার টাকার চার্জ্জ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। এত টাকায় সে করে কি ?

অরুণ তাঁহার গর্ভে জন্মিয়াছে বটে, কিন্তু সে যে তাহার পিতারও সন্তান একথা তিনি ভুলিয়াগিয়াছেন কি করিয়া ? এত সাহস, এত অহঙ্কার পুত্রকে লইয়া তাঁহার কিসের জন্য ? এই কথা মনে পড়িবামাত্র তাঁহার মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাঁহার বিশ্বাস হইল—হয় তো, হয় তো কেন নিশ্চয়ই অরুণ বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছে,তাহার ফিরিবার উপায় আছে কিনা সন্দেহ।

পুত্র বিপথগামী হইয়া মাকে ভুলিবে এই কথা মনে পড়িতেই দুঃখে ক্ষোভে তাঁহার হৃদয় জ্বলিতে লাগিল। সত্যই যদি অরুণ এমনি হয় তাহা হইলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন কাহার মুখ চাহিয়া ? স্বামীর দেওয়া অপমান যাহাকে দেখিয়া তিনি সহ্য করিয়াছেন—সেই সন্তান যদি পুনরায় তাহাকে অপমান করিয়া বসে তাহা হইলে তাহার মুখ কোন দিনই দেখিতে পারিবেন না যে ! তবে কি স্বামীর মৃত্যুতেই তাঁহার সমস্ত লাঞ্ছনার অবসান হয় নাই—পুত্রের মধ্যেও অভিশাপ গুপ্ত হইয়া আছে ?

গৌরী নিকটে আসিয়া বসিল। মনমোহিনী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। বক্ষ ভেদ করিয়া এক উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল তাহারই শব্দে গৌরী চমকিত হইয়া উঠিল। সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি হয়েছে মা ?

মনমোহিনী গৌরীকে সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে বলিলেন—আমার মত তুইও কি তাহলে সারা জীবন জ্বলে মরবি মা? না, না,—সে কখনও হতে দেবনা আমি! তাহার চোখের জলে গৌরীর মস্তক ভিজিতে লাগিল।

বৈকালে মনমোহিনী পুনরায় দেওয়ানজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কলকাতার খরচের জন্য মাসিক কত বরাদ্দ আছে?

—আজ্ঞে, দুশো টাকা। সেতো আপনিই আদেশ দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, দিয়েছিলুম। কিন্তু সে আদেশ পালন হয় নি কেন?

দেওয়ানজী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আমতা আমতা করিয়া কহিলেন—বরাবর সেই ভাবেই পাঠানো হোতো। কিন্তু শ্রাবণ মাস থেকে—।

মনমোহিনী ধমক দিয়া কহিলেন—শ্রাবণ মাস থেকেই বা কেন তাকে বেশী পাঠানো হচ্ছে? আর একথা আমাকেই বা জানানো হয় নি কেন?

বৃদ্ধ দেওয়ানজী উপায়ান্তর না দেখিয়া মাথা হেট করিয়া রহিলেন। মনমোহিনী কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—কথা কন না যে। আমি উত্তর চাই।

দেওয়ানজী কোনও রকমে কহিলেন — আজ্ঞে, ভুল হয়েছে। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

মনমোহিনী কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—আমার ছেলে সম্বন্ধে দয়া করে আপনারা নিজে কিছু করবেন না। যখন যা হয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

দেওয়ানজী কহিলেন—যে আজ্ঞে। ভবিষ্যতে আর দুশো টাকার বেশী পাঠানো হবে না।

—না দুশো নয়। ভেবে দেখলাম আরও কমানো যায়। বাড়ী ভাড়া পঞ্চাশ বাদে, একশো টাকাতেই চলে যাবে। কলকাতার সরকার মশায়কে

একটু হিসেব করে চল্‌তে লিখে দেবেন। এর বেশী আর কিছুতেই দেওয়া হবে না।

দেওয়ানজী বুঝিতে পারিলেন বিপ্লব ক্রমশঃ বনাইয়া আসিতেছে।

মাতা পুত্রের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিবা এইবার ছিন্ন হইতে চলিল। কিন্তু তিনি মুখে কিছুই প্রকাশ করিলেন না। শুধু কহিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার উপদেশ মতই লিখে দেব।

—অরুণ এ পর্যান্ত কত টাকা বেশী নিয়েছে ?

দেওয়ানজীর তালিকা মুখস্থই ছিল, কহিলেন—বাসা খরচ দুশো বাদে শ্রাবণে একশো, ভাদ্রে তিনশো, আশ্বিনে দু'শো, আবার, এই দুহাজার চেয়ে পাঠিয়েছেন।

তালিকা শুনিয়া মনমোহিনী ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন—আপনার দোষেই এতটা বাড়াবাড়ি হয়েছে। এসম্বন্ধে আর কিছুই বল্‌তে চাইনে। অরুণ যা নিয়েছে তাতে তার কাছে চার পাঁচ মাস টাকা একেবারে বন্ধ করা উচিত। যাক্‌ ঐ দেড়শো করেই তাকে পাঠাতে থাক্‌বেন। আর বেশী টাকা কিসের জন্য খরচ হয়েছে তারও একটা জমাখরচ চেয়ে পাঠাবেন।

দেওয়ানজী হাত জোড় করিয়া কহিলেন—কিন্তু কি আমি পারি রাণী মা ? আপনি বরঞ্চ তাঁকে একটা চিঠি লিখে দিন।

মনমোহিনী বলিলেন—আমার আদেশ জানিয়ে তাকে লিখবেন। আপনার কোনও ভয় নাই।

ব্যাপার ক্রমশই জটিল হইয়া পড়িতেছে বুঝিয়া দেওয়ানজী চিন্তিত মনে প্রস্থান করিলেন এবং সেই দিনই আদেশ মত কলিকাতায় চিঠি লিখিয়া দিলেন।

চিঠি পাইয়া অরুণের ক্ষিপ্ত মন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। সে

রুদ্ধ আবেগে শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় ফুলিতে লাগিল। ভৃত্যের এত বড় স্পর্দ্ধা! তাহার টাকা যে ভাবে খরচ করুক—কৈফিয়ৎ চাহিবার তাহার অধিকার কি? হউক না কেন তাহার জননীর আদেশ, তবু তাহাকে এমনিভাবে লিখিতে হইবে। সে তৎক্ষণাৎ চিঠির জবাব দিয়া লিখিল:—আমার টাকা যে ভাবে ইচ্ছা খরচ করিতে পারি—তাহার জবাব দিহি কি আপনাকে দিতে হইবে? কি করিয়া আপনার এতদূর স্পর্দ্ধা হইল বুঝিতে পারি না। আপনি বৃদ্ধ, অনেকদিনের চাকরি আপনার—এবারের মত ক্ষমা করিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবেন। মনে রাখিবেন—আপনি বেতন ভুক্ ভৃত্য মাত্র—আর আমিও নাবালক নই। টাকা আমার চাই-ই। কোনও কৈফিয়ৎ শুনিতে পারিব না।

উত্তর পাইয়া দেওয়ানজীর মস্তক ঘুরিয়া গেল। এ চিঠি কি করিয়া গিন্নিমাকে দেখাইবেন। অথচ তাঁহাকে দেখাইতেই হইল। চিঠি পড়িয়া মনমোহিনী মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পুত্র এমন চিঠিও লিখতে পারে? এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার এমন দুর্গতি হইয়াছে? কিন্তু অবিশ্বাসের আর উপায় নাই। চিঠিখানির ভাষা, প্রত্যেকটি অক্ষর, প্রত্যেকটি শব্দ সাক্ষ্য দিতেছে—সে অরুণ আর নাই, মনমোহিনীর গর্ভের সন্তানের সমাধি হইয়া গিয়াছে। যে আছে—সে জমিদার হরবল্লভ চৌধুরীর ঔরসজাত একমাত্র পুত্র—তাঁহার উত্তরাধিকারী চার লক্ষ টাকার মালিক—অরুণ[illegible] চৌধুরী।

কোনও উত্তর না পাইয়া দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার প্রতি কি আদেশ হয় মা?

দেওয়ানজীর কথায় মনমোহিনীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, কহিলেন—আদেশ? তাকে লিখে দিন, তার সম্পত্তি এখানে এসে বুঝে নিক্।

যতক্ষণ তা না নেবে, সে আর একটি পাবে না।…তার পর একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন—দেওয়ান ড়ো হয়ে পড়েছি, তার সম্পত্তি সে যদি নিজে এসে বুঝে পড়ে নেয়— ই তো রক্ষা পাওয়া যায়। এ ভূতের বোঝা বয়ে মরা কেন! আর এক কথা। আমি শীগ্‌গিরিই কাশী যাব, তারও আয়োজন করে ফেলতে হবে।

দেওয়ানজী হাত জোড় করিয়া বলিলেন—এই কি আপনার কাশী যাবার সময় রাণী মা? অরুণ বাবুকে একটু স্থিতিকরে দিয়ে—।

মনমোহিনী একটুখানি হাসিয়া কহিলেন—সবই সেই ভগবানের হাত দেওয়ানজি। আমারে অত হাঁকু-পাঁকু কেন! তাঁর যা ইচ্ছে তাই হবে। এখন তাঁর চরণ স্মরণ করা ভিন্ন আর আমার অন্য পন্থা নাই। ছেলের মোহে আমি ভগবানকে একবার মন দিয়েও জপতে পারিনি—এতো আমার পক্ষে সুবিধেই হোলো।

বৃদ্ধ দেওয়ানজীর চোখের জল সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, তিনি চোখে মুছিতে মুছিতে প্রস্থান করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—তাঁহাদের সবারই আশা আকাঙ্খার সমাধি হইতে চলিল, এখন সেই পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হইবে মাত্র।

সেবার বাংলা দেশের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। অতি বৃষ্টিতে বাংলার অধিকাংশগ্রাম বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। পল্লীর জনসাধারণের দুঃখ নিবারণের জন্য অনেক সমিতি সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়া কর্ম্মীদের গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিয়াছিল। বন্যা পীড়িত আর্ত্তদের সেবার সুযোগ সমীর ছাড়িতে পারে নাই। সে দেখিল—তাহাদের গ্রাম এই দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে অনেকটা মুক্ত। তাই কয়েকজন কর্ম্মীকে লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সম্বল যৎসামান্য হইলেও তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদুর করা সম্ভব তাহার সে ত্রুটি করিল না। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া সে চাঁদা সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিল। তারপর কিছু পুঁজি লইয়া সে দেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইল। মনমোহিনীকে লিখিবামাত্র তিনি এক হাজার টাকা সাহায্য পাঠাইয়া দিলেন।

সমীরের ভাবুক মন গ্রামবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশায় বিচলিত হইয়া পড়িল। বন্যা পীড়িত লোকদের আশ্রয়হীন, অনাহার-ক্লিষ্ট অবস্থা দেখিয়া তাহার কান্না পাইত। সে তাহার অতি ক্ষুদ্র দল লইয়া—আর্ত্তের সেবায় মাতিয়া রহিল। ভাদ্র মাসের মাঝা মাঝি সে বাহির হইয়াছিল—কার্ত্তিক মাসেও সে দেশে ফিরিল না। বন্যার জল অনেকদিন নামিয়া গিয়াছে—কিন্তু নানারোগ নানা ভাবে তখন বিভীষিকা দেখাইতে সুরু করিয়াছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে সমীর বিনোদপুর আসিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রামটির দুর্দ্দশার অন্ত নাই। বন্যায় সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়াছে—কাহারও

ঘরে এমন আহার্য্য নাই যাহাতে আধপেট খাওয়া চলে। তাহার উপর দারুণ ম্যালেরিয়ায় গ্রামের প্রায় প্রত্যেক লোক প্রপীড়িত। সমীর তাদের দুইজন সহকর্ম্মী সহ এই গ্রামে আসিয়া ঘরে ঘরে কুইনাইন বিতরণ করিল, তাহাদের পথ্য যোগাইল এবং প্রয়োজন মত রোগীর সেবা করিতে লাগিল। সমীরের যেন নেশায় পাইয়াছিল—প্রায় তিন মাস সে গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াছে—কাজের বেগে তাহার যেন সে কথা মনেই পড়িতেছিল না।

সমীর ও তাহার সহকর্ম্মীদ্বয় আশ্রয় লইয়াছিল গণেশ মণ্ডলের বাড়ীতে। গণেশ মণ্ডল জাতিতে নমঃশূদ্র সুতরাং অস্পৃশ্য। কিন্তু সমীরের আদেশে এই গণেশ মণ্ডলই তাহাদের রান্না করিয়া দিত। গণেশ মণ্ডল ও তাদের পাড়া প্রতিবেসীদের এই দয়ার অবতার যুবকগণের প্রতি ভক্তির আর সীমা পরিসীমা ছিল না। সারাদিনব্যাপী পরিশ্রমের পর সমীর গণেশের গৃহে ফিরিলে গণেশ তাহার সহিত নানা গল্প জুড়িয়া দিত। এ গ্রামের বামুন কায়েত যে কতদূর বজ্জাত তাহার এক একটি কাহিনী সে বেশ রসাল করিয়া বলিত। কেন তাহারা কি মানুষ নয়—তাহারা কি পশুরও অধম যে গ্রামের এই সব টিকিওয়ালা বামুনরা তাহাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবে। তারপর সে সগর্ব্বে বলিত—কিন্তু আমাদের বউরাণীমা আসল বামুনের মেয়ে কিনা তাই আমাদের উপর তাঁর এত টান। তিনিও তোমাদের মত বলেন মানুষের ছোঁয়া মানুষ খাবে এতে নাকি আবার দোষ হয়। তা যাই কেন বল না বাবু, গিন্নিমা মরে যাওয়ার পর বউমার বড় কষ্ট। তাঁর আর দুঃখ কিসের, সুগ্যি স্বামী। কিন্তু একটিবারও তো খোঁজ খবর নেয় না।

সমীর কি যেন ভাবিতেছিল, গণেশের কথা কানে যাইতেই বলিল—কার কথা বল্‌ছো গণেশ?

—আমাদের যতীন বাবুর কথা গো। তিনিই আমাদের জমিদার কিনা। আহা! মা মরে যাওয়ার সময় একটিবার চোখের দেখাও দেখতে পেল না। ঐ একটিমাত্র ছেলে ঠাকরুণের আশা ছিল কত।

সমীর জিজ্ঞাসা করিল—তোমাদের জমিদারবাবু থাকেন কোথায় গণেশ?

গণেশ কহিল—লাখ টাকার জমিদার কিনা! আমরা মাত্তর দশঘর প্রজা। বছরে শ'খানেক টাকা খাজনা হয় কিনা সন্দেহ। এতে কি চলতে পারে সংসার? তুমিই বলনা বাবু।

সমীর হাসিতে হাসিতে কহিল—তাই কি আর চলে। তিনি থাকেন কোথায়?

—কি জানি কোন কলকাতার সহরে। মস্তভারী কাজ নিয়ে আছে—যেন সে না থাকলে সেখানকার কাজই চলবে না। কিন্তু এদিকে যে মা মরবার সময় ছেলের হাতের আগুন পেল না তার কি? যুবতী বউ একা বাড়ীতে পড়ে আছে কে তার খোঁজ নেয়?

সমীরের মনে সহসা খেলিয়া গেল এ লোকটি যতীন মুখার্জ্জি নয় তো? সে সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল—তাঁর নাম কি যতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি? পাতলা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, রং ফর্সা; গাল তোবড়ানো, চোখ গর্ত্তের ভেতর, মাথার চুল বড় বড়?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তিনিই তো আমাদের বাবু গো। মুখুজ্যেদের ছেলে কিনা! তোমার সাথে কি চেনা আছে?

—একটু একটু আছে তেমন ভাল নাই। তিনি কি গাঁয়ে আসেন না গণেশ?

—কই আর আসেন। মা মারা গেল, বউমা চিঠি লিখে দিলেন—অথচ এলেন না। কি আর করেন বউমাই শ্রাদ্ধশান্তি যা করতে হয় করলেন।

সমীর দুঃখিত স্বরে কহিল—আহা, তাহলে তো তাঁর ভারী কষ্ট। একলাটি তিনি কি করে আছেন।

আর্দ্রস্বরে গণেশ কহিল—তা কষ্ট হয়েছে বৈকি। তাঁর বাপের বাড়ীর দেশ থেকে সেদিন কোন এক ভাই নিতে এসেছিল—কিন্তু বউমা গেলেন না। বল্লেন—শ্বশুরের ভিটেতে বাতি দেবে কে? আহা, অমন মানুষ আর হয় না। তেনার বয়সই বা কত, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি, দয়ামায়ার যেন সীমা নাই। তিনি মা দুগগোর অংশ কিনা। …এই বলিয়া সে হাত তুলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিল।

সমীর মুগ্ধ হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। দুর্ভাগ্য যতীন এমন স্ত্রীকে ভুলিয়া কি করিয়া কলিকাতায় আছে?

গণেশ বলিতে লাগিল—বৌ ঠাকরুণ তোমাদের কথা খুব বলেন। তোমরা কোন বিদেশ থেকে দীন দুঃখীদের দুঃখ দেখে ছুটে এসেছ—তাঁর এতে ভারী আনন্দ। যাতে তোমাদের কোন কষ্ট না হয়—আমাদের সে কথা কতবার বলেন। আমাদের উপর মায়া তাঁর কত! তাঁর ছেলেপিলে নাই বটে—কিন্তু আমরাই তাঁর ছেলে। তাঁর কথাতে একদিনে আমরা নেশা করা ছেড়েছি। তাঁর আদেশ মানতেই হবে কি না।

একটুখানি নীরব থাকিয়া সে আবার বলিতে লাগিল—তাঁর আর কোন কাজ নাই শুধু কিসে আমাদের উন্নতি হবে, কিসে আমরা সুখে থাক্‌বো—এই তাঁর চেষ্টা। গিন্নিমা বেঁচে থাকতেও তিনি আমাদের দেখতেন—কিন্তু এখন আমাদের নিয়েই তাঁর সব কাজ। দুপুরে ছেলে মেয়েদের পড়ান, মেয়েদের ধম্মকথা শোনান, কত রকমের উপদেশ দেন। আমরা তো তাঁর কথায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

সমীর সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক হইল। সেই যতীনের এমন স্ত্রী! সে সৎকাজের ছল করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে—আর এই নিরাশ্রয়া

রমণী কি ভাবে মনের উদারতায়, সৎকার্য্যের প্রেরণায় এই অশিক্ষিতদের উন্নতির পথে আগাইয়া দিতেছে। সমীর এই শক্তিশালিনী রমণীর উদ্দেশে প্রণাম করিল!

কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি সমীর দেশে ফিরিবে ঠিক করিল। এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে মনমোহিণীর এক পত্র পাইয়া সে চিন্তিত হইল। তিনি লিখিয়াছেন পত্র পাইবামাত্রই যেন সে তাঁহার সহিত দেখা করে। সমীর তাহার সহকর্ম্মীদের গ্রামে পাঠাইয়া দিয়া নিজে মনমোহিণীর সহিত দেখা করিয়া তবে গ্রামে ফিরিাব মনস্থ করিল।

সহকর্ম্মীরা চলিয়া গেল, কিন্তু সমীরের যাওয়া হল না। সে সহসা প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হইল। তিন চারদিন জ্বরের ঘোরে সে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। জ্ঞান হইলে সে দেখিল একজন ভদ্রমহিলা জলপটি দিয়া শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতেছে, গণেশ পায়ের নিকট বসিয়া রহিয়াছে।

সমীর বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—ইনি—ইনি কে গণেশ?

চারুবালা কহিল—আপনি কথা কইবেন না। একটু চুপ করে থাকুন। আমি চুল নেড়ে দিচ্ছি।

সমীর ব্যাকুল হইয়া কহিল—কিন্তু আপনার পরিচয়—।

গণেশ বলিয়া উঠিল—এঁকে আর চিনলে না বাবু? উনি হচ্ছেন—আমাদের বউমা। তোমার অসুখ শুনে তোমাকে দেখতে এসেছেন!

সমীরের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিল—ও বুঝেছি। সে চোখ মুদিত করিল। কিছুক্ষণ পর কহিল—কেন আপনি কষ্ট করে এলেন? আমি তো এমনি ভাল হয়ে যেতাম।

চারুবালা কহিল—তা হোক। আপনার এখন কি কষ্ট হচ্ছে বলুন তো?

সমীর কহিল– মাথার যন্ত্রনাই বড্ড বেশী।

চারুবালা শিশি হইতে গেলাসে ঔষধ ঢালিয়া কহিল—এইটুকু খেয়ে ফেলুন মাথার যন্ত্রনা অনেক কমে যাবে।

সমীর ঔষধ খাইয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া শুইয়া থাকিয়া আবার কহিল—এখন অনেকটা ভাল বোধ করছি। এইবার আপনি আসুন। আর কষ্ট করবার দরকার নাই।

চারুবালা কহিল—এতে আর কষ্ট কি। আপনার এমন জ্বর—একজন দেখবার লোক নাই। গণেশ ভারী বিব্রত হয়ে পড়েছিল, তাই এলাম। আপনি কিছু মনে করবেন না।

সমীর একটুখানি হাসিয়া কহিল—আপনার সব কথাই আমি গণেশের মুখে শুনেছি।

চারুবালা মৃদু হাসিয়া কহিল—ভালই করেছেন। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

—করছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা আপনাকে বলতে চাই।

চারু কহিল—বলুন।

অতি অকস্মাৎ সমীর কহিল—আমার দিদি নাই—আপনি আমার দিদি হতে পারবেন কি? নইলে কিসের দাবীতে জোর করবো আমি।

সমীরেব কথায় চারু মুগ্ধ হয়ে গেল। অসঙ্কোচে এই আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা দেখিয়াই সে মনে করিল এই যুবক কতখানি নিষ্পাপ কলুষহীন জীবন যাপন করিয়াছে। সে মৃদুস্বরে কহিল– আপনার যদি তাই ইচ্ছা হয় —।

সমীর হাসিয়া কহিল—ইচ্ছা নয় মনের অদম্য বাসনা। আমার নিজের মা নাই, বাবা নাই, হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় নাই। কিন্তু তবু আমার মত ভাগ্যবান কজন হয়। আমি দুইটি মা, বন্ধুরূপী ভাই পেয়েছি।

শুধু একটির অভাব ছিল, আজ তার পূরণ হলো। দিদি, উঠে তোমার পায়ের ধূলো নিতে পারছি নে যে! আমায় একটু ধরে তুলে বসানারে গণেশ।

চারুবালার চোখ জলে ছাপাইয়া উঠিল—এমন মহৎ এমন কোমল ইহার প্রাণ! যে আবেগ রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—না না উঠতে হবে না ভাই তোমাকে। আমি এমনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি। তার পর চোখ মুছিয়া সে বলিল—আমারও নিজের বলতে কেউ নেই—তবু আমি সব পেয়েছি। কিন্তু সে সব কথা এখন নয়; যখন তুমি আমার ছোট ভাই হলে তখন আর একদিন শুনতে পাবে। এখন একটু চুপ করে থাক।

সমীরের জ্বর ছাড়িয়া গেল। কিন্তু সে বড় দুর্ব্বল। তবু সে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। মনমোহিনীর চিঠি পাইবার পর তার মন অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছিল। কিন্তু চারুবালা তাহাকে আরও তিন চার দিন যাইতে দিলনা।

যাইবার দিন সমীর কহিল—দিদি, আমি তো চল্লুম, কিন্তু তুমিও কি আমার সাথে যেতে পার না? ওখানে মা আছেন, মীরা আছে—তুমি যদি তাদের সাথে যোগ দিতে —আমি বুঝি অন্তবও সম্ভব করতুম।

চারুবালা মৃদু হাসিয়া কহিল—তোমার সবকথা শুনে আমার তো বড্ড যেতে ইচ্ছে করে ভাই। কিন্তু আমার গোবরা, গণেশ, গোপাল—এদের ফেলে যে কোথায়ও আমি যেতে পারিনে। ওরাই তো এখন আমার বন্ধন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমীর ম্লান হাসিয়া কহিল—সত্যি তোমার কাজ আমার চেয়েও বড়, তোমাম ভার বুঝি আমার চেয়েও গুরুতর।

যাইবার সময় সমীর চারুবালার পদধূলি গ্রহণ করিল। চারু অশ্রুরুদ্ধ-স্বরে কহিল—অল্পদিন পরিচয়ের ভাইটি আমার, দিদিকে ভুলো না যেন।

সমীর বাষ্পাকুল নেত্রে কহিল—অমন করে বলো না দিদি। পরিচয়

অল্পদিনের নয়—এ যে জন্ম জন্মান্তরের জানা শোনা—নইলে এমনভাবে তোমাকে পাব কে ভেবেছিল। তা হলে আসি দিদি। এই বলিয়া সে পুনরায় নত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। মাথায় হাত দিয়া চারু আশীর্ব্বাদ করিল।

সমীর চলিয়া গেল, চারু আবেগ রুদ্ধস্বরে বলিল — ভাইটি আমার সুখে থাক শান্তিতে থাক — এমনি ফুলের মতন কোমল প্রাণ যেন চিরকাল তোমার অটুট থাকে।

মনমোহিনীর কোলের কাছে বসিয়া সমীর যখন একটি একটি করিয়া সমস্ত কথা শুনিল—তখন তাহার মনের মধ্যে দুঃখের বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। অরুণ—তাহার সেই বন্ধু অরুণ এমন হইয়াছে! এ যে তাহার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। সে ধীরে কহিল—মা, এ যে আমি ধারণায় আনতে পারিনে। আমার বন্ধু অরুণকে যে আমি খুব চিনি! এই ছয় মাসের মধ্যে কি তার এত অধঃপতন হতে পারে? এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে।

মনমোহিনী একটুখানি হাসিলেন, সে হাসি দেখিয়া সমীরের কান্না পাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—অল্পদিন নয়—অনেক আগে থেকেই তার মনে পাপ ঢুকেছিল। হয়তো সে মনের সাথে যুদ্ধ করে করে আর নিজকে সামলাতে পারে নি। তুমি বলেছিলে—বন্ধুকে তুমি খুব চেন; এই বিশ্বাসেই যে এত গোল হয়েছে-- বাবা। আমি ও যে এম্‌নি গর্ব্ব করেই বলে এসেছি—আমার ছেলেকে আমি খুব চিনি, কিন্তু সে গর্ব্ব আজ কোথায় থাক্‌লো আমার? সমীর, ছেলেকে গর্ভে ধারণ করবার পর থেকেই মায়ের মনে স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে কতখানি আশা আকাঙ্খা জাগে—এ তো তোমরা বুঝ্‌তে পারবে না বাবা। এতখানি নির্ভর যার উপর সে যদি এক নিমেষে সব ভেঙ্গে দেয়—তাহলে মায়ের বুকে যে কী বেদন লাগে এ মায়ের প্রাণ না হলে আর বুঝবে কে? অথচ মায়ের স্বার্থই ব

তাতে কতটুকু! সন্তান সৎ হোক, যশস্বী হোক, বিদ্বান্ হোক, গণ্যমান্য হোক, প্রশংসাভাজন হোক, সর্ব্ব বিষয়ে জয়ী হোক, এ কামনা শুধু ছেলের মঙ্গলের জন্যই মা করে থাকে। ছেলেরা যে সেটুকু কিছুতেই বুঝতে চায় না।

তারপর একটুখানি হাসিয়া বলিলেন—শুধু ছেলেদের সম্বন্ধে নালিশ করবার জন্যই তোমাকে ডাকিনি বাবা—আরও আমার বিশেষ কিছু বলবার আছে। আমি এই সপ্তাহের মধ্যেই কাশী যাচ্ছি।

সমীর চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল—সে কি মা! অরুণের সাথে দেখা না করেই যাবে তুমি? আমি আজই কলকাতায় যাচ্ছি। অরুণকে ধরে এনে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিই, তারপর যদি শাস্তি দিতে হয়, তখন দিও।

মনমোহিনী কহিলেন—এ আর শাস্তি কিসের সমীর। অরুণ তো এই চাচ্ছে। আমি এখানে থাক্‌লে সে তার প্রয়োজনমত টাকা পায় না, তার আমলা ফয়লার ওপর জবরদস্তি চালাতে পারে না—এ কি তার কম আপশোষ মনে কর? তার জমীদারীতে আর একজন প্রভুত্ব করবে—এ তো সে চায় না!

সমীর গম্ভীর হইয়া কহিল—মা, ছেলের ওপর তোমার এত অভিমান! কিছুতেই কি তাকে ক্ষমা করতে পার না?

মনমোহিনী তেম্‌নি স্বরেই বলিতে লাগিলেন—সমীর, ছেলে যত বড়ই হোক, স্বামীর তুল্য কখনই নয়। কিন্তু,—তোমাকে বলতে আমার লজ্জা নাই, তাঁকে কি আমি এখনও ক্ষমা করতে পেরেছি বাবা? অরুণ তো আমাকে চিন্‌তো! তবে কেন সে এমন ভুল করেছে? সে তো আর ছেলে মানুষটি নয়!

সমীর বুঝিল এই তেজস্বী রমণীর মন যত স্নেহপরায়ণই হোক—

কিন্তু তাহা তেম্‌নি দৃঢ়, তেম্‌নি কঠিন। ইহাকে কথায় ভুলানো অসম্ভব। অশ্রুজলে ইহা গলিবে না, আঘাতের পর আঘাত দিলে ইহা নত হইবে না।

সমীরের মুখের দিকে চাহিয়া মনমোহিনী বলিতে লাগিলেন—অরুণের সম্বন্ধে আমার কোনও কিছু বলবার নাই, সে যা ভাল মনে করে করুক। স্বামী গিয়েছে অনেকদিন, এখন না হয় পুত্র হারালুম। মেয়ে মানুষের বুক এমনি পাথর দিয়ে তৈরী যে এসব সহ্য হবে। কিন্তু আর একটি ভার যে আমার ওপর পড়েছে সমীর। গৌরীর ভার যে সম্পূর্ণ আমারই। তার যদি বাপ মা বেঁচে থাকতো—তাহলে আমার ভাববার কিছুই ছিল না। কিন্তু তাঁরাও যে অসময়ে আমারই উপর নির্ভর করে চলে গিয়েছেন।

সমীর হাসিয়া কহিল—বেশ তো। অরুণকে আমি ফিরিয়ে আনি, তার হাতে গৌরীকে সমর্পণ করে—।

মনমোহিনী বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আবার ঐ কথা। তোমার কি ইচ্ছা যে এই কুসুম কোমল বালিকাকে আমার ঐ নিষ্ঠুর সন্তানের হাতে চিরজীবনের মত বিসর্জ্জন দেব? গৌরীর বাপমা নেই বটে—কিন্তু আমিই তার সব। তুমিই বল দেখি, একজন অসচরিত্রের হাতে কি সারাজীবন দগ্ধে মরার জন্যই তাকে সঁপে দিতে পারি?

এত কোমল অথচ এত কঠিন মাতৃ হৃদয়! সমীর অতি বিস্ময়ে মনমোহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—কি জবাব দিবে খুঁজিয়া পাইল না।

মনমোহিনী বলিতে লাগিলেন — অনেক আশা আমি করেছিলাম, তার কিছুই আজ অবশিষ্ট নাই। তবু এজন্য ভগবানের কাছে নালিশ করতে চাইনে। যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু তবু তোমাকে যে আমার প্রয়োজন বাবা। আমার এক ছেলে গিয়েছে—কিন্তু তুমি এখনও আছ। তুমি কি একটা কথা রখেবে না আমার?

সমীরের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কি আদেশ তাঁহার তাই বা কে জানে! সে কহিল—তোমার কি আদেশ মা?

মনমোহিনী বলিতে লাগিলেন—গৌরীর বাপমায়ের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—আমার ছেলের সাথে তার বিবাহ দেব। সে কথা আমাকে রাখ্‌তেই হবে। তুমিও আমার সন্তান—তুমিই গৌরীকে গ্রহণ কর। কিন্তু তুমি যে এতে কিছুমাত্র ঠেক্‌বে না—এ আমি বলে দিলাম। গৌরীর মত মেয়ে এ দেশে দুর্লভ।

গৌরীর সহিত বিবাহ! সমীরের অন্তরে সহসা যেন ঝড় উঠিল। সে তো নিজের বিবাহের কথা এ পর্য্যন্ত কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। কিন্তু আজ শুনিবামাত্র তাহার মনের কোণে আর একখানি মুখ ভাসিয়া উঠিল। সে যে এতটুকু কাল হইতে সমীরের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে! না, না—এ অসম্ভব। গৌরীর সহিত তাহার বিবাহ হইতেই পারে না।

মনমোহিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমীরের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ তে তোমার অমত নেই তো সমীর?

সমীর মৃদুস্বরে কহিলে—আমার প্রতি কেন এমন অবিচার করছো মা?

—অবিচার? এ তুমি কি বলছো সমীর? ও, বুঝেছি—তোমরা সবাই সমান।

আর্ত্তস্বরে সমীর বলিয়া উঠিল—তুমি ভুল বুঝেছ মা। বন্ধুর ভাবী পত্নীকে—, যাক্, এই যদি তোমার আদেশ হয় আমি অবহেলা করবো না। তোমার কথা আমি নিশ্চয়ই রাখবো।

ছল ছল নেত্রে মনমোহিনী কহিলেন—এই তো আমার উপযুক্ত পুত্রের কথা। আমার একটা ভাবনা এইবার ঘুচালে সমীর!

সমীর মনমোহিনীর নিকট হইতে চলিয়া আসিতেই গৌরী তাহার

সম্মুখে নতমুখে দাঁড়াইয়া কহিল—আমার একটা কথা বলবার আছে। পাশের ঘরে চলুন।

সমীর বিস্মিত হইয়া সেই কক্ষে গমন করিলে গৌরী তাহার সজলম্লানদৃষ্টি সমীরের মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া কহিল—আমি আপনাদের সব কথাই শুনেছি। আপনারা কি আমার দিকটা একটুও ভেবে দেখ্‌চেন না?

সমীর সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—এই অতি সুন্দরী তরুণীর অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্র হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হইতেছে। সে কোনও উত্তর দিতে পারিল না। এই গৌরী কি চায়? কি তাহার অভিযোগ?

গৌরী এইবার মাথা নত করিয়া কহিল—আপনি মাকে বলুন, আমি বিয়ে ক'রতে পারবো না।

সমীরের তবু কোনও উত্তর জোগাইল না। গৌরী তেম্‌নি সুরে কহিল—হিন্দুর মেয়ের একবারই বিয়ে হয় এ কি আপনারা জানেন না?

সমীরের নিকট সমস্ত ব্যাপার এবার জলের মত স্বচ্ছ হইয়া গেল। কেন যে এই লজ্জাশীলা হিন্দু বালিকা সহসা প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিয়াছে—এইবার তাহার অর্থ সে হৃদয়ঙ্গম করিল। নারী চরিত্র কি তাহাকে চিরকাল এম্‌নি ভাবেই মুগ্ধ করিবে? এরা এত মহৎ, এত উদার! সে হর্ষবিহ্বল কণ্ঠে কহিল - তোমার কোনও ভয় নাই গৌরী দি। বুঝেছি, তুমি আমার বন্ধু পত্নী হয়েই জন্মেছ। কারও সাধ্য নাই— এ রদ করে। আমি মাকে সমস্ত কথাই খুলে বলবো—শুন্‌লে তিনি আর জেদ করবেন না।

গৌরী স্নিগ্ধস্বরে কহিলে—হ্যাঁ, আপনিই তাঁকে বল্‌বেন। কিন্তু আমাকে আপমি ক্ষমা করবেন তো?

সমীর এইবার প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া কহিল—ক্ষমা কি তোমাকে এখনই করতে পারি গৌরী দিদি? আগে অরুণকে ধরে আনি—তারপর দেখে শুনে ক্ষমা করা যাবে।·· এই বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে মনমোহিনীর

নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল—মা, তুমি তো সমস্ত বন্দোবস্ত করে বসে আছ—কিন্তু এ দিকে গৌরীর কথা শুনেছ তো?

মনমোহিনী বিস্মিত হইয়া কহিলেন—গৌরীর আবার কি কথা সমীর?

তারপর সমীরের মুখে সমস্ত শুনিয়া হর্ষ ও বিষাদ এক সঙ্গে তাঁহার অন্তর মথিত করিতে লাগিল। তাই তো, এত বড় ভুল তিনি কেন করিয়াছিলেন? গৌরী—সে তো অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই অরুণকে তাহার পতিত্বে বরণ করিয়া রাখিয়াছে! কথায় সে কিছু প্রকাশ করে নাই—কিন্তু প্রতি কার্য্যে কি তাহার মনের ভাব উদ্ঘাটিত হয় নাই? তবে সে দ্বিচারিণী হইবে কি করিয়া? তিনি আবেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখনই গৌরীকে ডাকিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সজলনেত্রে কহিলেন—বুঝেছি মা, তুইও আমারই মত আজীবন দুঃখ বরণ করে নিতে চাস। তাহলে চল গৌরী, তোকে নিয়েই কাশী যাই। এখানে থাকলে আমরা কেউই তো শান্তি পাব না মা! মেয়ে-মানুষ যে কষ্ট করবার জন্যই এ সংসারে এসেছে রে! দুঃখকষ্টের মধ্যেই তো তার বুকের বলের পরীক্ষা মা। গৌরী, আজ তুই আমাকে যেমন আনন্দ দিয়েছিস্—এ বুঝি জীবনে কোনও দিন পাই নি মা!...তাঁহার চোখের জল আর রুদ্ধ রহিল না। ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। গৌরীর চোখ দুটিও শুষ্ক রহিল না।

— ৩৩ —

পর্ব্বতচূড়া হইতে স্খলিত পদ কোনও ব্যক্তি মুমূর্ষ অবস্থায়ও যেমন এক একবার চাহিয়া দেখিতে চেষ্টা করে কোথা হইতে তাহার পতন হইয়াছে সেদিন অরুণও তেমনি করিয়া নিজের কথা ভাবিয়া দেখিতেছিল। মনকে সে যতই প্রবোধ দিবার চেষ্টা করুক—ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল কিছুদিন পূর্ব্বে যে স্থানটি সে অধিকার করিয়াছিল-সে স্থানে আর সে নাই। সংসারে এখন সে সম্পূর্ণ একাকী তাহার কার্য্যে সমর্থন করিবার মত আপনার লোক এখন একান্ত দুর্ল ভ। যে জননীর আশীর্ব্বাদ এতদিন রক্ষা কবচের মত তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল—আশীর্ব্বাদ দূরে থাকুক এখন বুঝি তাঁহার দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপ তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু কেন এমন হইল? মণিমালিনী কি তাহাকে যাদু করিয়াছে? সে তাহার কে? অপরের পরিণীতা কুলত্যাগিণী রূপব্যবসায়ী নারীর মোহে কেন সে এমন আকৃষ্ট হইল? মাকে ত্যাগ করিল, বন্ধুর কথা বিস্মৃত হইল, মর্য্যাদা হারাইল, শিক্ষার অভিমান দূর করিল—এ কিসের জন্য? কিন্তু আর তাহার পরিত্রাণ নাই। এখন যদি সে ফিরিতেও চায়, তবু কি সেই আগেকার স্থানটিতে গিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে? লোকে ঠাট্টা করিবে, কানাকানি করিবে, বন্ধু ব্যঙ্গের হাসি হাসিবে, মা আর তেম্‌নি গভীর স্নেহে নিকটে টানিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন না। না, না, এখন্‌ ফেরা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার এই ভাল। এই ভাল! যাহার জন্য সে সব ছাড়িয়াছে, সেই মণিমালিনীর প্রেম তাহার অটুট থাকুক।

সহসা অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরে অরুণ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। কে যেন বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—অরুণ কোথায়? বাড়ী আছে তো?

অরুণেরমুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এ যে সমীর! আর কোন মুখে তাহার সহিত দেখা করিবে!

কিন্তু পলাইবারও উপায় ছিলনা। সমীর তৎক্ষণাৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিহ্বল অরুণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল—অরুণ, ভাই, ভাল আছ তো?

অরুণের গলার স্বর যেন বাধিয়া গেল, কোনও রকমে কহিল—হ্যাঁ। তুমি কবে এলে?

হাসিতে হাসিতে সমীর কহিল—বেশ কথা তো! কবে এলুম? ট্রেণ থেকে নেমে সরাসর তোমারই কাছে এসে পড়েছি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। মায়ের ডাকে তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলুম কিনা।

বিস্মিত অরুণ সমীরের মুখের দিকে চাহিল। সমীর কহিল—একেবারে অবাক হয়ে গেলে যে। মায়ের ডাক ছিল। যেতে হবে না? যাকগে সব কথা পরে হবে। তোমার কিন্তু এক্ষুণি যাওয়া চাই।

—এখনই যেতে হবে কোথায়?

সমীর কহিল—বাড়ী। আমি তোমাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে তবে মুক্তি পাব।

অরুণ বুঝিল সে সমস্তই শুনিয়াছে, তাহার নিকট আর কিছুই গোপন নাই। আর এই জন্যই বাড়ীতে পাঠাইবার এত তাড়া লইয়া আসিয়াছে। সুতরাং তাহার পক্ষে গোপন করিয়াও আর লাভ নাই। সে ম্লানস্বরে কহিল—সে আর হয় না ভাই।

সমীর আজ যেন প্রগলভ হইয়া উঠিয়াছে, সে ভ্যাঙচাইয়া কহিল—সে আর হয় না ভাই! কেন হবে না? কি হয়েছে তোমার?

বিষণ্ণ চোখ দুটি বন্ধুর দিকে ফেলিয়া অরুণ একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিল—কি হয়েছে জাননা সমীর ?

—না জানিনে, আর জানতেও চাইনে। তোমার যেমন মতিচ্ছন্নই হোক আমি তার বিচার করবো না। তুমি যেমন আমার বন্ধু ছিলে এখনও তাই।

অরুণের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল, কোনও রকমে অশ্রু রোধ করিয়া বলিল—তবু আমার বাড়ীতে যাওয়ার মুখ নাই। আমি মাথা উঁচু করে কি করে মায়ের সামনে দাঁড়াব ?

সমীর হাসিতে হাসিতে কহিল—এই কথা ! আমরা সন্তান, যখন যা খুসী করবো তারপর যেমন মায়ের ছেলে তেমনি আছি। আমাদের আবার লজ্জা কিসের ভাই ? আর অপবাদের কথা যদি বল সে আমারও কম হয়নি। সেবার তো জ্যেঠামশায় যাচ্ছেতাই করে বললেন।

বন্ধুর প্রবোধ দিবার এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া অরুণ হাসিল, সে ম্লান করুণ সুরে কহিল—সমীর, এখনও আমি এমন হইনি যে ন্যায় অন্যায় বুঝতে পারিনে। তোমার অপবাদ যদি কিছু হয়েই থাক সে মিথ্যা, কিন্তু আমার তো তা নয়। সত্যি সমীর, মায়ের কাছে যাওয়ার আমার কোনও উপায় নাই। আমাকে বৃথা অনুরোধ করোনা।

সমীরের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল, সে ধরা গলায় কহিল—অরুণ ভাই, আমি বড় আশা নিয়ে এসেছিলুম যে ! আমার মুখ কি তুমি রাখবে না ?

অশ্রুরুদ্ধস্বরে অরুণ কহিল—আমাকে মাপ কর সমীর ! তুমি তো জাননা কতখানি অধঃপতন হয়েছে আমার। আমি মায়ের কথার অবাধ্য হয়েছি, বন্ধুকে না দেখে খুসী হয়েছি। যে জননীকে আমি এক মুহূর্ত্ত না দেখলে অস্থির হতুম তাঁকে কত দীর্ঘকাল দেখিনি। হয়তো, চিরজীবন দেখা হবেনা। জানকি এ কিসের জন্য ?

স্নিগ্ধস্বরে সমীর কহিল--জানি বৈকি অরুণ? কিন্তু অতীত আমাদের ভুলতেই হবে যে। বর্ত্তমানই আমাদের সম্বল। তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ মা তোমার তেমনি মাই আছেন, তাঁর মন তেমনি স্নেহে-ভরা, অন্তর তেমনি করুণা মাখানো। আর—আর একটি লোকের কথাও কি তোমার একটু মনে আনতে নাই? বাগদত্তা পত্নী তোমার—সেই গৌরী কি যে আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সে যে আমি একদিনেই বেশ বুঝতে পেরেছি ভাই। তার প্রেমের কাছে কি ছাড় কোন থিয়েটারের অভিনেত্রীর প্রেম। অরুণ, তোমার জন্য সবই প্রস্তুত হয়ে আছে শুধু তুমিই নাই! একটা মানুষ যা কামনা করে, সব তোমার আছে—শুধু তুমি যাও।

অরুণের মন দুলিতে লাগিল—তাহা হইলে সে কি সত্যই আবার ফিরিতে পারিবে? সে আবেগভরে সমীরের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—মা আমাকে ক্ষমা করবেন তো সমীর? তাঁর অবহেলা কিন্তু আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

সমীর মৃদুহাসিয়া কহিল—তাঁকে কি তুমি চেননা? কিন্তু তাঁর অভিমানকে যেন ভুল করে দেখো না এই আমার অনুরোধ।

—আচ্ছা, তাহলে আমি যাব। আর সহ্য করতে পারিনে আমি।··· এই বলিয়া সে অশ্রু রোধ করিবার জন্যই দুই হাতে চোখ ঢাকিল। বন্ধুর মাথার উপর একখানি হাত রাখিয়া কোমল স্বরে সমীর ডাকিল—অরুণ।

অরুণ রাঙ্গা চোখ মেলিয়া সমীরের দিকে চাহিল। সমীর তেমনি সুরেই কহিল—আমি থাকলে এতটা কিছুতেই হতো না। তবুতো আমি যতীন মুখুজ্যে সম্বন্ধে তোমাকে সাবধান করে গিয়েছিলুম।

অরুণ একটু হাসিল মাত্র।

—সে কোথায় আছে বলতে পার? সে রাস্কেল্‌কে একবার দস্তুরমত চাবুক পেটা করবো ইচ্ছে আছে। না, না, তুমি ব্যস্ত হও না। সে তোমার

জন্য নয়, আমার দিদির জন্য। ও, কি বদমায়েস, কি জোচ্চোর। কতজনের যে সর্ব্বনাশ করেছে তার ঠিক নাই।

অরুণ স্বাভাবিক সুরে কহিল—সে এখানে নাই। তার মহিলা আশ্রমের জন্য চাঁদা আদায়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু তোমার এই দিদিটি কে।

—সে এক মজার ব্যাপার। যতীন বাবুর গ্রামেই আমি কিছুদিন বন্যার সাহায্য নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি কিনা।

তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত কথা সে বলিল।

সমীর বলতে লাগল—আমার দিদির দিকে তাকালে চোখে জুড়িয়ে যায়। আর এ হতভাগা আছে কি নিয়ে? যতসব বজ্জাত লোক নিয়ে এর কারবার। আবার মহিলা আশ্রম করে যে কত জনের সর্ব্বনাশ করবে কে জানে। একবার পেলে হয়—পিঠের চামড়া তার তুলে দি।

ক্রমে ক্রমে হাসি গল্পে অরুণের মন হালকা হইয়া আসিল। সেও সহজ ভাবে বন্ধুর সাথে কথাবার্ত্তায় যোগ দিতেছে দেখিয়া সমীর মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর সত্যই অরুণ বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সমীর তাহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিল এবং পরদিনই প্রাতে নিজের দেশে রওনা হইল।

পূর্ব্বে কোনও সংবাদ দেওয়া ছিলনা সুতরাং ষ্টেশনে হইতে হাঁটিয়াই অরুণকে রওনা হইতে হইল। এতদিন পর পল্লীর স্নিগ্ধ বায়ু গায়ে লাগিতেই তাহার শরীর মন জুড়াইয়া গেল। পল্লীর বিস্তৃত মাঠের শস্যভারাবনত ধান গাছগুলি মাথা নাড়িয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। চারিদিকের মুক্ত দৃশ্যগুলি তাহার ... ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ দিতেছিল। অরুণ অত্যন্ত লঘু মনে পথ বাহিয়া চা...

অনতিবিলম্বে জমিদারের প্রাসাদ চোখের সম্মুখে দেখা দিতেই অরুণের মন নাচিয়া উঠিল। ঐ তাহার অতিপরিচিত নিজের আবাস। আজ সহসা তাহাকে দেখিয়া তাহার জননীর অন্তর কি উল্লসিত হইয়া উঠিবে না? তিনি যখন দেখিবেন পুত্র তাঁহার ঠিক তেমনি রহিয়াছে, কোনও পরিবর্ত্তনই হয় নাই তখন কি তিনি পূর্ব্বকৃত অপরা ক্ষমা করিবেন না? আর গৌরী! সমীরের মুখে যাহা শুনিয়াছে ...হাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহারও নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে। সে কি তাহাকে মার্জ্জনা করিবে না?

বাড়ীর নিকটে আসিতেই তাহার পরিচিত লোকের সহিত একে একে দেখা হইতে লাগিল। কিন্তু কেহ কিছু বলিল না — শুধু বিস্মিত হইয়া রুগ্নমূর্ত্তি তরুণ জমিদারকে দেখিতে লাগিল। বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই সেপাই প্যায়াদা, কর্ম্মচারী বিহ্বলভাবে চাহিতে লাগিল। সে কাহাকেও কিছু না

বলিয়া সোজাসুজি ভিতরে প্রবেশ করিল। কিন্তু এইবার তাহার খটকা লাগিল কৈ কাহাকেও তো দেখা যায় না! তাহার মা কোথায়? তাহা হইলে কি তিনি এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন? সে ব্যস্তভাবে এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল কিন্তু কোথায়ও তিনি নাই। তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া গভীর উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

এতক্ষণে অরুণের আগমন সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ দেওয়ানজী ম্লানমুখে অরুণের নিকট আসিয়া অভিবাদন করিল।

অরুণ বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিল—মা কোথায়?

দেওয়ানজী কহিলেন—গিন্নিমা কাল রাত্তিরে কাশী গেছেন।

অরুণের বুকে যেন গুলি আসিয়া প্রবেশ করিল। বিহ্বলভাবে সে কহিল—কাশী গেছেন! কেন?

দেওয়ানজী ইহার কি উত্তর দিবেন! কি করিয়া তিনি মুখ ফুটিয়া বলিবেন—পুত্রের প্রতি অভিমান করিয়া তিনি চিরজীবনের জন্য নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলেন—ইদানীং তাঁর শরীর তেমন ভাল ছিল না। তাই হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য গেলেন। আর বিশ্বনাথ দর্শন করারও তাঁর অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল কিন্তু আপনার আসবার খবর পেলে তিনি কখনও যেতেন না বাবু।

অরুণ সমস্তই বুঝিতে পারিল। তাহার বুকের মধ্যে কি ঝড় বহিতেছিল তাহা সেই জানে। পুত্রের প্রতি মায়ের এত অভিমান? তিনি কি কখনও তাহাকে ক্ষমা করবেন না?

দেওয়ানজী বলিলেন—এখুনিই টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি। মা এরই মধ্যে এসে পড়বেন।

অরুণের ঠোঁটের পাশ দিয়া এক বীভৎস হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল,

কহিল—কেন মিথ্যে বলছেন? কেন আমায় স্তোক দিচ্ছেন? আমি সব বুঝতে পেরেছি।

দেওয়ানজীর সত্যই কিছু বলিবার ছিল না।

অরুণ বলিতে লাগিল - বেশ, তিনিই ক্ষমা করতে না পারেন আমারই বা বৃথা চেষ্টা কেন!

সে বসিয়াছিল—এইবার উঠিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ানজী হাতজোড় করিয়া কহিলেন—আপনি একটু সুস্থ হোন বাবু। তারপর ধীরে সুস্থে পরামর্শ করে কিছু বিহিত করা যাবে।

গম্ভীর হইয়া অরুণ কহিল—হ্যাঁ, বিহিত আমি করছি। আমি এখনই কলকাতায় যাব।

দেওয়ানজী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—তাই কি। এত পরিশ্রমে দরকারই বা কি! আপনি তিন চার দিন অপেক্ষা করুন—আমি মাকে ফিরিয়ে আনি।

অরুণ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল—বৃথা চেষ্টা দেওয়ানজি। মা যদিও আসেন—আমি থাক্‌বো না।

দেওয়ানজীর অনুরোধ উপরোধ সমস্তই ব্যর্থ হইল। অরুণ তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় রওনা হইল। বৃন্দাবন তাহাকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল—এরই মধ্যে ফিরে এলেন হুজুর!

অরুণ উত্তর দিল না। তাহার দেহের শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিতেছিল। সে কিছুক্ষণ নিজের কক্ষে গুম হইয়া বসিয়া রহিল। বেশ তো, মা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে তাহার কি আসিয়া গেল। যাকে সে প্রাণের অধিক ভালবাসে—সেই মণিমালিনী তো আছে! এতদিন বৃথাই সঙ্কোচের কাঁটা তাহার বুকে খচ খচ করিয়া বিঁধিয়াছে। এখন সে নিশ্চিন্ত! তাহার জননী নাই, গৌরী নাই, বন্ধু নাই, কোনও

আত্মীয় স্বজন নাই! এখন সে আর মণিমালিনী নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে দিন কাটাইতে পারিবে।

সে তৎক্ষণাৎ মণিমালিনীর বাড়ীর দিকে রওনা হইল। তাহার দুই দিনের অদর্শনে সে যে কিরূপ অভিমান করিয়াছে ইহা অরুণ মনেমনেই উপলব্ধি করিল এবং কি করিয়া যে তাহার মান ভাঙ্গাইবে তাহারও মনে মনে খসড়া করতে লাগিল।

কিন্তু বিশ্বের বিস্ময় বুঝি তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। মণিমালিনীর বাড়ীর নিকট আসিয়া যে দেখিল দরজায় তালা বন্ধ। তাহার বুক দুর দুর করিয়া উঠিল। কৈ তালা বন্ধ তো কোনও দিন থাকে না। সে পাশের বাড়ী হইতে খবর পাইল কাল জিনিষপত্র লইয়া মণিমালিনী যে কোথায় গিয়াছে, তাহারা ঠিক বলতে পারে না।

অরুণের মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। আজ কি সবাই মিলিয়া একসঙ্গে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সে ট্যাক্সিতে চড়িয়া লিলি থিয়েটারে উপস্থিত হইল। প্রতুল গাঙ্গুলী সেখানেই ছিল। রুক্ষমূর্ত্তি অরুণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—প্রতুলবাবু, মণি কোথায়?

প্রতুল বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে কহিল—কি জানি মশায় কোথায় সে!

—সেকি! আপনিও জানেন না? তার হলো কি প্রতুলবাবু?

প্রতুল তেমনি ঝাঁঝের সুরে বলিল—আর মায়া কান্নার দরকার কি মশায়? ঢের তো হয়েছে—এইবার সরে পড়ুন।

প্রতুলের হাত চাপিয়া ধরিয়া অরুণ বলিয়া উঠিল—আপনি কি বলছেন প্রতুলবাবু?

অরুণের মুখের দিকে চাহিয়া প্রতুল শ্লেষের সহিত কহিল—এখন আর ব্যস্ত হলে কি হবে অরুণ বাবু? ছাড়ুন, ছাড়ুন আমার কাজ আছে। আপনার জন্যই তো থিয়েটারটা যেতে বসেছে মশায়।

একি অন্যায় অবিচার! অরুণ কহিল—আমার জন্যই থিয়েটার যেতে বসেছে?

—তা নয় তো কি। আপনার বুদ্ধির দোষেইতো মণিমালিনী সরে পড়লো। একটা মেয়ে মানুষকে তালিম করা কি সোজা মনে করেন আপনি? তার জুড়ি এখন পাই কোথায় বলুন। আপনি যদি তার সাথে না ভিড়তেন তাহলে কক্‌খনো সে পালাতো না। আর মশায়! ও রকম একটা মেয়েমানুষ পোষা কি আপনার মত কাঁচা লোকের কর্ম্ম! ঢালতে পারতেন ওর পায়ে অজস্র টাকা—তবে তো মন ভিজ্‌তো তার। সাধ্যি কি এক ব্যাটা মাড়োয়াড়ী তাকে নিয়ে লম্বা দেয়। যান্ যান্; আর দুঃখু করে ফল কি। একজন গিয়েছে—আরও অনেক মিলবে আপনার। কিন্তু আমারই হয়েছে মুস্কিল কিনা!······ এই বলিয়া প্রতুল সরিয়া পড়িল। অরুণ মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া আসিল। এতদিন যাহার প্রেমকে সে যথার্থ মনে করিয়া তবু মনকে সান্ত্বনা দিয়াছে—আজ তাহার যথার্থ রূপটিকে দেখিতে পাইয়া সে যে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। যে রমণীর জন্য সে যশ, মান, বিদ্যা, বংশ গৌরব সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে, আত্মীয়স্বজনের নিকট পর হইয়াছে—সে এমন! নারী জাতির প্রতি ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। সে মনে করিল ইহারা সবাই এই রকম। ইহাদের ভালবাসা, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ সব মিথ্যা, সমস্ত ছলনা শুধু অভিনয় মাত্র। তাহার মন প্রতিশোধ লইতে বদ্ধ পরিকর হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ যে রমণী তাহাকে বিশ্বের হেয় করিয়া ছাড়িয়া পালাইল—তাহাকে শাস্তি না দিলে তো তাহার চলিবে না। সে যেখানেই লুকাইয়া থাক, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

অরুণের মূর্ত্তি দেখিয়া বৃন্দাবন কহিল—হুজুরের কি হয়েছে?

সহসা বৃন্দাবনের হাত চাপিয়া ধরিয়া অরুণ কহিল—বৃন্দাবন! কি করলে মনের জ্বালা যায় বলতে পারিস?

ধূর্ত্ত বৃন্দাবন এ সমস্ত ব্যাপার অনেক দেখিয়াছে, সুতরাং সে সবই বুঝিতে পারিল। সে সহাস্যে কহিল—আজ্ঞে, তা আর জানিনে! এমন জিনিষ দিতে পারি, যা পেটে পড়লেই—কিন্তু সে কি আপনি খাবেন হুজুর?

ব্যগ্র হইয়া অরুণ কহিল—খাব, খাব, নিশ্চয় খাব। তুই নিয়ে আয়।

কিছুক্ষণ পর বৃন্দাবন তরল রক্তিম সুরা যখন গেলাশে ঢালিয়া দিতেছিল অরুণ একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তারপর গেলাসটি তুলিয়া লইয়া মুখ বিকৃত করিয়া সেই বিষ পান করিতে লাগিল। বৃন্দাবন অতি ঔৎসুক্যের সহিত এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কহিল—প্রথম দিন একটু ঝাঁঝ লাগবে খেতে হুজুর, কিন্তু তারপর একেবারে অমৃত।

অরুণ কোনও কথা কহিল না।

বৃন্দাবন কহিল—হুজুর, অভয় দেনতো একটা কথা বলি।

—আজ্ঞে, একটা গিয়েছে, তাতে আর দুঃখু কি হুজুর। হুকুম দিলে অমন লাখ লাখ হুজুরের পায়ের তলায় হাজির করবো।

অরুণ তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—কিন্তু তাকে খুঁজে বের করতেই হবে বৃন্দাবন। তাকে খুন না করলে আমার গায়ের জ্বালা যাবে না।

ইহার পর অরুণ ক্ষিপ্তের মত সহরের অপবিত্র পল্লীতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই মণিমালিনীর সন্ধান দিতে পারিল না। কেবল এই টুকু সংবাদ পাইল—কোন এক ধনী মাড়োয়াড়ীর সহিত সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। মনের জ্বালায় রক্তিম বিষ পান করিতে করিতে অরুণ অল্পদিনের মধ্যেই পিশাচে পরিণত হইয়া গেল। অতিদ্রুত বৃন্দাবন তাহাকে পাপের পঙ্কিল ঘূর্ণীতে নিক্ষেপ করিল আর তাহার উদ্ধারের উপায় রহিল না।

কিছুদিন পর বৃন্দাবন কহিল -- হুজুর, এবার দেশে ফেরা যাক। হুজুরের অভাব কি সেথানে।

অরুণ তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—আচ্ছা, তাই চল বৃন্দাবন।

অরুণ বৃন্দাবনকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে ফিরিল। সকলে সভয়ে দেখিল—অশিক্ষিত হরবল্লভ রায়ের শিক্ষিত পুত্র অত্যাচারে পিতাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

তিন চার মাস পরের কথা। অরুণ একাকী তাহার কক্ষে বসিয়াছিল। তাহার মুখ শুষ্ক, চোখ কোটর-গত, দেহ অত্যন্ত শীর্ণ এবং লাবণ্যহীন। একবৎসর পূর্ব্বে তাহাকে যে দেখিয়াছে এখন সে চিনিতে পারিবে না। সে অরুণ আর নাই—কোনও প্রেতাত্মা যেন তাহার দেহ ধারণ করিয়া বাস করিতেছে। অরুণের সম্মুখে একখানি টেবিল, তাহার এক পাশে একটি রিভলভার এবং মাঝখানে কাঁচের গেলাসে রক্তিম পানীয়, গেলাশের মুখে রূপার ঢাকনি দেওয়া।

অপরাহ্ন। উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে সে তাকাইয়াছিল। ঘরটির পাশেই উদ্যান। অরুণের পিতা হরবল্লভ চৌধুরী ইহা অতি পরিপাটি করিয়া সাজাইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর মনমোহিনীও এই উদ্যানটি সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অরুণের এদিকে কোনও দৃষ্টি নাই। যত্নের অভাবে ফুলগাছগুলি শুকাইয়া যাইতেছে, উদ্যান আগাছায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পাম গাছের মাথার উপর দিয়া সূর্য্য নামিয়া যাইতেছে অরুণ শূন্য দৃষ্টিতে সেই দিকেই চাহিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য একেবারে নীচে নামিয়া গেল—অরুণ তবুও সেই দিকেই চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিয়া কহিল—দেওয়ানজী প্রণাম জানাচ্ছেন হুজুর।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি অরুণ কহিল—দেওয়ানজী? কেন?

—তিনি কি যেন বল্‌তে চান।

অরুণ কি যেন ভাবিয়া কহিল—আচ্ছা, আসতে বল।

বৃদ্ধ দেওয়ানজী অতি সঙ্কোচে কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। অরুণকে তিনি কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। অরুণ প্রভু, তিনি ভৃত্য। হরবল্লভ তাঁহাকে যেটুকু খাতির করিতেন—অরুণ এখন সেটুকুও করিতে চায় না।

অরুণ টেবিল হইতে গেলাশটি তুলিয়া একটু চুমুক দিয়া কহিল—কিছু দরকার আছে আপনার?

—আজ্ঞে হাঁ। দারোগাবাবুর কাছে গিয়েছিলাম—দুশো টাকায় রফা হলো।

—দুশো? বড় বেশী নিলে বোধ হচ্ছে না?

দেওয়ানজী কহিল—এ সব কাজে ওরা প্যাচ দিয়ে নেবেই হুজুর। উপায় নেই।

অরুণ গেলাশে আর এক চুমুক দিয়া কহিল—বটে। কিন্তু ধরণীর মেয়ে হঠাৎ এমন সতীসাধ্বী হয়ে উঠলো কি করে? একেবারে থানায় খবর? কিন্তু সেদিন রাত্তিরেও তো—।

দেওয়ানজী একটু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—ওসব কথায় আর দরকার নাই হুজুর। ও তো শেষ হয়ে গিয়েছে।

অরুণের ঠোঁটের পাশে একটু ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল—আচ্ছা ও থাকুক। কিন্তু আরও একটা পরামর্শ আছে আপনার সাথে।

রিভলভারটি হাতে তুলিয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়া কহিল—ও ব্যাটারা আমি আসবার পর থেকে কত নিল?

দেওয়ানজী একটু হিসাব করিয়া কহিল—প্রায় বার-তেরশ হবে।

রিভলভারটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া গেলাশটি হাতে তুলিয়া অরুণ

কহিল—বা-র-তের—শো—? আচ্ছা ঠকিয়েছে— কি বলুন? ধরুণ যদি-ওদের নাই দিতুম—কি করতে পারতো ওরা? কেশ প্রুফ করা কি সোজা হোতো বলে মনে হয়?

অত্যন্ত নির্লজ্জ উক্তি। বৃদ্ধ কোনও উত্তর না দিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

অরুণ গেলাশে চুমুক দিয়া দেওয়ানজীর মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় কহিল—আপনার সাথে একটা পরামর্শও করতে হবে আমার। একটা ভারী ফাইন আইডিয়া বেন্দা বাৎলে দিয়েছে। সত্যি আমি দেখছি ওর এসব বিষয়ে ভারী মাথা খেলে। নইলে কি বাবা ওকে অমন ভালবাসতো মনে করেন।

দেওয়ানজীর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল আবার না জানি কি ফ্যাসাদ ঘটিবে।

অরুণ বলিতে লাগিল—ও ব্যাটাদের তো দিতেই হচ্ছে, তার চেয়ে একটা মাসিক বরাদ্দ করলেই ভাল হয় না? তাহলে কিছু কমে সারা যাবে। ঠিক মাসে মাসে ফেলে দিয়ে আসবেন! আর প্রত্যেক কেশে দুশো তিনশো করে দিলে ফতুর হয়ে যাব শীগগিরই।

দেওয়ানজী ভাবিল—এ বলে কি! একি সত্যই চিরকাল এমনি ভাবেই কাটাইবে। অত্যাচারে যে ইহারই মধ্যে তাহার পিতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পীড়ন মনমোহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রজা ভুলিত কিন্তু এখন যেন তাহাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে বাধা দিবার কেহ নাই, উপদেশ দিতে কেহ সাহস করে না, কোন দিক দিয়া কি বিপ্লব ঘটিবে কেহই বুঝিতে পারে না। সকলেই তরুণ জমিদারের অমানুষিক পীড়নে শঙ্কিত, বিপর্য্যস্ত।

অরুণ কহিল—কালই একবার দারোগাবাবুর কাছে প্রস্তাব করে

দেখবেন, তিনি কি বলেন।

অগত্যা দেওয়ানজী কহিল—যদি আদেশ হয়, দেখবো। কিন্তু আমার একটা কথা আছে।

—বেশ, বেশ—বলুন।

হাতজোড় করিয়া দেওয়ানজী কহিল—আমি বিদায় চাচ্ছি। বুড়োমানুষ, আর কাজ চালাতে পারিনে। অনেক দিন আপনাদের অন্ন খেয়েছি। আর কতদিনই বা বাঁচবো, এবার ধর্ম্মে কর্ম্মে একটু মন দিতে ইচ্ছে হয়।

অরুণ কি যেন একটু ভাবিল। একটি দীর্ঘশ্বাসও বাহির হইয়া আসিল কিনা সেই জানে, কিন্তু মুখে কহিল—বেশতো ধর্ম্মকর্ম্ম করবেন—এতো সুখেরই কথা। আমি আর বাধা দিয়ে কি করবো বলুন। আচ্ছা, সুবিধে মত—।

হাতজোড় করিয়া দেওয়ানজী কহিলেন—আর দেরী নয়, আমি কালই যেতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।

চোখ বিস্ফারিত করিয়া অরুণ কহিল—কালই ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গিন্নীমা কাশী থেকে আদেশ করেছেন—এখন আপনি হুকুম দিলেই—।

—তাহলে কাশীতেই যাচ্ছেন বুঝি ?

দেওয়ানজী কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, মায়ের সেই রকমই হুকুম।

কি যেন একটু ভাবিয়া অরুণ কহিল—আপনার ছোট মেয়ে রমা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে শুনলুম না ?

দেওয়ানজীর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, তিনি ঢোক গিলিয়া বিবর্ণ মুখে কহিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেওয়ানজীর ভীতিব্যাকুল ভাব অরুণের দৃষ্টি এড়াইল না। বোধ হয়

আর একটি দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষভেদ করিয়া বাহির হইতে চাহিল। সে কহিল,—তাদের সকলকেই কি নিয়ে চলেছেন ?

কোনও রকমে দেওয়ানজী বলিলেন—সেই রকমই মনে করেছি।

গম্ভীরভাবে অরুণ কহিল—বেশ !···তারপর ঢকঢক করিয়া গেলাসের সমস্ত পানীয় নিঃশেষ করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল—না নিয়ে গেলেও পারতেন। রমা আমার ছোট বোন। ছোটবেলায় কত এক সঙ্গে খেলেছি—তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আচ্ছা, যখন আপনি একেবারে ঠিক করে ফেলেছেন—আপনাকে আর আটকাব না। তবে যাবার আগে আমাদের ভূপেনবাবুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। জানেনই তো আমি একেবারে আনাড়ি। কত লোকেই যে ঠকাবে কে জানে!

দেওয়ানজীর চোখে সত্যই এবারে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি ধরা গলায় কহিলেন—আমার আরও একটা কথা আছে। শুনে আপনি রাগ করবেন না। আপনি বিদ্বান, সুশিক্ষিত। আপনার কাছে খুব ভাল ব্যবহারই আশা করি। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে এ সংসার ছারখারে যেতে বসেছে। বাবু, এখনও ফিরুন, সবদিক বজায় থাক। আপনি অনুমতি দিলে মাকে আমি ফিরিয়ে আনি।

মাথা নাড়িতে নাড়িতে অরুণ কহিল—ও অসাধ্য-সাধন করতে যাবেন না দেওয়ানজী মশায়, তাতে সে কুলও আপনার যাবে।

হাত জোড় করিয়া দেওয়ানজী কহিল—তা'হলে আপনিই চলুন আমার সাথে। মায়ের উপর রাগ করে কেন নিজের সর্ব্বনাশ করছেন।

অরুণ কোনও কথা কহিল না। চেয়ার হইতে উঠিয়া ঘরের ভিতর পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিল। দেওয়ানজী সাহসে ভর করিয়া কহিলেন—প্রজারা তো চারিদিকে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আপনাকে আমার শেষ অনুরোধ, তাদের আর ব্যথা দেবেন না, পীড়ন করবেন না।

দেওয়ানজীর সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইয়া অরুণ কহিল—আপনি ভুল বুঝেছেন দেওয়ানজী—তাদের আমি পীড়ন করতে চাইনে। আমি তাদের মঙ্গলই করবো। তারা যদি মাঝথেকে দুঃখ পেতে চায়—আমি কি করি বলুন!

দেওয়ানজী বুঝিলেন—ইহার মস্তিস্ক একেবারেই বিকৃত হইয়া গিয়াছে, অনবরত সুরাপানে অল্পদিনের মধ্যেই ইহার তরুণ স্নায়ু বিকল হইয়াছে। কিন্তু তবু তিনি সাহস করিয়া এতটা প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

অরুণ বলিতে লাগিল—আশ্চর্য্য হচ্ছেন আপনি? কিন্তু আমি মিথ্যে বলিনি। পীড়ন তাদের আমি করছিনে—করছি নিজেকে। যাক্, এত কথা আপনি বুঝে উঠতে পারবেন না। এখন আসুন।

দেওয়ানজী নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

দিন তিনচার পর একদিন বৈকালে অরুণ নদীতীরের পথে বেড়াইতেছিল—সঙ্গে বৃন্দাবন ভিন্ন আর কেহ ছিল না। পথের ধারেই গৌরীদের সেই পরিচিত ঘরগুলি এখনও দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহাতে আর প্রাণের স্পন্দন নাই। এখন তাহা বড় বড় ঘাস ও আগাছাপূর্ণ। শুধু শৃগাল, কুকুর ও সর্পের আবাস স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া অরুণের অতীত কালের অনেক স্মৃতি মনে পড়িল। কতদিন কতভাবে এইখানে সে আগমন করিয়াছে—আর আজ? বুকের ভিতর দুঃখের সমুদ্র ফেনিল হইয়া উঠিল। অসাবধানে তাহার বক্ষভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

অন্যমনস্কভাবে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর নদীর ঘাটের দিকে তাহার নজর পড়িল। একটী যুবতী জলে কলসী পূর্ণ করিতেছে। শূন্যগর্ভ জলপাত্র অবিলম্বে শব্দ করিতে করিতে পূর্ণ হইয়া গেল। অরুণ থমকিয়া দাঁড়াইল। যুবতীটী তাহাদের লক্ষ্য করে নাই, সে নিশ্চিন্তমনে কলসীটী

কক্ষে লইয়া উপরে উঠিতেই অরুণকে দেখিয়া সঙ্কুচিতভাবে পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। অরুণ তাহার গমন পথের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

বৃন্দাবন দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া কহিল—গতিমাধব মণ্ডলের পরিবার হুজুর।

অন্যমনস্কভাবে অরুণ কহিল—ও, তাই নাকি!

ব্যঙ্গ করিয়া বৃন্দাবন কহিল—বউ সুন্দর বলে ভারী গরব ওর। ইচ্ছে করে, অহঙ্কার তার ভেঙ্গেদি'।

তেমনি অন্যমনস্কভাবে অরুণ কহিল—বেশতো, মন্দ হয় কি!

—হুজুরের আদেশ হলে, আজই রাত্রে—, তাহলে এখন ফেরা যাক্ হুজুর।

অরুণ ধীরে ধীরে বাড়ীতে ফিরিয়া সুরার বোতল লইয়া বসিল।

—৩৬—

সেদিন অরুণ অত্যন্ত চিন্তিতভাবে কক্ষের ভিতর দ্রুত পায়চারি করিতেছিল। তাহার মুখে চোখে অসহায় উদ্বেগের চিহ্ন, বেশ রুক্ষ,—কেবল চোখের জ্যোতি অতি তীক্ষ্ণ। বুকের ভিতর তাহার যে দারুণ অগ্নি অহরহ জ্বলিতেছে—তাহার দহনে সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আর যেন সে সহ্য করিতে পারে না। হায়রে! যদি কোনও রকমে এই যন্ত্রনা হইতে মুক্তি পাইত! কিন্তু প্রাণ থাকিতে হইবার উপায় নাই। পাপের গভীর পঙ্কে সে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে—আর কোনও ক্রমেই তাহার উদ্ধার নাই!

টেবিলের উপর টোটাভরা রিভলভার, সে ধীরে তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইল, নিঃশব্দে তাহা নিজেরহাতে তুলিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। তারপর নিজের বুকের উপর রিভলভারের নলটি স্থাপিত করিয়া ভাবিল—এখনই, এই মুহূর্তে সে এ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। পৃথিবীর উপর কিসের এত মায়া—বিশ্বের অভিশাপ স্বরূপ তাহার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি! তাহার প্রজারা প্রতি ঘরে ঘরে তাহারই মৃত্যু কামনা করিতেছে হয়তো এখন ভগবানের নিকট এই একটি ছাড়া আর কোনও প্রার্থনা নাই। বোধ হয় তাহার জননীও বিশ্বনাথের নিকট এই কামনাই জানাইতেছেন।

অরুণের অশান্ত বিকৃত মন কোনও দিনই সুস্থির নয়। সে যে কি জ্বালায় জ্বলিতেছে, তাহা সে ভিন্ন আর কে জানিবে! তাহার আহার

নাই, নিদ্রা নাই, রাত্রে যদিও বা একটু তন্দ্রা আসে, তাহা ঘোর দুঃস্বপ্নে পূর্ণ। ভয়ে সে ঘুমাইবার চেষ্টাও করে না। আজ তাহার মন আরও অশান্ত হইবার কারণ ছিল। সে দিনকার ঘটনার পর গতিমাধবের স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রজার দল দারোগার নিকট প্রতীকার না পাইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে। আজ পুলিশ সাহেব তদন্তে আসিয়াছেন। প্রজারা ক্ষিপ্ত, বিদ্রোহী—হয়তো প্রমাণ পাওয়া তাঁহার পক্ষে দুরুহ হইবে না। কিন্তু তাহার পর? এতদিনকার পাপের কি এইবার প্রায়শ্চিত্ত হইতে চলিল? না, না,—সে আইনের বিচার গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদি সত্যই তাহা হয়—তাহা হইলে নিজের বিচার নিজে করিবে। এই রিভলভার তাহার স্বম্বল।

কিন্তু তাহার প্রতিহিংসা লওয়া হইল কৈ? সেই পিশাচী গণিকা যে ধূমকেতুর মত তাহার জীবন-আকাশে উদিত হইয়া জীবনের সমস্ত সাধ আকাঙ্ক্ষা চির-জীবনের মত ঘুচাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল—তাহার প্রতিশোধ না লইয়াই কি সে চলিয়া যাইবে? এই যে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার—এতো তাহারই জন্য! সে যেন প্রত্যেক রমণীর মুখে তাহারই আদল পায়—তাই ক্রুর হিংসায় উন্মত্ত হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। কিন্তু সে যাহাই করুক—মনিমালিনীকে তাহার চাই-ই-চাই। তাহাকে শাস্তি না দিতে পারিলে পরলোকেই কি শান্তি পাইবে? ইহলোকে তাহার জবাব দিবার কিছুই নাই—কিন্তু পরলোকেই বা কিসের জোরে গিয়া দাঁড়াইবে? সে হাতের রিভলভারটী টেবিলের উপর রাখিয়া পুনরায় ঘরের ভিতর ঘুরিতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গেল, সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িল! কিন্তু অরুণের স্নান আহার কিছুই হইল না। সে সেই ভাবেই রহিল।

প্রায় অপরাহ্নে বৃন্দাবন কক্ষে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া কহিল—

হুজুর, সকাল থেকে এখানেই আছেন নাকি? স্নানাহার কিছুই হয় নি?

অরুণ ব্যগ্র হইয়া কহিল—ও দিকের খবর কি রে বেন্দা?

বৃন্দাবন হাসিতে হাসিতে বলিল—হুজুরের বৃন্দাবন যখন আছে, তখন ভাবনা কি। প্রমাণ পেল না কিছুই। আর পেলেও গ্রাহ্য করলো না পুলিশ সাহেব! টাকা আর বুদ্ধি থাকলে কিছুই আটকায় না হুজুর।

অরুণ আশ্বস্ত হইয়া কহিল—তাইতো দেখতে পাচ্ছিরে বেন্দা।

বৃন্দাবন বলিতে লাগিল—পুলিশ সাহেব তো করবে কচু! কর্ত্তার আমল থেকে কতজনই এল—কিন্তু এই বেন্দার বুদ্ধিতে—। যাক্ আর ভাবনা নাই। প্রজা ব্যাটারাও আচ্ছা জব্দ হয়েছে আজ। আর পতিমাধবের নামে থানায় ডায়রীও করে এলাম হুজুর।

—কেন, কেন, তার আবার হয়েছিল কি?

—তার আস্পর্দ্ধার কথা আর কি বলবো হুজুর। পুলিশ সাহেবের মুখের সামনে বলে উঠলো—জমিদারকে নিজ হাতে খুন করবে। ওতেই তো সাহেবের মন বিগড়ে গেল। এদিকে দারোগারা তো আমাদের পক্ষেই আছে—তারপর ঐ কথাতে সাহেব চটে লাল! তিনিই তো ডায়রী করতে বল্লেন হুজুর।

অরুণ শুনিতে শুনিতে অনামনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বৃন্দাবন বলিতে লাগিল—হুজুর আদেশ দেন ওকে আরও জব্দ করি। ঘরে আগুন দিয়ে ওকে পথের ভিখারী—।

চোখ বিস্ফারিত করিয়া অরুণ কহিল—কি বললি বেন্দা?

অরুণের চোখের দিকে চাহিয়া বৃন্দাবন ভয় পাইয়া গেল, কহিল—হুজুরের মত না হলে আর দরকার কি?

অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃন্দাবনের মুখের দিকে চাহিয়া অরুণ বলিল—তোর বাড়ী কোন দেশেরে বেন্দা!

—আজ্ঞে, নদে' জেলার হরিপুরে।

—সেখানে তোর বাড়ী, ঘর, পরিবার, ছেলে, মেয়ে সব আছে?

ভয়ে ভয়ে বৃন্দাবন কহিল—হুজুরের আশীর্ব্বাদে সবই আছে।

হো হো করিয়া বিকট হাসিয়া অরুণ কহিল — বিশ্বাস হয় না রে, আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। আচ্ছা, যা যা, তোর কিছু ভয় নাই।

বৃন্দাবন আর কিছু না বলিয়া হতবুদ্ধির মত বাহির হইয়া গেল। সে আজ কয়েক মাস হইতে এই লোকটির সহিত কারবার করিতেছে বটে—কিন্তু মাঝে মাঝে তাহাকে যেন বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

বৃন্দাবন চলিয়া গেল অরুণ সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে কক্ষটি অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আসিল, ভৃত্য আলো জ্বালিয়া আনিলে সে আলো দিতে নিষেধ করিল। তাহার অন্ধকারই ভাল—আলোর প্রয়োজন বুঝি চিরকালের মতই চলিয়া গিয়াছে। মনের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া চলিতে হইলে গাঢ় গভীর অন্ধকারই তাহার চাই!

অরুণ গতিমাধবের কথাই ভাবিতে লাগিল। স্ত্রীহারা এই লোকটি প্রতিশোধ লইতে বদ্ধ পরিকর এমন কি জনসমক্ষে তাহার মনের গুপ্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করে নাই। হয়তো সত্যই সে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে, যাহার জন্য তাহার জীবনের সুখ, শান্তি চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছে—তাহাকে হত্যা না করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইবেনা। আর সে? তাহার প্রতিশোধ লইবার স্পৃহা কি এইখানে বসিয়া নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার করিলেই পূর্ণ হইবে? যে এই বিপ্লবের আদি মূল—তাহাকে সন্ধান করিবার চেষ্টা কি আর সে করিবে না?

সহসা অন্ধকারের মধ্যে মানুষের ছায়া দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। রিভলভারটি হাতে তুলিয়া লইয়া বিকৃতস্বরে কহিল—কে?

—অরুণ নাকি? এ বাড়ীতে কি চাকর বাকর নাই, এখনও আলো জ্বালেনি।

গলার স্বরে চমকিত হইয়া অরুণ কহিল—কে তুমি?

—এখনও চিন্তে পারনি? আমি সমীর, সশরীরে উপস্থিত, কিন্তু সঙ্গে আর একজন আছেন, তিনি তোমার অপরিচিত।

বৃন্দাবন আলো দিয়া গেল। অরুণ বিস্মিত হইয়া দেখিল—তাহার বন্ধু সম্মুখে দাঁড়াইয়া এবং তাহার পশ্চাতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত একজন তরুণী মৃদুমৃদু হাসিতেছে।

আলোতে অরুণের মুখ দেখিয়া—সমীর বিচলিত হইয়া কহিল—এমন শরীর করে ফেলছ? তোমার হয়েছে কি?

অরুণ বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিতে পারিল না। সমীর ও মীরা একটু আগাইয়া আসিয়া দুইখানি চেয়ার টানিয়া বসিল। অরুণ যেন এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিতেছিল না, টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বিকৃতকণ্ঠে কহিল—সমীর, কেন তুমি এঁকে নিয়ে এলে। আজই পালাও। তোমার সে বন্ধু অরুণ আর নাই। তার কিছু কিছু শুনেছ তো? তবে কোন সাহসে আবার এসেছ এখানে?

বন্ধুর মাথায় হাত দিয়া কোমল স্বরে সমীর কহিল—সাহস? তোমার কাছে আসবো তাতে সাহসের দরকার বৈকি! তুমি হচ্ছ চার লাক্ষ টাকার মালিক—জমিদার। কিন্তু সেই জন্যই তো একা আসিনি, মীরাকেও সঙ্গে এনেছি। আমার কথা না শোন, তোমার বন্ধুপত্নীর কথা তুমি অবহেলা করবে কি করে?

অরুণ মুখ তুলিয়া একবার সমীর এবং একবার মীরার মুখের দিকে চাহিল। তবে কি জগতে এখনও তাহার আপনার বলিতে আছে। তাহার দুইচোখের পাশ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

—৩৭—

সমীর বলিতেছিল—সেবার তোমাকে বাড়ী পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরে গেলুম—একবার মনেও করিনি মা আর ছেলে দুইজনই ভুল বুঝে এখনও শাস্তি পাচ্ছ। এই কয়মাস আমি কোনও দিকেই মন দিতে পারিনি। কিন্তু তবু যদি জানতুম সব ফেলে ছুটে আসতুম তোমার কাছে। মীরা কিংবা ইস্কুলের কাজ কিছুই আটকিয়ে রাখতে পারতো না।

মীরা মধুর হাসি হাসিয়া কহিল—আর যাই কর তুমি ঠাকুরপোর কাছে আমার নিন্দাটি করো না। তিনি প্রথম থেকেই আমার সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা করে রাখবেন। আমি কি তোমাকে কোনওদিন আটকিয়ে রাখতে চেয়েছি ?

অরুণ একটুখানি হাসিয়া কহিল—কিন্তু সমীর তো মিথ্যে কথা বলেনি।

মীরা তেমনি হাসিতে হাসিতে কহিল—আলবৎ বলেছেন। তিনি এই কয়মাসের মধ্যে একবারও বন্ধুর কথা মনে করলেন না—সে কি আমার দোষ ?

সমীরও সহাস্যে কহিল—না, সে দোষটুকু আমারই স্বীকার করি। কিন্তু তোমার মুখ দেখেই যে অন্যসব অনেকটা ভুলেছিলুম এ কথাই বা অস্বীকার করি কি করে।

অরুণ কহিল—এতে তো রাগের কথা নাই কিছু। নবপরিণীতা পত্নী পেয়েও সমীর যদি বন্ধুকে মনে রাখতো—সে কি আপনি সহ্য করতে পারতেন ?

শীরা কহিল—কেন পারবো না? আপনাদের সব্বারই ঐ তো দোষ! অপরাধ করবেন নিজেরা—আর ঝাল ঝাড়বেন আমাদের ওপর। যেন সব তাতে আমরাই অপরাধী।

সমীর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—আচ্ছা তুমিই বলো দেখি কি ভাবে কথাটা বল্লে তোমার মনঃপুত হয়? তোমার রাগকে আমি ভয়ানক ভয় করি।

তারপর অরুণের দিকে চাহিয়া কহিল—ছোটবেলা থেকে ওকে দেখছি আমার কথায় উঠেছে, বসেছে—কিন্তু সাত পাক যেই হয়ে গেল অমনি হুকুম চালাতে সুরু করেছে। কথার যদি একটু এদিক ওদিক হোলো—অমনি কথা বন্ধ। অনুনয়, বিনয়, হাত-পা-ধরা, আরও কত কি—।

স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল—থাম থাম—ঢের লাগানো হয়েছে বন্ধুর কাছে, আর কেন?

সমীর হাসিতে হাসিতে কহিল—দেখছো অরুণ তোমার সামনেই এমন জোর জবরদস্তী—অসাক্ষাতে তো বুঝতেই পারছো।

কথাবার্ত্তায়, হাসি-গল্পে অরুণের মন অনেক লঘু হইয়া আসিতেছিল। মনের এমন হালকা ভাব সে অনেকদিন অনুভব করে নাই। কথায় কথায় শীরার সহিত সমীরের কপট কলহ, ইহাদের প্রাণখোলা হাসি, সুমিষ্ট কথাবার্ত্তা—তাহাকে মুগ্ধ করিতেছিল। কিন্তু তবু সে প্রাণ খুলিয়া হাসিগল্পে যোগ দিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেও ঠিক তাহারই বন্ধুরই মত ছিল উদার, তেমনি পবিত্র, তেমনি সংযত চরিত্র! আজ যেমন তরুণী পত্নী লইয়া সে সুখে, শান্তিতে, গর্ব্বে দিন কাটাইতেছে—তাহারও হয়তো এমনি ভাবেই দিন কাটিত। ভগবান তাহার জন্য সবই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন—শুধু নিজের দোষে সব হারাইতে বসিয়াছে।

নানা কথাবার্ত্তার পর সমীর কহিল — যতীন মুখার্জ্জীর খবর রাখ কিছু ?

এতক্ষণ যে কথা একটু ভুলিয়াছিল যতীনের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তাহা মনে পড়িয়া গেল, সে মাথা নাড়িয়া জানাইল—সে কিছুই জানে না।

সমীর কহিল—সেদিন খবরের কাগজে দেখছিলুম, তার চার বছরের জেল হয়েছে।

অরুণ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—জেল হয়েছে ? কি করেছিল সে ?

সমীর কহিল—তার যেমন অপরাধ, তাতে ফাঁসী হওয়া উচিত। চার বছর জেলে কি হবে তার ? উঃ, কি ধড়িবাজ লোকটি ভাই। কি ফিকির ফন্দী করেই না মহিলা আশ্রম করেছিল ! যাদের মঙ্গলের জন্য তার প্রাণ কেঁদেছে—তাদেরই উপর অত্যাচারের ফলে তার এই শাস্তি। মহিলা আশ্রমের তারই আশ্রিতা কয়েকটি স্ত্রীলোকের উপর সে না কি অমানুষিক অত্যাচার করেছিল !

অরুণ কোনও কথা কহিল না। গত দিনের সমস্ত কথাই তাহার মনের কোণে ভাসিয়া উঠিতেছিল। এই যতীন যদি কপটমূর্ত্তি লইয়া তাহার সম্মুখে না আসিত—তাহা হইলে কি কখনও তাহার এমন দুর্দ্দশা হয় ! এতদিন সে শুধু মনিমালিনীকে দোষী করিয়াছে কিন্তু এখন যতীনের নগ্নচরিত্র চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইতেই সে মনে করিল তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্যই বুঝি সে আসিয়াছিল। তাহার সহিত পরিচয় না হইলে কি কখনও সে একটি গণিকার চক্রান্তে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিত ? তাহার বক্ষভেদ করিয়া উত্তপ্ত শ্বাস বাহির হইয়া গেল।

সমীর বুঝিল—সহসা যতীনের কথায় অরুণের পূর্ব্ব স্মৃতি আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। সে কথা ফিরাইবার জন্য কহিল—অরুণ, আমরা তিনটি

দিনের বেশী থাক্‌বো না। তারপর কাশী যাব। তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

অরুণ কোনও কথা কহিল না।

মীরা স্মিতহাস্যে কহিল—শুধু কাশীই যাব না সেখানে গৌরীর হাতে আপনাকে সমর্পন করে তবে আমরা নিশ্চিন্ত হব। আপনার বন্ধু যে পথে চলেছে, আপনাকেও সেই পথ ধরালে আর আমার নামে দোষারোপ করবার উপায় থাকবেনা আপনাদের।

অতি করুণ দৃষ্টিতে অরুণ মীরার মুখের দিকে চাহিল—কি সুন্দর, স্নিগ্ধ পবিত্র মুখশ্রী। চূর্ণ কুন্তল অপ্রশস্ত ললাটের উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে, পাতলা গোলাপী ঠোঁট দুখানিতে হাসি মাখানো, পূর্ণ গণ্ডদ্বয়ে রক্তিম আভা, চোখ দুটি কি এক রহস্যে ঘেরা। অরুণের বুক ধক-ধক্ করিতে লাগিল—সে মাথা নত করিল।

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল। আহারাদি শেষ করিয়া সমীর ও মীরা অরুণের কক্ষে শয়ন করিল এবং অরুণ পাশের ঘরটিতে শুইবার ব্যবস্থা করিল।

রাত্রি তখন বোধ করি একটা। অরুণ তখনও ঘুমায় নাই—সে বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। পাশের ঘরে সমীর ও মীরা কথা বলিতে বলিতে কিছুক্ষণ নীরব হইয়াছে হয়তো তাহারা এখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কিন্তু অরুণের মনে শান্তি নাই, মাথায় আগুন জ্বলিতেছে, হৃৎপিণ্ড দ্রুতগতিতে চলিয়াছে, কি এক অত্যুগ্র পিপাসায় কণ্ঠনালী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আজ সন্ধ্যার পর হইতে তাহার গলা দিয়া এক ফোঁটা মদও নামে নাই—এ অস্বস্তি কি তাহারই জন্য? সে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া নিদ্রিত বৃন্দাবনকে ডাকিয়া তুলিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। বৃন্দাবন গেলাসে সুরা পূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। এক চুমুকে গেলাশটি

নিঃশেষ করিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল, তারপর ঘরের ভিতর পদাচারণা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্রমে তাহার উত্তেজিত মনে বন্ধুর প্রতি হিংসার ভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কেমন নিরুদ্বেগ শান্তিতে সে দিন কাটায়, রাত্রে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। আর সে?··· না, ইহা অবিচার। কেন, কিসের জন্য সমীর এমন খুসী হইবে? কেন সে জন সমাজে মাথা উঁচু করিয়া বেড়াইবে? তাহারও অন্তরে কি আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া যায় না?

অরুণের বুকের ভিতর সয়তান মাথা তুলিল। তাহার মনে বীভৎস চিন্তা খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে নারীকে পার্শ্বে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে সমীর নিদ্রা যাইতেছে তাহার যদি সে সর্ব্বনাশ সাধন করে, তাহা হইলে কেমন হয়? বিকট হাসিতে তাহার সমস্ত দেহ ভরিয়া উঠিল। সে টলিতে টলিতে চেয়ারে আসিয়া বসিল। কিন্তু বন্ধু, তাহার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষীর কি সে এমন সর্ব্বনাশ করিতে পারে? না, না—এ অসম্ভব। সে মানুষ নয়, পিশাচ কিন্তু তবু ইহা তাহার পক্ষেও অসম্ভব। কিন্তু সে নিজের মনকে আর বিশ্বাস করিতে পারে না। সমীর তিনদিন এখানে থাকিবে—কিন্তু তাহার সাহস হয় না। কখন মনের ঝোঁকে কি করিয়া বসিবে তাহার ঠিক নাই! সে পালাইবে তাহার আত্মীয় বন্ধু, ঘর বাড়ী, ধন সম্পত্তি ফেলিয়া রাখিয়া সে পালাইবে! আর জনসমাজে মুখ দেখাইবে না। সে তৎক্ষণাৎ মন স্থির করিয়া কাগজ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল, সে লিখিল :—

বন্ধু আমার, আমি পলাইলাম। আর কোনওদিন তোমাদের সাথে দেখা হইবে না। কেন এমনি করিয়া চলিয়া যাইতেছি তোমাকে জানাইবার সাধ্য নাই। মাকে এইবার দেশে ফিরাইয়া আনিও, তাঁহাকে বলিও পারেন তো এই অকৃতজ্ঞ সন্তানকে যেন ক্ষমা করেন। আমার ফিরিবার

পথ নাই। আমি যে ঘূর্ণীর ভিতর পড়িয়াছি তাহা হইতে উদ্ধার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। পারতো তুমিও ক্ষমা করিও। —

চিঠিখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া অরুণ আলমারি হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া পকেটে পুরিল, তারপর আর এক পকেটে টোটা ভরা রিভলভার লইয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইরা গেল।

আকাশ সন্ধ্যা হইতেই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ছিল — তখন বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই প্রবল ঝড় উঠিবে। ঘরের বাহিরে আসিয়া অরুণ একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, সমীর ও মীরা যে কক্ষে পরিপূর্ণ শান্তিতে ঘুমাইতেছে সেইদিকে চাহিল। তারপর দৃঢ়পদে অথচ নিঃশব্দে গৃহের বাহির হইয়া গেল। তখন টিপ টিপ করিরা বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে বিদ্যুৎ ঝলিতেছে, সোঁ সোঁ রবে বাতাস বহিতেছে। বাহিরের এই উন্মত্ত প্রকৃতিও যেন অরুণের মনের দুর্য্যোগের নিকট অতি তুচ্ছ। সে এই ঘনান্ধকারে পথ বাহিয়া কোথায় চলিল সেই জানে।

বাহিরে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন, বাতাসের দাপাদাপি, প্রবলবেগে বারিবর্ষণ—যেন সংসারকে আজ রসাতলে না দিয়া ছাড়িবে না। মৃদু আলোকিত কক্ষে মীরা ও সমীর পাশাপাশি শুইয়া, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ছিল। সহসা মেঘের গর্জ্জনে মীরার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভয়ে স্বামীকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

সমীর ঘুমের ঘোরে কহিল—কি হয়েছে মীরা ?

মীরা তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া কহিল—ভারী ঝড় বাহিরে—আমার বড্ড ভয় করছে।

মীরাকে গভীর প্রেমে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সমীর কহিল—ভয় কি ? আমি তোমার কাছে আছি তো !

অল্পক্ষণের মধ্যেই সমীর পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু মীরার চোখে নিদ্রা আসিল না। ঝড়ের গতি বাড়িয়াই চলিয়াছে, কর্ণবধিরকারী মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ, বারিধারার ধ্বনিতে তাহার বুকের রক্ত যেন জমিয়া যাইতেছিল। কিন্তু স্বামীকে ডাকিয়া তুলিতেও তাহার ইচ্ছা করিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা অত্যন্ত ভয় পাইয়া স্বামীকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল,—ওগো, শুনছো !

সমীর নিদ্রাজড়িতস্বরে কহিল—হলো কি তোমার মীরা ? জেগে রয়েছ নাকি ?

মীরা ভীতিব্যাকুলকণ্ঠে কহিল—জানলার কাছে কে যেন খড়-খড় করছে।

—বাতাসে অমনি শব্দ হচ্ছে মীরা।

মীরা ব্যগ্র হইয়া কহিল—ঝড়ের শব্দ তো আমি অনেকক্ষণ থেকে শুনছি। এ তা নয়। কে যেন জানলার গরাদ করাত দিয়ে কাটছে।

সমীর গা মোড়ামুড়ি দিয়া উঠিয়া কহিল—আচ্ছা, জানলা খুলেই দেখা যাক্।

জানলা খুলিয়া দিতেই মুক্ত পথ দিয়া উন্মত্ত বায়ু ও বৃষ্টির ঝাপটা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সমীর তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল—কৈ কিছুই না তো! ভারী বাতাস বাহিরে।

সে আবার শুইয়া পড়িল, মীরাকে বুকের মধ্যে টানিয়া চুম্বন করিতে করিতে কহিল—এইবার ঘুমোও, রাত শেষ হয়ে এলো যে!

—ভয় করছে যে বড় আমার। অরুণবাবুকে একবার ডাকলে হয় না?

সমীর সহাস্যে কহিল—ওঃ, আমাকে দিয়ে ভয় ভাঙ্গলো না আবার বন্ধুকে চাই বুঝি? সে ঘুমোচ্ছে ঘুম ভাঙ্গিয়ে আর দরকার কি? তুমি কেমন সাহসী তার পরিচয় না হয় কালই দিও।

কৃত্রিম কোপের সুরে মীরা কহিল—যাও, তুমি ভারী দুষ্টু।··· কিন্তু সে স্বামীকে আরও আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে মুখ রাখিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই এইবার ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি বোধ করি তখন তিনটা। বাহিরে ঝড় তখনও চলিতেছিল কিন্তু তাহার উন্মত্ততা কিছু মন্দীভূত হইয়াছে। সমীর ও মীরা তখন পরম শান্তিতে ঘুমাইতেছে।

সহসা কক্ষের জানলাটি খুলিয়া গেল। একজন লোক তাহার ভিতর দিয়া অতি ধীরে প্রবেশ করিল। তাহার সমস্ত গাত্র কৃষ্ণবর্ণ কম্বলে আবৃত, তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে। কক্ষে অত্যন্ত স্তিমিত ভাবে আলো

জ্বলিতেছিল। লোকটি নিঃশব্দে শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইল, বোধ হয় কি যেন একটু ভাবিল, কিন্তু পরক্ষণেই বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া সমীরের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত সমীর সহসা জাগিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—এ কি? উঃ!... তাহার বিকট চীৎকারে মীরা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, তাহার মনে হইল যেন একটি লোক জানলা দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছে। সে আর্ত্তস্বরে কহিল—অমন করছো কেন? সমস্ত বিছানা ভিজে গিয়েছে যে! সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলোর জ্যোতি বাড়াইয়া দিয়া লণ্ঠনটি হাতে করিয়া নিকটে আসিয়াই চমকিয়া উঠিল। তাহার স্বামীর বুক হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে, তাহার সমস্ত দেহ, শয্যা, এমন কি মীরার পরিধানের বস্ত্র রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া মীরা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার হাত হইতে আলোটি স্খলিত হইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সে তখন পাগলের মত দরজা খুলিয়া অরুণের কক্ষে গমন করিল। কিন্তু তাহার শয্যা শূন্য, টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে, তাহার উপর শূন্য গ্লাশ পড়িয়া আছে, এক পার্শ্বে একটা চিঠির মত কি লেখা রহিয়াছে। ভয়ে, দুঃখে অভিভূত হইয়া সে যে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এমন কি চীৎকার করিয়া কাহাকেও ডাকিবে এমন শক্তিও তাহার লোপ পাইয়াছে। সে পুনরায় নিজের শয়ন কক্ষে ফিরিয়া সমীরের বুকের উপর হাত দিয়া বলিয়া উঠিল—ওগো, কথা কওনা যে! গা এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন? উঃ...এ সর্ব্বনাশ কে করলে আমার? তবে কি তুমি নেই?... সে এইবার আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

বাহিরের মাতামাতি তখন থামিয়া গিয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, আকাশের গায়ে লঘু মেঘ ভাসিয়া

বেড়াইতেছে, জগত পুনরায় হাসিতেছে, এতক্ষণ যে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা চলিতেছিল—এখন তাহার আভাসমাত্র নাই। পৃথিবী স্থির, শান্ত, সুপ্তিমগ্ন।

আসাম মেল গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারই একটি মধ্যমশ্রেণীর কম্পার্টমেণ্টে অরুণ বসিয়াছিল। সে একদৃষ্টে জানলার বাহিরে চাহিয়াছিল। চক্ষের সম্মুখে দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইতেছে কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। তাহার দৃষ্টি শূন্য, বিভ্রান্ত। ইঞ্জিনের দাপাদাপি তাহার কানে আসিয়া পশিতেছিল বটে কিন্তু তাহার বুকের ভিতর যে আন্দোলন চলিয়াছে তাহার নিকট বুঝি ইহা অতি তুচ্ছ। ট্রেনখানি সশব্দে উল্কাবেগে চলিয়াছে, ইহার তবু নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য আছে, গতির শেষ আছে। কিন্তু তাহার জীবনপথে যে যাত্রা সুরু হইল তাহার কোথায় শেষ কে জানে!

কিন্তু তাহাকে এমনি অশ্রান্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে—ইহাই তাহার বিধিলিপি। যে দুষ্টগ্রহ তাহার ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া তাহাকে কক্ষচ্যুত করিয়াছে তাহারই পশ্চাতে উপগ্রহের মত ছুটাছুটি করিতে হইবে, কোনও দিন নাগাল পাইবে কি না সে জানে না, তবু তাহারই সন্ধান করিয়া ফেরা ভিন্ন তাহার অন্য কাজ নাই। হয়তো এমনি ভাবে তাহাকে বিপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, উচ্চশীর্ষ পর্ব্বতে আরোহন করিতে হইবে, নদী গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে—তবু তাহার গতির বিরাম থাকিবে না। হয়তো সারাজীবনের সন্ধান তাহার ব্যর্থ হইবে, হয়তো শুধু হতাশার বোঝা বুকে লইয়া জনমানবহীন কোনও স্থানে সে শেষ শয্যা পাতিবে, তাহার জন্য কেহ দুফোঁটা চোখের জলও ফেলিবে না।

হয়তো শিয়াল কুকুর তাহার দেহ লইয়া কাড়াকাড়ি করিবে। কিন্তু ইহাই যে তাহার ভাগ্যের লিখন!

সেদিন গৃহ হইতে চিরকালের মত বিদায় লইয়া আসিবার সময় কি মনে করিয়া অরুণ বৃন্দাবনকে সঙ্গে আনিয়াছিল কিন্তু তাহাকে এই যাত্রায় সঙ্গী করে নাই। গ্রামের বাহিরে আসিয়া তাহার হাতে দুশো টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া সে বলিয়া দিয়াছিল—আর যেন সে কোনও দিনই তাহার সম্মুখে না উপস্থিত হয়। যদি ইহার পরও সে তাহাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহারই হাতে মৃত্যু লেখা আছে। বৃন্দাবনকে বিদায় দিয়া সে কলিকাতা গিয়াছিল। তারপর এই নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু হইয়াছে।

অরুণ যে কম্পার্টমেণ্টে বসিয়াছিল—সেখানে আরও দুই তিনজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাহার পাশেই একটি ভদ্রলোক খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন—আ হা!

অরুণ জানলার বাহির হইতে মুখ ফিরাইয়া ভদ্রলোকটির দিকে চাহিল। তিনি মুখে একটি শব্দ করিয়া কহিলেন—বড়ই করুণ কাহিনী মশায়। আহা, এমন ভুল করলো! মারবে অত্যাচারী জমিদারকে, তা নয়, মেরে বসলো তার নির্দ্দোষী বন্ধুকে। মশায়, পরমায়ু থাকলে মারে কে, এমনি করে ভগবান তাকে রক্ষা করেন।

অরুণ নিঃশব্দে খবরের কাগজ তুলিয়া লইল, প[illegible] দেখিল বড় বড় অক্ষরে লেখা,—

বল্লভপুর জমিদার বাড়ীতে খুন!

জমিদার ভ্রমে বন্ধু হত্যা, হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি, জমিদার নিরুদ্দেশ!

অরুণের বুকের ভিতর দপ-দপ করিয়া উঠিল। সে নিঃশ্বাসরোধ করিয়া পড়িতে লাগিল—বল্লভপুরের জমিদার অরুণ চন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে

বীভৎস হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে। অরুণ বাবুর বন্ধু সমীর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন সস্ত্রীক বন্ধুর গৃহে আগমন করেন। জমিদার যে কক্ষে শয়ন করিতেন সে রাত্রে পত্নী সহ তাঁহার বন্ধু সেইখানে শয়ন করিয়াছিলেন। সে রাত্রে ঝড়বৃষ্টির সুযোগে গতিমাধব মণ্ডল নামে জনৈক প্রজা জানলার গরাদ ভাঙ্গিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া জমিদার ভ্রমে বন্ধুকে হত্যা করিয়াছে। তাঁহার পত্নী স্বামীর আর্ত্তনাদে জাগরিত হইয়া ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। আজ দুই দিন তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। আরও বিস্ময়ের কথা, সেই রাত্রেই জমিদার তাঁহার প্রিয় ভৃত্যের সহিত নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। পুলিশ প্রথমে জমিদারকেই হত্যাকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত অপরাধী গতিমাধব নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে তাহার স্ত্রীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য সেরাত্রে জমিদারকে হত্যা করিতে যায়। কিন্তু জমিদার যে অন্য কক্ষে ছিলেন তাহা সে জানিত না। তাই ভ্রমক্রমে জমিদারের পরিবর্ত্তে তাঁহার বন্ধুকে খুন করিয়াছে। আসামী গ্রেপ্তার হইয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

পড়িতে পড়িতে অরুণের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, চোখের সামনে সমস্ত জগৎ ঘুরিতে লাগিল! সে চোখ মুদিত করিয়া জানলার উপর মাথা রাখিল।

পাশের ভদ্রলোকটি তাহার অবস্থা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—ওকি মশায়, অমন করছেন কেন?

অরুণ কোনও কথা বলিল না।

ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন—মূর্চ্ছা হলো না কি? জল, জল!

গাড়ীর মধ্যে যাঁহারা ছিলেন সকলেব ব্যস্ত হইয়া উঠিল। একজন তাড়াতাড়ি জলের ঘটি আনিয়া অরুণের মাথায় জল দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে অরুণ মাথা তুলিয়া কহিল—আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমার কিছু হয়নি—মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল।

পাশের ভদ্রলোকটি বলিলেন—খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আপনার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করেছিলুম। অবিশ্যি সকিং নিউজ বটে, কিন্তু তবু আপনি ভারী নার্ভাস্। পড়েই এই—না জানি চোখে দেখলে কি করতেন।— এই বলিয়া ভদ্রলোকটি হাসিতে লাগিলেন। অরুণও তাঁহার কথায় হাসিবার একটু ব্যর্থ চেষ্টা করিল।

অল্পক্ষণ পরেই ট্রেন কোনও এক ষ্টেশনে থামিল। অরুণ কি মনে করিয়া তাহার হাতের ছোট্ট ব্যাগটি লইয়া টলিতে টলিতে সেইখানেই নামিয়া পড়িল। সেই কম্পার্টমেণ্টের লোকগুলি এই যুবকের অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল তাহার পর যে যাহার মত মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

অরুণ কিছুক্ষণ আগেও জানিত না—সে এইস্থানে অবতরণ করিবে।

আজ যতীন মুখার্জ্জীর দশ ঘর প্রজার বড়ই দুর্দ্দিন। যে রমণীকে তাহারা দেবী ভগবতীর অংশ বলিয়া শুধু মনে নয় প্রকাশ্যে প্রচার করিয়াছে, সেই চারুবালা—তাহাদের বড় শ্রদ্ধা সম্মানের পাত্রী বউমা, আজ তাহাদের মায়া ছিন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আজ আর তাহাদের জন্য ভাবিবার, দরদ দেখাইবার, উপদেশ দিবার, দুঃখ কষ্ট দূর করিবার কেহই থাকিল না। যে দেবীর দয়ায় তাহাদের পশুত্ব মোচন হইতে বসিয়াছিল, চোখের সম্মুখে সুখের আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল—আজ সেই মঙ্গল হস্তের দান হইতে তাহারা চিরদিনের মত বঞ্চিত হইল। চির-বঞ্চিত এই মুক অশিক্ষিত নিঃস্বের দল আজ হা-হাকার করিতে লাগিল।

গ্রামের মধ্যে কিছুদিন হইতে মহামারী দেখা দিয়াছিল। গ্রামের লোক ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গণেশ, গোবরা, গোপালের দলের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল চারুবালা। কি করিয়া এই ব্যাধির হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—পরিচ্ছন্ন থাকা, জল ফুটাইয়া খাওয়া, পানীয় জলের পুষ্করিণী অপবিত্র না করা প্রভৃতি অবশ্য প্রতিপাল্য বিধি মানিয়া চলিতে তাহার আদেশ ছিল। এইগুলি পালন করায় এ পাড়ার কয়েকঘর লোক এই ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল কিন্তু সহসা গণেশের এক কন্যার এই রোগ দেখা দিল। এই ব্যাধির ভয়ে শ্বশুর বাড়ী হইতে সম্প্রতি বাপের গৃহে সে চলিয়া আসিয়াছিল—কিন্তু ব্যাধির বীজ তাহার

দেহের মধ্যে অনেক পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছে ইহা কেহ জানিত না। এখানে আসিবার পরেই সে মহামারীতে আক্রান্ত হইল। ভীত প্রজারদল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। চারুবালা আশ্বাস দিয়া রোগীণীর সেবায় নিযুক্ত হইল। গণেশের কন্যা বাঁচিয়া উঠিল—কিন্তু চারুবালা নিষ্কৃতি পাইল না। এই কালরোগে সে আট ঘণ্টার মধ্যে দেহ রক্ষা করিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চারুবালা সকলকে আশ্বাস দিয়াছে, ভরসা দিয়াছে, এমনও বলিয়াছে, সে চলিয়া গেলেও যেন তাহারা চারুবালার উপদেশ মত কাজ করে, সে পরলোক হইতে যেন তাহাদের উন্নতি দেখিয়া সুখী হয়। আত্মীয়-স্বজনহীন এই রমণী যখন দুই চোখ মুদিল—তখন এই পল্লীতে যে আর্ত্তনাদ উঠিল—তাহা বুঝি শত আত্মীয় পরিবেষ্টিত গৃহেও হয় না।

শোকের প্রথম ধাক্কার পর তাহাদের মনে পড়িল—এইবার সৎকারের প্রয়োজন, শুধু কান্নাকাটি করিলে চলিবে না। তখন তাহারা গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের নিকট ছুটিল। কিন্তু এইবার তাহারা আর এক ধাক্কা খাইয়া কি যে করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

গ্রামের মাথা হরি ভট্চাজ মাথা ঝাঁকাইয়া কহিলেন—যতীনের বউকে কাঁধ দিতে যাবে এই গাঁয়ের বামুন? হ্যাঁরে তোদের আস্পর্দ্ধাও তো কম নয় দেখছি। তার জাতের কি ঠিক আছেরে হতভাগারা সব! ইচ্ছে হয়, তোরাই কাঁধে করে নিয়ে যা, না হয় মুদ্দাফরাস ডেকে শ্মশানে ফেলে দিয়ে আয়গে!

শরৎ গাঙ্গুলী হাসিতে হাসিতে কহিল—সারাজীবন যাদের নিয়ে কাটলো ওর, তারাই এখন ব্যবস্থা করুক। আমাদের কাছে কেন? জাত জন্ম খোয়াতে তাকে নিয়ে শ্মশানে যাবে কে? হ্যাঁ, তার শাশুড়ী যখন মরেছিল—আপত্তি করিনি। কিন্তু তার মরবার পর ও মাগী যে কি কাণ্ড কারখানাই না করলে! বন্যার সাহায্য না কি করতে যে

ছোঁড়াগুলো এসেছিল—তাদের যে পাণ্ডা ছিল তাকে নিয়েই না কত ঢলাঢলি! বন্যার জল নেমে গেলেও সে যেতে চায় না। সেই মাগীর শেষকালে গতি করবো আমরা?

যদু চক্রবর্ত্তী বলিতে লাগিল—হ্যাঁরে গোপাল, সেবার যে বড় আমার কথায় চটে লাল হয়েছিলি—আর এখন এত সাধাসাধি কিসের রে? ও কি লম্বা কথা সেবার—'আমাদের বউমা কি তোমার ঘরে চাক্‌রাণী হতে যাবে, কেন আমরা কি নেই?'—সে গর্ব্ব এখন কোথায় রে? বলি সারাজীবন ধরে যাই কর না, শেষ সময়টায় নিজের জাতেরই যে দরকার বাবা! ওহে ভট্‌চাজ, ওহে গাঙ্গুলী—সেবার পরিবার মারা গেলে কি যে জ্বালায় পড়লাম, তাতো জানই তোমরা। ভাবলাম, বয়সও হয়েছে—আর কেন বিয়ের চেষ্টা করা। তার চেয়ে ঘর সংসার দেখবার যদি একটা মানুষ পাই, চলে যাবে কটা দিন একরকম করে। এই সময়ে যতীনের মা গেল মরে, শুনলাম যতীনও নাকি বৌকে ত্যাগ করেছে। মনে ভারী দুঃখ হলো আমার, আহা, একা যুবতী স্ত্রীলোক কত কষ্টই না পাবে। বিশেষ করে যতীনও দাদা বলে ডাকে—তাই সম্পর্কও একটা আছে তো! ভাবলাম, যাই হোক, আশ্রয় দি। তারও একটা হিল্লে হোক, আমার না হয় কিছু খরচই হবে। কিন্তু কথাটা উত্থাপন করবা মাত্রই এই ছোট লোক ব্যাটারা একেবারে চটে আগুন! যেন আমিই ভয়ঙ্কর একটা অপরাধ করে ফেলেছি। বলি গণেশ, বলি গোপাল—তোদের সে অহঙ্কার এখন কোথায় রে মাণিক? শেষে কাজের সময় এত সাধাসাধি কেন বাপধন!······শেষের কথাগুলি সে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে মুখ ভ্যাঙচাইয়া কহিল।

যাহারা নিজেদের প্রতি শত অত্যাচারও নীরবে সহ্য করে, আজ তাহাদের আর ধৈর্য্য রহিল না। তাহাদের জননী, ভগবতীর অংশ বউমার

প্রতি এমন দোষারোপ, এমন কুৎসিত অপবাদ! গোবরা চোখ মুখ রক্তবর্ণ করিয়া কহিল—থাম ঠাকুর থাম। নইলে—। ক্রোধে তাহার গলা দিয়া কথা ফুটিল না।

যত্ন চক্রবর্ত্তী তাহার ভাব দেখিয়া দুই পা পিছাইয়া কহিল—কেন, নইলে কি করবি তোরা? মারবি নাকি?

গোবরা ধাইয়া যাইতেছিল, গোপাল তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল—আচ্ছা চল আজ সব। আমাদের মায়ের জন্য স্বর্গ থেকে রথ এসেছে, এখন রাগারাগির সময় নয়; কিন্তু এর শোধ আমি তুলবোই।…এই বলিয়া তাহাদের দলবল লইয়া আসিল।

গোপালই এই প্রজার দলের মাথা। সে গৃহে ফিরিয়া এইবার সমবেত নরনারীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—এখন কি করতে পারি আমরা? মায়ের দেহ কি এখানেই থাকবে?

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—কেন পড়ে থাকবে? আমাদের মা জননী ভগবতীর অংশ। তাঁর দেহ কাঁধে নিয়ে—আমরাই যাব, আমরাই তাঁর শেষ কাজ করবো। এতে আমাদের কোনও পাপ হবে না, বরং মা আমাদের খুসীই হবেন।

গোপাল তখন অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিল—তবে তাই হোক্। আমরা মা ভগবতীকে খুব ঘটা করে বিসর্জ্জন দেব। বল ভাই সকলে—জয় মা ভগবতীর জয়!

সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—জয় মা ভগবতীর জয়, জয় আমাদের বউমার জয়!

কথাটা বিদ্যুৎবেগে গ্রামের মধ্যে এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। তখন দলে দলে সমস্ত নিম্নশ্রেণীর লোক ভগবতী দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া সেইখানে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঢাক, ঢোল, কাড়া, ঝাঁঝ, ঘড়ির

বাদ্যে স্থানটি সরগরম হইয়া উঠিল। খোল করতাল লইয়া দলে দলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এক একবার সকলে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিতেছিল—জয় মা ভগবতীর জয়, জয় আমাদের বউমার জয়!

ইহার পর ফুল আসিল, চন্দন আসিল, সিন্দুর আসিল। রমণীর দল চারুবালার সিঁথিতে সিন্দুর পরাইয়া পায়ে আলতা মাখাইয়া পায়ের ধূলি লইয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া বলিতে লাগিল—সতীরাণী মা আমাদের আশীর্ব্বাদ করে যাও। তোমার দয়ায় স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে ঘর করতে পারি।

তারপর ফুলের মালায় চারুবালার দেহ সজ্জিত এবং চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া এই ছোটলোকের দল ব্রাহ্মণ কন্যাকে স্কন্ধে করিয়া শ্মশানে চলিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ উচ্চ জাতি দূর হইতে এই বিরাট বাহিনী অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। কে বলিবে ইহা শবযাত্রা! যেন ইহা উচ্চ জাতির অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নীচ জাতির বিরাট অভিযান, মূক জাতির অকস্মাৎ বাঙনিস্পত্তি, অপমানের তীব্র প্রতিশোধ!

দেখিতে দেখিতে নরনারীতে শ্মশানক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল, রাস্তাঘাটে আর তিল ধরণের জায়গা রহিল না। নদীতীরে সমারোহ সহকারে শেষ শয্যা পাতা হইল, সতী দেহে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গগন পবন বিদীর্ণ করিয়া ঢাক, ঢোল, ঝাঁঝ, ঘড়ি, খোল করতালের শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে ভক্ত সন্তানগণের গভীর চীৎকার—জয় মা ভগবতীর জয়, জয় আমাদের বউমার জয়। বুঝি বা স্বর্গ হইতেও দেবতাগণ অবাক বিস্ময়ে এই বিরাট অনুষ্ঠান দেখিতে লাগিলেন।

ধীরে চিতার আগুন নিভিয়া গেল, চারুবালার পূতপবিত্র সতীদেহ কয়েক মুষ্টি ভস্মে পরিণত হইল। সেই উত্তপ্ত ভস্ম হাতের মুঠির মধ্যে

চাপিয়া ধরিয়া গোপাল মণ্ডল জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল—ভাই সব, মায়ের চিতাভস্ম হাতে নিয়ে তোমরা সবাই প্রতিজ্ঞা কর—।

সহসা সেই ভস্মও জনসঙ্ঘ সেই জ্বলন্ত অঙ্গার লইবার জন্য বিপুল উদ্যমে ধাইয়া আসিল। গোপাল তাহাদের হাতে অল্প অল্প ভস্ম দিয়া তেমনি স্বরে কহিল—সবাই প্রতিজ্ঞা কর, আজ যারা আমাদের মায়ের অপমান করেছে, তাদের ক্ষেত চষবো না, ধান বুনবো না, শস্য কাটবো না, মোট বইবো না, গাড়ী চালাবো না, কোনও কাজে লাগবো না।

সেই জনসঙ্ঘ সমবেত স্বরে বলিয়া উঠিল—আমরা মায়ের চিতাভস্ম হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, যারা আমাদের মাকে অপমান করেছে—তাদের কোনও কাজে আর আমরা লাগবো না।

তেমনি স্বরে গোপাল বলিতে লাগিল—মায়ের উপদেশ আমরা চিরকাল মেনে চলবো, আমরা শিক্ষিত হবো, দেশের দুঃখ দূর করবো।

সকলে পুনরায় সমস্বরে সেই কথাগুলি আবৃত্তি করিল।

গোপাল কহিল—এস ভাই সব, এবার আমরা মায়ের চিতাভস্ম গঙ্গার জলে ধুয়ে দি।

তখন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে নরনারীগণ কলসী লইয়া ভক্তিভরে চিতাভস্ম ধুইতে লাগিল।

অপরাহ্ন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। এইবার সকলে ধীরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিতে লাগিল। উত্তেজনা থামিয়া গিয়াছে—ব্যথায় তাহাদের বুক পরিপূর্ণ। আজ তাহারা যে জিনিষ চিরকালের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া আসিল—আর জীবনে তাহা পাইবে কি?

গৌরীকে লইয়া মনমোহিনী কাশী আসিয়া বিশ্বনাথের চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সান্ত্বনা পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন—এমন সময় অতি অকস্মাৎ সমীরের হত্যা এবং অরুণের গৃহত্যাগ সংবাদে তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন—কি অপরাধ করেছি আমি ঠাকুর যে এত শাস্তি দিচ্ছ! নিজের ছেলের জন্য কোন নালিশ নাই, কিন্তু সমীর, পরের সন্তান হলেও সে যে আমার পুত্রাধিক প্রিয়, যাকে পেয়ে দেশ ধন্য হয়েছিল—কেন এমনি করে তাকে কেড়ে নিলে? সারাজীবন এ কি অনুতাপে আমার বুক জ্বালিয়ে দিলে বিশ্বনাথ! রাবণের চিতার মত আমার অন্তরের জ্বালা আর যে কোনও দিনই নিভবে না!

শুধু অনুতাপ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, সেইদিনই দেওয়ানজীকে পাঠাইয়া শ্যামাসুন্দরী ও মীরাকে কাশী আনিবার ব্যবস্থা করিলেন।

কয়েকদিন পর তাহারা কাশী আসিল। মৃতকল্প বিভ্রান্তদৃষ্টি উন্মত্তপ্রায় মীরাকে দেখিয়া মনমোহিনীর বুকের জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল, তিনি তাহাকে ব্যাকুলভাবে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, কিন্তু সান্ত্বনা দিবার কোনও ভাষা খুজিয়া পাইলেন না।

শ্যামাসুন্দরীকে কহিলেন—তোমাদের দেখবো বলে অনেক দিন থেকেই আশা করে এসেছি বোন, কিন্তু এমনি ভাবে দেখতে হবে, এতো ভাবতেও পারিনি আমি।

চোখের জলে এইবার তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী বুঝিলেন—এই নারী যে যন্ত্রণাভোগ করিতেছে তাহার নিকট নিজের অন্তর বেদনাও বুঝি তুচ্ছ !

মনমোহিনী বলিতে লাগিলেন—আমার দগ্ধ অদৃষ্টের কথা জেনেও কেন সমীরকে টানতে গেলুম ! অনুতাপে যে আমার বুক জ্বলে যায়। উঃ !

শ্যামাসুন্দরী নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া কহিলেন—তোমার দোষ কি দিদি। যেমন অদৃষ্ট করে এসেছি আমরা তেমনি তো ভুগতে হবে। তুমি কোনও গ্লানি রেখো না মনে। পূর্ব্ব জন্মে নিশ্চয়ই অশেষ পাপ করে এসেছিলাম—তারই প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে এবার।

মনমোহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—এমন সন্তান পেটে ধরেছিলুম যে তারই জন্য এতগুলি লোকের বুকে আগুন জ্বললো। আমার গৌরী মার মুখের দিকেই চাইতে পারিনে। তার উপর মীরার এ অবস্থা কি করে দেখবো ! মনকে প্রবোধ দেওয়া কি সোজা বোন !

গৌরী নিকটেই ছিল, শ্যামাসুন্দরী এইবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। এই অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী তরুণীর মুখের ভাব, অতি বিষণ্ণ, অতি করুণ! তিনি তাহাকে টানিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—এতদিন একা ছিলে মা, এইবার সঙ্গী এনে দিলুম তোমার। মীরা, এই গৌরীকে দেখে বুকে বল কর। উঠে যাও মা, তোমরা দুইজন ভাব করে নাও।

গৌরী ও মীরা উঠিয়া গেল।

মনমোহিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—এমন জোড় আর মেলে না ! আমরা সবাই কি একই অদৃষ্ট নিয়ে এসেছিলুম বোন্ ?

দিন যাইতে লাগিল—কিন্তু তাহা যে কত বড় দুঃখে তাহা এই চারটি স্ত্রীলোক তাহাদের অন্তর দিয়াই বুঝিতে পারিল।

একদিন গৌরী মনমোহিনীকে কহিল—মা !

মনমোহিনী বলিলেন—গৌরী মা, কি বলছো ?

গৌরী ছল ছল চক্ষে কহিল—একবার চলনা মা, আমরা সমস্ত তীর্থ ঘুরে আসি। এক জায়গায় থাকলে যেন দম আটকে আসে। আর এতে মীরাও কিছু শান্তি পাবে।

মনমোহিনী কিছুদিন হইতে এই কথাটাই ভাবিতেছিলেন, এইবার গৌরীর মনের ভাব বুঝিলেন। তাহাদের সকলেরই সমান অবস্থা, মুখে কিছু বলিবার নাই, অথচ বুক পুড়িয়া যায়।

তিনি বলিলেন—তবে তাই চল্ মা।

শ্যামাসুন্দরীও মীরার মত জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি দেওয়ানজীকে দেশ ভ্রমণের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিতে আদেশ দিলেন এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলেন।

প্রায় এক বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহারা অবশেষে চন্দ্রনাথ গমন করিলেন। তখন শিবচতুর্দ্দশীর মেলা সুরু হইয়াছে, অগণিত যাত্রীতে স্থান পরিপূর্ণ। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদমূলে একটি উচ্চ টিলার উপর অতি কষ্টে একটি ঘর ভাড়া করিয়া তাঁহারা দেবদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা—এইখানে অন্ততঃ একটি মাস বাস করিয়া পুনরায় কাশী ফিরিয়া যাইবেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া মীরা ও গৌরী, দুইজনেরই মন অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল—বিশেষ করিয়া চন্দ্রনাথের পাহাড়, জঙ্গল, দূর সমুদ্রের দৃশ্য প্রভৃতি তাহাদের বড় ভাল লাগিতেছিল। মনমোহিনী ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, শ্যামাসুন্দরীকে কহিলেন—ওরা এখন যেভাবে থাকতে চায় আমাদের তাই করতে হবে। ওদের মনের শান্তি যে কিসে ফিরিয়ে আনবো ভেবে পাইনে যে! এক ভগবান ভিন্ন আর আমাদের উপায় নাই।

সহস্র ধারার নিকটে গাছের তলায় কতকগুলি পাথরের স্তুপের পাশে একজন লোক নিস্তেজ ভাবে শুইয়াছিল। সে যেন দীর্ঘকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে—আর চলিবার ক্ষমতা নাই। এইখানে এই নির্জ্জন প্রদেশে সে বুঝি আজ শেষ শয্যা পাতিয়াছে। উপরে মেঘমুক্ত আকাশ, আশে পাশে পাহাড়ের শ্রেণী, ঝরণা ঝরা জলের প্রবাহ, চতুষ্পার্শ্বে খণ্ড শিলাস্তূপ, অদূরস্থিত সহস্রধারার বিরাট গর্জ্জন—প্রাণময়ী প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য নিকেতনে আজ এই প্রবাসী চিরজন্মের মত বিদায় লইতেছে। আজ তাহাকে দেখিবার কেহ নাই, সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই, তাহার মৃত্যুতে চোখের জল ফেলিবারও কেহ নাই। পিপাসায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে—কিন্তু এমন কেহ নাই যে তাহার মুখে একটু জল তুলিয়া দেয়।

অথচ এই শেষ মুহূর্ত্তে তাহার সর্ব্বইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ সজাগ আছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে সরুপথ উঠিয়া গিয়াছে, সে চাহিয়া দেখিল দুই তিনজন লোক বাঁশ কাটিয়া নামিয়া যাইতেছে, আরও কিছুদূরে একটি লোক গরু ও ছাগল চড়াইতেছে। এইবার চোখ মুদিত করিয়া সে ভাবিতে লাগিল—যাহার সন্ধান করিতে করিতে এই জন বিরল স্থানে অন্তিমকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—সে কোথায়? সমস্ত চেষ্টাই যে তাহার বৃথা গেল! তাহার ইহকাল গিয়াছে, পরকালের সান্ত্বনাও তো থাকিল না কিছুই!

অসহ্য যন্ত্রনায় সে যে কতক্ষণ চোখ মুদিত করিয়াছিল সে জানে না সহসা স্ত্রীকণ্ঠের খিল খিল হাসি ও পুরুষের কর্কশ স্বরে তাহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এতো ঠিক তাহারই হাসি যাহার সন্ধানে সে বৃথাই এতদিন ঘুরিয়াছে। সে তো ইহাকে কোনও দিনই ভুল করিতে পারে না। কিন্তু ভগবান! মিলাইলে যদি তাহাকে—দেহে যে আর একবিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট নাই যাহাতে মনের বাসনা সফল করিতে পারে সে! দুইটি নরনারী হাসি ও গল্প করিতে করিতে তাহার পাশ দিয়াই চলিয়া গেল। এই মরণপথের যাত্রীর দিকে হয়তো তাহারা একবার চাহিয়াও দেখিল কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করিল না। অন্তিম শয্যায় শায়িত লোকটি প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ মেলিয়া চাহিল, সত্যই তো তাহার ভুল হয় নাই। অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে সে ছিন্ন কোটের পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিল, তারপর দুইহাতের উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ব্যর্থ তাহার চেষ্টা, বিফল তাহার উদ্যম। অভিশপ্তের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, সে সেইখানেই ঘুরিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়া অনর্গল রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সে দুই হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিয়া চোখ মুদিয়া পড়িয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল জীবন-প্রদীপ নিভিতে আর দেরী নাই। কিছুক্ষণ পরে সে চোখ চাহিল চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। শুধু সহস্রধারার গুম্ গুম্ শব্দের সহিত তাহার বক্ষ যেন তাল রাখিয়া চলিয়াছে।

সহসা স্নেহময় নারী কণ্ঠে কে যেন বলিয়া উঠিল —আহা, কার বাছারে, এমন জায়গায় শুয়ে আছে। কোনও লোকজনও দেখতে পাইনে যে!

লোকটি পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল, এই স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল।

মুমূর্ষু রোগীর মাথার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র স্ত্রীলোকটি আর্তনাদ

করিয়া বসিয়া পড়িলেন—অরুণ! বাবা!··· ও দেওয়ানজী শীগগির আসুন।

মনমোহিনীর ব্যাকুল আহ্বানে তাঁহাদের দলটি আগাইয়া আসিল। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত ব্যাপারই বুঝিলেন। মীরা ও গৌরী পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

মনমোহিনী বিলাপ করিয়া কহিলেন—অরুণ, তোর এমনি দশা দেখবো বলেই কি বেঁচে আছি রে!

অরুণের ঠোঁটের পাশ দিয়া যেন একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল—কিন্তু তাহার দুই চোখের পাশ দিয়া অশ্রুর বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।

দেওয়ানজী হাঁকাহাঁকি করিয়া লোকজন ডাকিয়া মুমূর্ষ অরুণকে বহন করিয়া মোটরে তুলিয়া চন্দ্রনাথ ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু অরুণের তখন আর জ্ঞান ছিল না।

স্থানীয় ডাক্তার যাহারা ছিল কেহই ভরসা দিল না, টেলিগ্রাম করিয়া চট্টগ্রাম হইতে বড় বড় চিকিৎসক আনানো হইল কিন্তু কেহই শার কথা কহিল না।

তিন দিন পর অরুণ চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল, সে শয্যার উপর শুইয়া আছে। পাশে তাহার মা, গৌরী, শ্যামসুন্দরী ও মীরা বসিয়া আছে। অরুণ সকলকেই চিনিতে পারিল। শ্যামসুন্দরী সে কোনও দিন দেখে নাই, অনুমানে বুঝিল—ইনিই সমীরের শাশুড়ী ঠাকুরাণী।

অরুণের আজ মনে কোনও গ্লানি ছিল না, তাহার মুখ চোখ দিয়া যেন হাসি উছলিয়া পড়িতেছে। সে ক্ষীণকণ্ঠে একটু হাসিয়া কহিল—মা, ছেলের উপর অভিমান করে বাড়ী ছেড়ে এসেছিলে—এবার যে শোধ নেব, তার কি?

অনুতপ্ত মনমোহিনী ব্যাকুলস্বরে কহিলেন—অরুণ, মায়ের অভিমানের

শান্তি কি এম্‌নি করেই দিতে হয় রে! চল্‌ বাবা, আমরা আবার দেশে ফিরে যাই। আমার যে সব তেমনি আছে অরুণ! তবে কেন তুই কষ্ট দিবি?

অরুণ উত্তর দিল না, শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তারপর শ্যামাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া কোনও রকমে দুই হাত জুড়িয়া কহিল—আমায় ক্ষমা করতে পেরেছ কি মা? সমীর আমাকে ডাকছে—এইবার তার সাথে গিয়ে মিলবো। আমি জানি সে আমাকে ক্ষমা করেছে। কিন্তু তোমার ক্ষমা না পেলেও তো শান্তি পাবনা আমি।

শ্যামাসুন্দরী তাহার লালট চুম্বন করিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিলেন—ছিঃ বাবা, ও কথা বলতে নাই। আমাদের অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে ওতে তোমার তো হাত নেই অরুণ।

অরুণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনেমনে কহিল—কিন্তু অদৃষ্ট যে আমার নিজের হাতে গড়া, সে কি ভুলতে পারি?

তারপর মীরার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল—তোমার ক
ক্ষমা চেয়ে আমি তোমাকে ছোট করবো না—বরং তোম
শক্ত কাজের ভার দিয়ে যাচ্ছি। আমার বন্ধুর স্ত্রী হ
আমরা দুই বন্ধু ওপর থেকে দেখবো, কেমন কা

ইহার পর তাহার দৃষ্টি পড়িল আন
অরুণ কোনও কথা ক
ঝ

বাধা মানিল না। অরুণের চোখ দিয়া এইবার হু হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ইসারায় অরুণ গৌরীকে নিকটে ডাকিল। সে কাছে আসিয়া বসিলে তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—গৌরী, কেন আমার জন্য কষ্ট পাও। আমি তো তোমার উপযুক্ত নই।

অশ্রুরুদ্ধস্বরে গৌরী কহিল—ছিঃ, ও কথা বলতে নেই! এখনও কি বুঝতে পারিনি—তুমি আমার কি!

—বুঝতে পেরেছি বৈকি গৌরী। এখন সেই দুঃখই যে সবার বড় হয়েছে আমার। মরতে আমার কষ্ট নাই। কিন্তু তোমার জন্যই বাঁচতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার আর উপায় নাই।

আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরী অরুণের বুকের উপর মাথা রাখিল। অরুণ গাঢ় স্বরে কহিল—ভবিতব্য যা তা তো ঘটিবেই। শুধু ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা আমার, এবার যেমন পেয়ে তোমাকে হারালুম, পরজন্মে যেন তা না হয়। সেবার তোমাকে পেয়ে যেন আমি [illegible]তে পারি।

[illegible] ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অরুণ কহিল—কেঁদ না গৌরী। [illegible] মেয়ে নও যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখ বরণ করে নিয়েছে [illegible] সাজে। মুখ তোল একবার।

[illegible] অরুণ দুই হাত দিয়া [illegible] চাপিয়া [illegible]ভাবে চুম্বন করিয়া কহিল—

[illegible] য়াও